ব্যবসায়-সংগঠন

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়
প্রধান অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, বঙ্গবাসী মর্ণিং কলেজ, কলিকাতা

নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অধ্যাপক, বেহালা কলেজ অব কমার্স, কলিকাতা

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীসুপ্রকাশ বসু
প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

মুদ্রক :
শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী
জয়ন্তী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯এ, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬
এবং
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

মাতৃভাষার মাধ্যমে মনের ভাব যতটা সহজ, সরল, স্পষ্ট ও সুসংহত করিয়া প্রকাশ কবা যায় তাহা অন্য ভাষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালে কলিকাতা, বর্ধমান এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক শ্রেণীর (বাণিজ্য) ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন পাঠন ও পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করিয়া সুধীজনের ধন্যবাদর্হ হইয়াছেন। কিন্তু পাঠ্য-নির্ঘন্ট (সিলেব্যাস) অনুযায়ী সহজ, সরল ও দফাওয়ারী ভিত্তিতে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে তুলিয়া ধরিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনাব প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত খুব কমই হইয়াছে। সেজন্য ঐ অভাব পূরণের কথা স্মরণ বাখিয়াই এই পুস্তক রচনায় ব্রতী হইয়াছি। আশাকরি এই পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রীদের বহুদিনের অভাব এবার পূরণে সক্ষম হইবে। পুস্তকখানি কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম পাশ ও অনার্স অনুযায়ী লেখা হইয়াছে।

পুস্তকখানি সম্পাদনার কাজে বিভিন্ন সুধীজনের নিকট হইতে আমবা প্রভূত পরিমাণে উপদেশ ও সাহায্য লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের এই অকৃত্রিম প্রচেষ্টার ফলেই এই পুস্তকখানি বচনা সম্ভবপব হইয়াছে। আমাদেব পবম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক শ্রীঅনুতোষ চক্রবর্তী (গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স এ্যাণ্ড বিজনেস অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন) পুস্তকখানি রচনার সময় তাঁহার অমূল্য উপদেশ দিয়া এবং পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়া আমাদিগকে চিরদিনের জন্য ঋণে আবদ্ধ কবিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ছাড়াও যে সকল সুধীজনের অমূল্য উপদেশ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পুস্তকখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদেব মধ্যে অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ঘোষ ও অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল সরকার (রাজা প্যাবীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া), অধ্যাপক নিত্যানন্দ দে (বঙ্গবাসী কলেজ), অধ্যাপক সত্যব্রত গাঙ্গুলী (বঙ্গবাসী কলেজ অফ কমার্স), অধ্যাপক বিমলেন্দু ভট্যাচার্য (হেরম্ব চন্দ্র কলেজ), অধ্যাপক তুষার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিজয় চক্রবর্তী (বিধানচন্দ্র কলেজ, রিষড়া), উপাধ্যক্ষ যামিনীকান্ত দাস ও অধ্যাপক সুশান্ত বসু (লালবাবা কলেজ, বেলুড়), অধ্যাপক সুদীপ্ত বায় (খিদিরপুর কলেজ), অধ্যাপক নিখিল সাহা (হরিমোহন ঘোষ কলেজ), অধ্যাপক মলয় রায় (হরিপাল কলেজ), অধ্যাপক রঘুনাথ সেন ও অধ্যাপক অশোক বাগ (তমলুক কলেজ), অধ্যাপক নির্মল পোদ্দার (নিউ আলিপুর কলেজ), অধ্যাপক শঙ্কর রায় ও অধ্যাপক পবিত্র দে (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), অধ্যাপক লোকনাথ নন্দী (দক্ষিণ বারাসত কলেজ), অধ্যাপক বরুণ গাঙ্গুলী (মাঝদিয়া কলেজ), প্রভৃতিব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রথম সংস্করণে পুস্তকখানিতে কিছু কিছু ত্রুটী থাকা অস্বাভাবিক নহে। এ ব্যাপারে সহকর্মী অধ্যাপকবন্ধুদের সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করিয়া পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখি।

যাহাদের উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে. তাহারা উপকৃত হইয়াছে জানিতে পারিলে আমাদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা পূর্ণতা লাভ করিবে। পবিশেষে, আমাদের বন্ধুস্থানীয় সহৃদয় প্রকাশক, মুদ্রক ও প্রুফ-সংশোধনকারীগণকেও আমাদের আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কারণ তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই পুস্তকখানি প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

বিনীত

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

নারায়ণচন্দ্র ঘোষ

সূচীপত্র

কারবারের অর্থ ও উহার প্রধান লক্ষণগুলি

(Meaning of Business aud its important Tests)

ইংরেজী বিজনেস শব্দটির বাংলা অর্থ হইতেছে কারবার। এই বিজনেস শব্দটি ইংরেজী "বিজী" হইতে আসিয়াছে। প্রত্যেকটি মানুষ আজ তাহার জীবিকার জন্য ব্যস্ত। এই জীবিকার জন্য তাহাকে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কারণ পারস্পরিক সহযোগিতাই কারবারের মূল মন্ত্র। সেইজন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে লেনদেনের মাধ্যমে জীবিকার্জনকেই কারবার বলা যায়।

কিন্তু আবার অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাহারা বলেন, উপকরণ সংগ্রহ হইতে শুরু করিয়া পণ্য ও সেবা উৎপন্নের মাধ্যমে তাহা ক্রেতাগণকে সরবরাহ করার সমস্ত পদ্ধতিকেই কারবার বলে।

বিভিন্ন সংজ্ঞা, সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাকিলেও সকলেই কিন্তু "হেনির" (Henny) সংজ্ঞাকে স্বীকার করেন। "হেনির" মতে প্রকৃতি হইতে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া, উহাদের রূপান্তর সাধন দ্বারা মূল্যের পরিবর্তে একস্থান হইতে অন্যস্থানের ক্রেতার নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার পদ্ধতিকেই কারবার বলে।

কারবারের প্রধান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপে আলোচনা করা যায় :—

(১) **পুনঃপুন বিক্রয়** (Recurring Sale) :—

ইহাকে কারবারের প্রধান লক্ষণ বলে। পুনঃপুন বিক্রয় হইতেই কারবারের জন্ম। দুই একটি আকস্মিক বিক্রয়কে পুনঃপুন বিক্রয় হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ ঐ রূপ আকস্মিক বিক্রয়কে কারবার বলে না। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হইবে।

জামা প্রকৃত ভোগকারী ক্রয় করে আবার উহার বিক্রয় করার জন্য দোকানদারও ক্রয় করে। কিন্তু প্রথমোক্ত ক্রয়কে কারবার বলে না। কিন্তু পরের ক্রয়টিকে কারবার বলে। কারণ ঐ দোকানদার জামা বিক্রয় করিয়া

আবার জামা ক্রয় করিবে। সুতরাং ইহাতে পুনঃপুন বিক্রয় পদ্ধতি আছে। সেইজন্য উহাকে ব্যবসা বলে।

(২) **ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সুবিধা** (Mutual advantages of Buyers and Sellers) :—

যে লেনদেন হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই উপকৃত হয় তাহাকে কারবারের দ্বিতীয় লক্ষণ বলে। উভয়েই যদি উপকৃত না হয় তবে তাহাকে কারবার বলে না। এই সুবিধা হইতে ক্রেতারা পণ্য পাইয়া উপকৃত হয় এবং বিক্রেতারা মূল্য পাইয়া উপকৃত হয়। ইহাকেই পারস্পরিক সুবিধা বলে।

(৩) **পুনঃপুন উৎপাদন** (Recurring Production) :—

পুনঃপুন উৎপাদন ও ক্রয়কে কারবারের অন্যতম লক্ষণ বলে। পণ্য যদি পুনঃপুন উৎপন্ন না হয় অথবা কাঁচা পণ্য যদি পুনঃপুন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা না হয় তবে তাহাকে কারবারের লক্ষণ বলা যায় না।

(৪) **বিক্রয়ের ইচ্ছা** (Intention to Sell) :—

যখন পণ্য উৎপাদন বা ক্রয় যদি ভোগের জন্য করা হয় তবে তাহাকে কারবার বলা যায় না। যখনই পণ্য ক্রয় করিতে হইবে অথবা উৎপাদন করিতে হইবে তখনই উহা বিক্রয়ের অভিপ্রায়েই করিতে হইবে, এবং তখনই তাহাকে কারবারী লক্ষণ বলে। যদি কোন পণ্য বিক্রয়ের ইচ্ছা ভিন্ন ক্রয় করা হয় তবে তাহাকে কারবার বলা যায় না।

(৫) **মুনাফা** (Profit) :—

প্রতিটি কারবারী এই উদ্দেশ্যে তাহার কারবার শুরু করে। কম হউক আর বেশী হউক মুনাফা না থাকিলে সরকারী প্রতিষ্ঠান ভিন্ন অন্য কারবার চলিতে পারে না। সুতরাং এই মুনাফাই কারবারের অন্যতম লক্ষণ। অপরদিকে মুনাফা দ্বারা কারবারের স্বচ্ছলতাও বিচার করা যায়। যে কারবারে মুনাফা হয় না, সে কারবার দুর্বল আর মুনাফাঅর্জনকারী কারবার সবল হইয়া চলিতে পারে। এই মুনাফা না থাকিলে কোন কারবারী কারবারের ঝুঁকি গ্রহণ করিবে না।

সুতরাং কারবারের লক্ষণ বলিতে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলিকেই বুঝিয়া থাকি।

কারবারের উদ্দেশ্য (Objective of Business) :—

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অভাবের উত্তেজনার জন্য বর্তমান কালে কারবারও বিভিন্ন সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য বর্তমান কারবারী তাহার সম্মুখে কয়েকটি উদ্দেশ্য রাখিয়াই তাহার কারবার পরিচালনা করিয়া থাকে। ব্যবসায়ীর এই উদ্দেশ্যসমূহকে সংক্ষেপে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করিতে পারি।

(ক) **অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য** (Economic Objective) :—

মুনাফা অর্জন দ্বারা ক্রেতার নিকট পণ্য সরবরাহকেই কারবারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বলে। এই প্রকার পণ্য সরবরাহ দ্বারা ক্রেতার আহার, বাসস্থান, মানষিক অভাব প্রভৃতি পূরণ হয়। আর এই সকল পণ্যের সরবরাহ দ্বারা বিক্রেতা মুনাফা অর্জন করিয়া তাহার জীবিকার্জন করিয়া থাকে। এই মুনাফা না থাকিলে কেহ কারবার করিত না। সেজন্য ইহাকে অনেকে কারবারের মুখ্য উদ্দেশ্যও বলে।

(খ) **সামাজিক উদ্দেশ্য** (Social Objective) :—

ব্যবসা হইতে শুধু লাভ করিব। দিনের পর দিন উহা বর্দ্ধিত হইবে, আর উহা দ্বারা ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত অবস্থা তথা ভোগ পরিতৃপ্ত হইবে ইহা ব্যবসায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। মুনাফা কারবারের অন্যতম উদ্দেশ্য তাহা আমরা উপরের আলোচনায় দেখিয়াছি। কিন্তু এই সকল মুনাফা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয় হইতেছে সামাজিক দিক। সমাজকে বঞ্চিত করিয়া কারবার চলিতে পারে না। আরউইকের (Urwick) মতে, মানুষ যেমন একমাত্র খাওয়ার জন্য বাঁচিয়া থাকে না তেমনি মুনাফা লাভ কারবারের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ড্রাকার (Drucker) বলেন, মুনাফাই একমাত্র কারবারের উদ্দেশ্য নহে কিন্তু ইহা অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন প্রকার খারাপ কাজ (ক্রেতাকে কম দিয়া, খারাপ পণ্য সরবরাহ করিয়া, প্রভৃতি) দ্বারা মুনাফা বৃদ্ধি হয় কিন্তু তাহাকে প্রকৃত অর্থে কারবার বলা যায় না। সুতরাং একমাত্র ক্রেতাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ও সামাজিক দায়িত্ব

পালন দ্বারাই কারবার দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে। সেজন্য সমাজের কল্যাণসাধন কারবারের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সামাজিক অন্যান্য উদ্দেশ্য হইতেছে প্রকৃত কর প্রদান, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উন্নতিতে সাহায্য করা প্রভৃতি। সুতরাং ঐ সকল কাজকেই সামাজিক উদ্দেশ্য বলে।

(গ) **মানবিক উদ্দেশ্য** (**Human Objective**) :—

ইহাকেও কারবারের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে। মালিক শ্রমিক ও বিভিন্ন ব্যক্তির সুখ-সুবিধাই ইহার মূল কথা। কর্মচারীদের প্রকৃত বেতনপ্রদান, মর্যাদা দান, কাজের স্থায়িত্ব, তাহাদের মনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রদান প্রভৃতি কারবারের অন্যতম উদ্দেশ্য। কর্মচারীদের সহায়তা ভিন্ন কারবার ঠিকভাবে চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যবসায়ীকেই কর্মচারীর সুখ-সুবিধা বিধানের মাধ্যমেই তাহার কারবার পরিচালনা করিতে হয়।

কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দিক (Individual and Social Aspects of Business) ।—

যে সকল পদ্ধতির দ্বারা মানুষ বর্তমান যুগে তাহার জীবিকা অর্জন করে তাহার মধ্যে কারবার অন্যতম। এই কারবার দ্বারা ব্যবসায়ী প্রচুর ধন উৎপাদন করিতে পারে এবং এই ধন দ্বারাই জীবিকানির্বাহ করে। শুধুমাত্র ধন উৎপাদন করিয়াই ব্যবসায়ী ক্ষান্ত হয় না, অপরদিকে এরই মাধ্যমে কারবারী সামাজিক সম্মান, প্রতিপত্তি লাভ করে। ইহাকে কারবারের ব্যক্তিগত দিক বলে। এই ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবসায়ী কারবারের ঝুঁকি লয়। এই প্রকার ঝুঁকি লইয়া আমাদের দেশে টাটা, বিড়লা আজ ধনপতি হইয়াছে এবং সমাজে প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। কারবারের ব্যক্তিগত দিক হইতেই নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি কারবারী ভোগ করিতে পারে :—

(ক) এই কারবার হইতে ব্যবসায়ী তাহার পরিবারের লোকের অন্নসংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়।

(খ) কারবার হইতে কারবারীর সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। ঐ সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কারবারী অন্য কারবার চালু করিতে পারে।

(গ) মুনাফা হইতে কারবারীর ধনসম্পত্তির সৃষ্টি হয়।

(ঘ) ইহা হইতে কারবারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়।

কারবার করিয়া কারবারী যেমন প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয় অনুরূপভাবে উহা হইতে সমাজও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয় যেমন ;

(ক) সমাজের মানুষ প্রয়োজনীয় পণ্য সহজেই পাইয়া যায়।

(খ) দেশের বেকার সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব হয়।

(গ) দেশীয় কারবারের প্রসার হইতেই বৈদেশিক কারবারের উৎপত্তি হয় এবং ইহা দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

(ঘ) কারবারের প্রসারের ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এবং ইহা দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, ব্যক্তিগত দিক বলিতে শুধু কারবারীর ব্যক্তিগত লাভ লোকসানকেই বোঝায় কিন্তু এখন ইহা পরিষ্কার হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সমাজও উপকৃত হয়। সমাজকে ধোঁকা দিয়া অর্থাৎ বঞ্চিত করিয়া কোন কারবারই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। কারণ ইহাতে ক্রেতা প্রতিরোধ গড়িয়া উঠে এবং কারবার বন্ধ হইয়া যায়।

শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে আজ কারবারের সামাজিক দিকটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে মালিক-শ্রমিক বিরোধ, কারবারের ক্রমবর্ধমান প্রসার, শ্রমিক সংঘের উন্নতি প্রভৃতি হইতেই আজ সামাজিক দায়িত্ব অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। আজ সামাজিক দায়িত্ব ভিন্ন কারবারের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। এই সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

(১) প্রকৃত মূল্যে ক্রেতাগণকে ভাল পণ্য সরবরাহ করিতে হয়।

(২) কারবার বড় হওয়ার সাথে সাথে সমাজের উন্নতির কথাও তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে।

(৩) সরকারকে ঠিক সময়মত পাওনা কর পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে, এবং সমাজের উন্নতির জন্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে।

(৪) নতুন পণ্য উৎপাদন ও বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(৫) কর্মচারীকে উপযুক্ত বেতন, মর্যাদা, কাজের প্রতি সম্মান, স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা, প্রভৃতি কারবারীকে করিতে হইবে।

(৬) মূলধন দাতাদের উপযুক্ত সুদ প্রদান করিতে হইবে, এবং জাতীয় সম্পত্তির যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৭) সমাজের উন্নতির জন্য হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য কারবারীকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।

(৮) একচেটিয়া কারবার দেশ হইতে যাহাতে শেষ হইয়া যায় তাহার জন্য কারবারীকে যথেষ্ট সচেষ্ট হইতে হইবে।

সুতরাং উপরোক্ত উপায়ে আমরা আধুনিক কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক বর্ণনা করিতে পারি।

সমস্ত কারবারী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি (Basic Features Common to all business Enterprises).

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার কারবারী প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। মালিকানা, আয়তন, স্থায়ীত্ব, গুণগত প্রভৃতি বিষয় বিচার করিলে ইহারা এক একটি বিভিন্ন প্রকৃতির কারবার। বিভিন্ন ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও কতকগুলি ব্যাপারে ইহাদের ভিতরে কতকগুলি একই রকম বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

(১) **উদ্যোক্তা** (Enterpreneur) :—

প্রত্যেক কারবারে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই কারবার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাজ করেন। যে নামেই তাহাকে পরিচিত করা যাউক না কেন, ঐরূপ ব্যক্তি ভিন্ন আমরা কোন কারবারের অস্তিত্ব কল্পনাই করিতে পারি না।

(২) **সংগঠন** (Organisation) :—

প্রত্যেক উদ্যোক্তাকে সংগঠনের কাজ করিতে হয়। ছোট হউক আর বড় হউক প্রত্যেক কারবারে সংগঠন থাকিবেই। জীবন ভিন্ন যেমন শরীরের কোন মূল্য নাই সেইরকম সংগঠন ভিন্ন কোন কারবারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সেই জন্য প্রত্যেক কারবারের জন্য সংগঠন একান্ত প্রয়োজন।

(৩) **মূলধন** (Capital) :—

কারবার আরম্ভ করিতে হইলে মূলধনের প্রয়োজন। কারবার ছোট হইলে কম মূলধন দরকার হয় আর বড় হইলে বেশী মূলধন দরকার। সুতরাং মূলধন প্রতিটি কারবারে থাকিবেই অন্যথায় কারবার পরিচালনা করা চলে না।

(৪) **পূর্ব পরিকল্পনা** (Forecasting) :—

যে কোন কারবার আরম্ভের পূর্বেই ব্যবসায়ীকে তাহার ব্যবসায়ের কথা চিন্তা করিতে হয়। কি প্রকার কারবার হইবে, কি কি পণ্য উৎপন্ন হইবে, কোথায় এই কারবার স্থাপিত হইবে, কি প্রকার কাঁচামাল প্রয়োজন হইবে, কোন বাজারে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হইবে সমস্ত বিষয় তাহাকে পূর্বেই ঠিক করিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব পরিকল্পনা প্রত্যেক কারবারের একটি প্রয়োজনীয় লক্ষণ।

(৫) **সেবার মনোভাব** (Service motive) :—

প্রত্যেক ব্যবসায়ে এই মনোভাব দেখা যায়। এই মনোভাব ছাড়া কোন কারবার দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। সেবার মনোভাব বিভিন্ন প্রকার কারবারে বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে কিন্তু সেবার মনোভাব কারবারে থাকিতেই হইবে।

(৬) **ঝুঁকি বহন** (Risk and uncertainty) :—

প্রত্যেক কারবারে ঝুঁকি ওৎপ্রোতিতভাবে জড়িত। ঝুঁকি ভিন্ন কোন কারবার হইতে পারে না। ব্যবসাক্ষেত্র খুব আরামের স্থান নহে। প্রতি পদক্ষেপে বিচার, বিবেচনা ও ঝুঁকি লইয়া চলিতে হয়। কারবার যত বড় হইবে এই ঝুঁকির পরিমাণও তত বেশী হইবে।

(৭) **মুনাফা** (Profit) :—

প্রধাণতঃ মুনাফা আয়ের জন্যে প্রত্যেকে কারবার শুরু করে। ব্যবসাক্ষেত্রে কেহ তীর্থ করিতে আসে না, অথবা শরীর ভাল করিতেও আসে না। প্রত্যেকে মুনাফা লাভের আশায় ঝুঁকি লইয়া কারবার আরম্ভ করে। এই মুনাফার পরিমাণ সরকারী অপেক্ষা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে অনেক বেশী হয়। সেজন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান বিনা মুনাফায় কারবার পরিচালনা করে বলিলে

ভুল হইবে। পক্ষান্তরে এই মুনাফার পরিমাণ দিয়া কারবারের স্বচ্ছলতাও বিচার করা যায়।

সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের কারবার থাকা সত্বেও উহাদের মধ্যে আমরা উপরোক্ত বিষয় সমূহে সমতা দেখিতে পাই।

কারবারীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী (Essential Qualifications for a Businessman)

কোন কারবারের সফলতা অনেকাংশে উহার মালিক অর্থাৎ কারবারীর উপর নির্ভর করে। একই মূলধন লইয়া একটা কারবার দিনের পর দিন বড় হইয়া উঠে। আবার সেই একই পরিমাণ মূলধন লইয়া অন্য একটা কারবার দিনের পর দিন লোকসানে চলে। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এরূপ অবস্থার জন্য উহার মালিকই প্রধানতঃ দায়ী। ভালভাবে কারবার করিতে হইলে মালিককে কতকগুলি গুণের অধিকারী হইতে হইবে। এই গুণাবলীকে সফলকাম কারবারীর গুণাবলী বলে। সফলকাম কারবারীর গুণাবলী আমরা নিম্নরূপে বর্ণনা করিতে পারি।

(১) **শিক্ষা (Education) :—**

প্রত্যেক কারবারীকে কমপক্ষে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিৎ। সাধারণ শিক্ষার সহিত কারবারী শিক্ষা সম্পর্কেও তাহার জ্ঞান থাকা উচিৎ। উভয় প্রকার শিক্ষা তাহার থাকিলে কারবার সহজে পরিচালনা করা তাহার পক্ষে খুব সুবিধা হইবে।

(২) **সময়জ্ঞান (Punctuality) :—**

মানুষের জীবনে যেমন সুযোগ সব সময় আসে না তেমনি ব্যবসায়েও হয়। সুযোগের প্রকৃত ব্যবহার দ্বারাই কারবার বড় হয়। সেজন্য সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন, বিক্রয় তাহাকে করিতে হইবে। সময় সম্বন্ধে গুরুত্ব না দিলে কোন ব্যবসায়ী উন্নতি করিতে পারে না।

(৩) **সততা (Honesty) :—**

চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। ব্যবসা করিতে আসিয়া চালাকি করিলে ক্রেতাগণ ক্রুদ্ধ হয়। শ্রমিকগণ অসন্তুষ্ট হয়। ইহাতে

ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। সেইজন্য প্রত্যেক কারবারীকে সততার সহিত তাহার কারবার পরিচালনা করা উচিৎ।

(৪) সেবা (Service) :—

কারবারের লাভ, কারবারের সেবার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ জনগণের কোন সুখ-সুবিধা না দেখিয়া শুধু লাভ করার চেষ্টা করিলে অচিরেই কারবার উঠিয়া যাইবে। সেজন্য ব্যবসায়ীকে সর্বদা জনগণের সেবার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

(৫) সজাগ দৃষ্টি (Alertness) :—

ব্যবসা ও খরিদ্দারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য। খরিদ্দারের রুচির পরিবর্তন হইলে তাহার সহিত সমতা রাখিয়া পণ্য উৎপাদন করিতে হইবে অন্যথায় পণ্য বিক্রয় হইবে না, এবং ব্যবসার উন্নতি হইবে না।

(৬) আস্থা (Confidence) :—

কর্মচারী ও খরিদ্দারের আস্থা অর্জনও সফলকাম কারবারীর অন্যতম কাজ। নিজের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস থাকিলে তবেই কারবারী ইহা অর্জন করিতে পারে। বিপদের মুখে নিজের উপর যথেষ্ট আস্থা রাখিতে পারিলে তবেই সকলে তাহার উপর নির্ভর করিবে। এইরূপ আস্থা কারবারে একান্ত প্রয়োজন।

(৭) দক্ষতা (Ability) :—

যথেষ্ট কাজ করার ক্ষমতা, মানষিক বল, কর্মপ্রেরণা, প্রভৃতিও সফলকাম কারবারীর গুণাবলী। ইহার উপর তাহার দক্ষতা অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং দক্ষতাকেও সফলকাম কারবারীর অন্যতম গুণাবলী বলা হয়।

(৮) গণতান্ত্রিক মনোভাব (Democratic Attitude) :—

ইহার উপর কারবারের উন্নতিও অনেকাংশে নির্ভর করে। এরূপ মনোভাব থাকিলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ভাল হয়। ক্রেতার সহিত ভাল সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ফলে কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং কারবার সহজেই উন্নতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং উপরোক্ত গুণাবলীকে সফলকাম কারবারীর গুণাবলী বলা হয়।

কারবারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Business)

কারবারকে আমরা সহজেই নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি।

(১) **শিল্প** এবং (২) **বাণিজ্য**।

বাণিজ্যকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ;

(ক) **ব্যবসা** এবং (খ) **আনুষঙ্গিক** বা সহায়ক কাজকর্ম।

(১) শিল্প (Industry) :—

প্রকৃতির দান আহরণ করিয়া তাহা হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনকেই শিল্প বলে। ইহার কোনটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করে আবার কোনটি অন্য শিল্পের কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহাকে আবার **নিম্নরূপে** ভাগ করা যায।

প্রজনন শিল্প (Genetic Industry) :—

এই শিল্প এমন সব জিনিষ তৈয়ার করে যাহা আবার অন্য পণ্য উৎপাদন করিয়া মানুষের অভাব পরিতৃপ্ত করে। যেমন, শস্য-বীজ, গৃহপালিত পশু-প্রজনন প্রভৃতি।

নিষ্কাশন শিল্প (Extractive Industry) :—

পৃথিবীর বুক হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির দান হইতে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন, খনিজ, বনজ, মৎস্যচাষ প্রভৃতি।

যান্ত্রিক শিল্প (Manufacturing Industry) :—

একই জিনিষ বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার দ্বারা উহা হইতে বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদনই এই শিল্পের উদ্দেশ্য। যেমন ; খনিজতৈল পরিস্রাবণ, মোটর তৈয়ারী সংযোজক শিল্প, প্রভৃতি।

নির্মাণ শিল্প (Constructive Industry) :—

বিভিন্ন প্রকার অট্টালিকা, সেতু, বাঁধ প্রভৃতি তৈয়ার ইহার অন্তর্গত।

বিশেষ করিয়া কণ্টাক্টার ও ইঞ্জিনিয়ারদের কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই শিল্প পরিচালিত হয়। এই শিল্পের নির্মাণ কার্য্যের স্থানের কোন স্থিরতা নাই।

(২) **বাণিজ্য** (Commerce) :—

কোন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়কে বাণিজ্য বলে। কাঁচা পণ্য হইতে কোন দ্রব্য তৈয়ার করিয়া উহা বিক্রয় অথবা তৈয়ার অবস্থায় কোন পণ্য ক্রয় করিয়া তাহা বিক্রয়কে বাণিজ্য বলা হয়। ইহাতে পণ্যের মালিকানা পরিবর্তন হয়। সেবা কার্য্যও এই বাণিজ্যর সহিত জড়িত। কারণ সেবা ভিন্ন বাণিজ্যের কথা চিন্তা করা যায় না। সুতরাং কাঁচামাল খরিদ হইতে শুরু করিয়া উহা ভোগের জন্য ক্রেতার হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়ার সমস্ত কাজকেই বাণিজ্য বলা যাইতে পারে। স্থান, কাল ও পাত্রের উপযোগ সৃষ্টিদ্বারা সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়া মানুষের চাহিদার তৃপ্তি সাধনই বাণিজ্যের প্রধান কাজ।

ব্যবসা (Trade) :—

পণ্যের বিনিময়কে সাধারণতঃ ব্যবসা বলা হয়। এই ব্যবসা স্থানীয়, আঞ্চলিক, খুচরা, পাইকারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যাহাদের সাহায্যে এই ব্যবসা সম্পন্ন করা হয় তাহাদিগকে ব্যবসা-সহায়ক বলে। ইহারা ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে। গুদামজাত, ব্যাঙ্ক, পরিবহণ প্রভৃতিকে ব্যবসায়ের সহায়ক বলা হয়। ইহার জন্যই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দূরত্ব দূর হইয়া যায় এবং উভয়েই উপকৃত হয়।

সংগঠনের অর্থ, মৌলিক তত্ত্ব ও তাৎপর্য্য (Meaning, Principle and Significance of Organisation) :—

সংগঠন বলিতে আমরা সাধারণ কথায় সুন্দরভাবে গঠনকেই বুঝিয়া থাকি। কারবারের বিভিন্ন পদ্ধতির ও বিভাগের মধ্য সমন্বয় সাধনকেও সংগঠন বলা যাইতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, কোন পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও যোগানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ উদ্যোক্তা দ্বারা যে ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযোজিত হয় হয় তাহাই সংগঠন।

অধ্যাপক হেনির (Prof. Henny) মতে, "এক বা একাধিক সম-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ অংশসমূহের সুসামঞ্জস্য সমন্বয় বিধানকে সংগঠন বলা হয়।"

ইহার মৌলিক তত্ত্ব ও তাৎপর্য (Principle & Significance)

(১) **উদ্দেশ্য** (Objective) :—

সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকিবে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান দ্বারা এই উদ্দেশ্য রচিত হয়।

(২) **নিয়ন্ত্রণ** (Control) :—

ব্যক্তিগত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলিয়া উর্ধ্বতন কর্মচারী নীচের কর্মচারীর উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করিতে পারে। নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সমস্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজ হয়। একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তাহার অধীনের প্রায় ২০ জন কর্মচারীকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

(৩) **ক্ষমতা ও দায়িত্ব** (Authority and Responsibility) :—

ইহাদের একটি অপরটি ভিন্ন চলিতে পারে না। জোর করিয়া চালানোর চেষ্টা করিলে দুর্বল হইয়া পড়ে। ক্ষমতা ভিন্ন দায়িত্ব অথবা দায়িত্ব ভিন্ন ক্ষমতার কথা চিন্তা করা যায় না।

(৫) **কাজের বিভাগ** (Division of Work) :—

সমস্ত কাজকে বিভিন্ন কর্মীর ভিতরে সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় কে কোন কাজ করিবে তাহা লইয়া ভুল বোঝাবুঝি হইতে পারে। ইহাতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয়। সুষ্ঠু সংগঠন ইহার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে।

(৫) **স্তরনীতি** (Scalar Principle) :—

উপরের কর্মচারীর ক্ষমতা নীচের কর্মচারীর উপর কি প্রকার হইবে তাহা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা উচিৎ। ইহাতে কর্মচারীরা তাহাদের নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হইতে পারিবে, এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পাইবে।

(৬) **ভারসাম্য** (Balance) :—

কারবার বড় হইলে উহার কাজের পরিধিও বিস্তৃতি লাভ করে। তখন একটি বিভাগে উহা সীমাবদ্ধ থাকে না। সেজন্য বিভিন্ন বিভাগ থাকিলে তাহাদের মধ্যে কাজের ভারসাম্য যাহাতে নষ্ট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং কাজের ভারসাম্য রক্ষাও সংগঠনের মূলনীতি।

(৭) **পরিবর্তনশীল** (Flexible) :—

ইহা কারবারে একান্ত দরকার। প্রয়োজন বোধে কারবারকে পরিবর্তন করিতে হইতে পারে। এই সম্ভাবনা যদি না থাকে তবে উহার উন্নতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেজন্য পরিবর্তনশীলতাকে সংগঠনের অন্যতম নীতি বলা হয়।

(৮) **আদেশের সঙ্গতি** (Unity of Command :—

ব্যবসায়ে ইহা একান্ত দরকার। বিভিন্ন প্রকার আদেশের মধ্য যদি কোন সঙ্গতি না থাকে তবে সেখানে কাজ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য বিভিন্ন প্রকার আদেশের মধ্য সঙ্গতি রক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(৯) **ব্যয় সঙ্কোচ** (Economy) :—

একমাত্র প্রচুর খরচ দ্বারা কারবার বড হইতে পারে না। সেজন্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয় যাহাতে না হয় সেদিকে যথেষ্ঠ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাও সংগঠনের মূলনীতি।

(১০) **অধিকার ও দায়িত্ব ভারার্পণ** (Delegation of Authority and Responsibility :—

কাজ বণ্টনের সাথে সাথে অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টনও একান্ত প্রয়োজন। যাহাকে কাজ করিতে বলা হইবে সে উহা ভালভাবে করিবে। সেজন্য তাহাকে ঐ কাজ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিতে হইবে। ইহা না দিলে সে কাজ করিতে পারিবে না। এজন্য কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য অধিকার ও ক্ষমতা উভয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে।

(১১) কৈফিয়ৎ গ্রহণ (Accountablity) :—

প্রত্যেক অধস্তন কর্মচারী তাহার কাজের জন্য উর্ধ্বতন কর্মচারীকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকিবে। এই নীতি কার্যকর থাকা প্রয়োজন কারণ ইহাদ্বারা কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়।

(১২) কর্মী নিয়োগ (Staff Appointment) :—

কারবারের সফলতা কর্মীর উপর নির্ভর করে। সেজন্য কর্মী নিয়োগের সময় সচেতন হইতে হইবে। শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ কর্মীই সর্বদা বাঞ্ছনীয়। এরূপ কর্মী নিয়োগের পর তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করিয়া দিতে হইবে। ইহাও সংগঠনের মূলনীতি।

(১৩) কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ (Centralised Control) :—

বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় রাখিয়া সমস্ত কাজ পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা থাকা উচিৎ। ইহারাই কারবারের সমস্ত কাজ তদারক করিবে।

(১৪) স্থিতিশীলতা (Continuity) :—

কারবার দীর্ঘদিন ধরিয়া চালাইবার জন্য আরম্ভ করা হয়। সেজন্য উহার স্থিতিশীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখাও সংগঠনের অন্যতম মূলনীতি।

সংগঠনের গুরুত্ব (Importance of Organisation) :—

কারবারে সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। সংগঠনের উপর নির্ভর করিয়া কোন কারবার উন্নতি লাভ করে আবার দুর্বল সংগঠন হইলে কারবার বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং সংগঠনের গুরুত্ব আমরা সংক্ষেপে নিম্নরূপে আলোচনা করিতে পারি।

(১) সংগঠন দ্বারা ব্যবস্থাপনা দৃঢ় হয় এবং কাজের ভিতরে ভুল বোঝাবুঝি থাকে না।

(২) সংগঠনের ফলে কর্মক্ষেত্রে যে সুন্দর ও উন্নত সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহা দ্বারা প্রত্যেক কর্মচারী বিনা অসুবিধায় নিজ নিজ কাজ করিতে পারে।

(৩) উন্নত ধরণের সংগঠন থাকিলে উহা হইতে উন্নত ধরণের সংযোজন সহজসাধ্য হয়।

(৪) সংগঠনের উপর কারবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে কারণ ইহা দ্বারা কর্মচারীদের প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপায়িত হয়।

(৫) সুন্দর সংগঠন কার্য বিভাজনকে অনেকাংশে সাহায্য করে। ইহাতে প্রত্যেক কর্মচারী অপরের আদেশের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের নিজ নিজ কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিতে পারে।

(৬) এই সংগঠনই বিভিন্ন কাজের ভিতর দিয়া কর্মচারীকে আরও দক্ষ ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করে।

(৭) বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি সুস্থ্য সংগঠন দ্বারাই কারবার হইতে বিতাড়িত হয়।

(৮) বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব একমাত্র দৃঢ় ও সুস্থ্য সংগঠন হইতেই সম্ভব হইয়াছে।

ব্যবস্থাপনার অর্থ, কার্য ও গুরুত্ব (**Meaning, Functions and Importance of Management**) :—

অপরের দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন করাইয়া লওয়ার পদ্ধতিকেই ব্যবস্থাপনা বলে। এই ব্যবস্থাপনা বলিতে কোন কারবারের সুপরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত সকল প্রকার কার্যকেও বোঝায়। এই ব্যবস্থাপনার কার্যকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

(১) **পরিকল্পনা** (Planning) :—

ইহাকে ব্যবস্থাপনার প্রথম স্তর বলে। কোন কারবার শুরু করিবার প্রথমে উহার পরিকল্পনা করিতে হইবে। আর এই সকল পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইবে। সুতরাং পরিকল্পনাকে ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্য বলা হয়।

(২) **সংগঠন** (**Organisation**) :—

ইহাকে ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় স্তর বলে। পরিকল্পনার কাজ শেষ হওয়ার পরে উহার সংগঠন কি হইবে তাহাও ব্যবস্থাপনার দ্বারাই ঠিক করিতে হইবে। সংগঠন ছাড়া ব্যবস্থাপনার কাজ সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। সেজন্য কি প্রকার সংগঠন হইবে তাহা ঠিক করাও ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্জ।

(৩) **নির্দেশ** (Direction) :—

কোন কর্মী কি কাজ করিবে, কতদিনে উহা শেষ করিবে, কিভাবে কাজ করিতে শুরু করিবে তাহাও ব্যবস্থাপনা ঠিক করিয়া দিবে। ইহাতে সুষ্ঠু ভাবে কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। এই নির্দেশ দানকে ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্য বলা হয়।

(৪) **সংযোজন** (Co-ordination) :—

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অপেক্ষা সম্মিলিত প্রচেষ্টা অনেক সময় ভাল হয়। সেজন্য বিভিন্ন বিভাগ, ও কর্মীর মধ্য সংযোগ সাধন করিতে হইবে। ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই সংযোজনের কাজও ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্য।

(৫) **অনুপ্রেরণা** (Motivation) :—

কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মীকে অনুপ্রেরণা দিতে হয়। ইহাতে তাহাদের কাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দ্রুত কাজ শেষ করিতে পারে। এই অনুপ্রেরণার জন্য কর্মীদের অভাব-অভিযোগের দিকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। সেজন্য বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রেরণা প্রদানও ব্যবস্থাপার অন্যতম কার্য।

(৬) **নিয়ন্ত্রণ** (Control) :—

বিভিন্ন প্রকার কাজের মান নির্ধারণ, সম্পাদন, সংশোধন প্রভৃতির জন্য সমস্ত সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। এই সকল কাজ ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে কারবার উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

(৭) **আধুনিকীকরণ** (Modernisation) :—

বর্তমানে কারবার পরিচালনা ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্য। কিন্তু কারবার পরিচালনা করিতে হইলে কারবারের কিছু কিছু অংশের পরিবর্তন দরকার হইতে পারে। অন্যথায় কারবার পরিচালনা সম্ভব হয় না। সেইজন্য বিভিন্ন অংশের নবীকরণ বা আধুনিকীকরণ প্রয়োজন হয়। এই নবীকরণ বা আধুনিকীকরণও সেজন্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়।

ইহার গুরুত্ব :—

প্রতিটি কারবারের ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। কারবার করিতে হইলে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয় তাহার মধ্যে এই ব্যবস্থাপনাকে শীর্ষস্থানীয় উপাদান বলা হয়। এই ব্যবস্থাপনাই অন্যান্য উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেজন্য ব্যবস্থাপনার উপর কারবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। যাহারা এই ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালনা করেন তাহাদিগকে ব্যবস্থাপক বলা হয়। সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে সুপরিকল্পিত কয়েকটি স্তরে প্রথমে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়। ইহার পরে তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপক দলের হাতে উহা সমর্পণ করা হয়। পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে তাহারা ঐ কার্য সম্পন্ন করে।

ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Management and Organisation) :—

ব্যবস্থাপনা	সংগঠন
(১) ব্যবস্থাপনার চারিটি অংশ দেখা যায়। যেমন, সংগঠন, প্রশাসন, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ।	(১) ইহাতে কোন অংশ নাই। ইহা একটি অংশ মাত্র।
(২) ইহা প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করে।	(২) সাংগঠনিক কাজ ইহাতে করা হয়।
(৩) ইহা একটি সমগ্র অংশ।	(৩) ইহা ব্যবস্থাপনার একটি অংশমাত্র।
(৪) অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লওয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য।	(৪) কাজও কর্মীর ভিতরে সমন্বয় সাধনই ইহার মূল কথা।

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের পার্থক্য (Distinction between Management and Administration :—

বিভিন্ন লোকের সহযোগিতায় কোন পণ্য উৎপণ্য করিতে হইলে সমস্ত কাজটিকে ঠিকভাবে উহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হয়। কারবারী প্রতিষ্ঠানের এই কার্য বণ্টন পদ্ধতিকে ব্যবস্থাপনা বলে আর অকারবারী প্রতিষ্ঠানে উহা প্রশাসন নামে পরিচিত।

অনেকে আবার বলেন, কোন নতুন নীতির স্থিরিকরণকে প্রশাসন বলে। আর ঐ নীতিকে কার্যে পরিণত করার পদ্ধতিকে ব্যবস্থাপনা বলে।

অনেকে আবার পরিচালনার সমগ্র রূপটিকে বুঝাইতে ব্যবস্থাপনা কথাটি ব্যবহার করেন এবং প্রশাসন বলিতে উহার অংশ বিশেষকে বুঝাইয়া থাকেন।

অধ্যাপক ব্রিচ (Prof. Brech) ব্যবস্থাপনা বলিতে পরিকল্পনা নীতি নির্ণয়, সংযোজন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিকে বুঝাইয়াছেন। আর প্রশাসন বলিতে মাত্র পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকেই বুঝাইয়াছেন।

হেনরি ফেওল (Henri Fayol) কিন্তু ঐ দুটি শব্দকে পৃথক অর্থে ব্যবহার না করার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাস্তবে এরূপ পার্থক্য করা খুব কঠিন।

সংযোজনের অর্থ ও গুরুত্ব (Meaning and Importance of Co-ordination) :—

দুই বা আরও বেশী ব্যক্তি যখন তাহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা কোন কার্য নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করে তখন তাহাকে সংযোজন বা সমন্বয় বলে। কোন ব্যবসায়ের সাফল্য ইহার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। এই সংযোজন আভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রে হইতে পারে।

ব্যবসায়ে ইহার **গুরুত্ব** :—

(১) একাত্মবোধ ভিন্ন কারবার ভালভাবে চলিতে পারে না। সংযোজন এই একাত্মবোধ কর্মীদের মধ্যে জাগ্রত করে।

(২) এই সংযোজনের দ্বারা বিভিন্ন কাজও বিভাগের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইহাতে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা দূর হয়।

(৩) সংযোজন বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেয়।

(৪) নতুন নতুন কার্যের মাধ্যমে এই সংযোজন কর্মীদের শক্তি, সামর্থ প্রকাশের সুযোগ করিয়া দেয়।

(৫) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহাদ্বারা ব্যবস্থাপনার শক্তি, প্রচেষ্টা সহজেই ফলপ্রসূ হইয়া উঠে।

(৬) বিভিন্ন লোকের সহযোগিতায় অতি কঠিন কাজও সহজসাধ্য হইয়া উঠে।

সহযোগিতার অর্থ ও গুরুত্ব (Meaning and Importance of Co-operation) :—

কোন কার্য সম্পন্ন করিতে যখন একাধিক ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে তখন তাহাকে সহযোগিতা বলে।

কারবার যখন বড় হয় তখন উহার কার্য পরিচালনা একজনের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনও একটি বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তখন বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ইহা বিস্তারলাভ করে। এই সময় কারবারের সুনাম রক্ষা করিয়া পণ্য উৎপন্ন করিয়া বিক্রয় করা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য একটি বিভাগ অপর বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিবে এটাই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় এইরূপ সহযোগিতা না করিলে পণ্য উৎপাদনও ব্যহত হইবে। ইহাতে কারবারের সুনাম নষ্ট হয়। শুধু বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা নহে। পরিচালনার কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিও পবস্পর পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে অন্যথায় সুষ্ঠ পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে। ফলে কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই দুটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধু সহযোগিতা দরকার হয় না। কারবারের প্রতিটি স্তরে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং কারবারে সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

নিয়ন্ত্রণের অর্থ ও গুরুত্ব (Meaning and Importance of Control) :—

কোন কারবারের পরিকল্পনা, আদেশ প্রভৃতি ঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা তদারক করার কাজকে নিয়ন্ত্রণ বলে। ব্যবস্থাপনার কাজ ঠিকভাবে করিতে-হইলে এই নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। কোন কারবারে উহাদের অবদান বা গুরুত্ব সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

(১) পরিকল্পনা অনুযায়ী ইহা কাজ করিতে সাহায্য করে।

(২) নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন এই নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সম্ভব হইতে পারে।

(৩) সংযোজন কাজকেও ইহা অনেকাংশে সাহায্য করিয়া থাকে।

(৪) ব্যবস্থাপনায় কোন অবাস্তব পরিকল্পনা থাকিলে তাহা এই নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সংশোধিত হইয়া যায়।

(৫) ইহা স্বায়ত্তশাসনের অসুবিধা দূর করে।

(৬) ইহা দ্বারা কর্মচারীদের ভেতরে শৃঙ্খলাবোধ দেখা দেয় এবং কর্মচারীদের কর্তব্যপরায়ণ হইতে সাহায্য করে।

(৭) ইহা প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় দূর করে।

(৮) ইহা পরিকল্পনা ও কার্য সম্পাদনের মধ্যে প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপন করে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. কারবার বলিতে কি বুঝ ? কারবারের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

   (What is meant by Business ? Discuss the Features of Business.)

2. আধুনিক সমাজে কতকগুলি উদ্দেশ্য লইয়া কারবার পরিচালিত হয়। ঐ উদ্দেশ্যগুলি কি ?

   (In modern Society business is Conducted with Certain objectives in view. What are those objectives ?)

3. কারবারের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক আলোচনা কর।

   (Discuss the Individual and Social aspect of Business)

4. সমস্ত কারবারের মূলগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

   (Discuss the basic features Common to all business Enterprises.)

5. সফলকাম কারবারীর অত্যাবশ্যক গুণাবলী আলোচনা কর।

   (Discuss the Essential Qualifications for a successful business-man.)

6. ইহা বলা হয় যে কারবারের দুইটি দিক আছে—ব্যক্তিগত ও সামাজিক। এই দিকগুলি আলোচনা কর।

   (It is said that Business has got two aspects—Individual and Social. Explain these aspects.)

7. "কারবারের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফালাভ।" আলোচনা কর।

   ("Sole object of Business is to earn Profit"—Discuss.)

8. কারবারের শ্রেণীবিভাগ কর এবং ব্যবসা, শিল্প ও বাণিজ্যর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

   (Classify Business, and differentiate among Trade, Industry and Commerce.)

9. সংগঠন কাহাকে বলে ? ইহার মৌলিক নীতি ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

   (What is Organisation ? Discuss its Principles and significance.)

10. ব্যবস্থাপনা কাহাকে বলে? ইহার কার্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
(Define Management. Discuss its Functions and importance.)

11. কারবারে সংগঠনের গুরুত্ব আলোচনা কর।
(Discuss the Significance of Organisation in Business.)

12. পার্থক্য নির্ণয় কর :—
(a) ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের।
(b) ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের।
Distinguish between :—
(a) Management and Organisation.
(b) Management and Administration.

13. সংযোজন, সহযোগিতা ও নিয়ন্ত্রণের অর্থ ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
(Define Co-ordination, Co-operation and Control. Discuss their Importance.)

14. ব্যবস্থাপনার অর্থ লোক দ্বারা কাজ করান। বিশদভাবে আলোচনা কর।
(Management is getting things done by people. Discuss fully.)

15. ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য নির্ণয় কর।
(Clearly explain the difference between Management and Administration.)

16. "সংযোজন ভিন্ন সহযোগিতা মারাত্মক"—আলোচনা কর।
("Co-operation without Co-ordination is fatal"—Discuss.)

17. সংযোজন ও নিয়ন্ত্রণের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন, ব্যাখ্যা কর।
(Explain why so much Importance is attached to Co-ordination and Control.)

18. "ভাল ব্যবস্থাপনা সংযোজক ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করে"—আলোচনা কর।
("Good management depends on Co-ordination and Co-operation."—Discuss)

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও কারবার সংগঠন

(Economic System and Organisation of Business)

মিশ্র অর্থনীতির অর্থ ও উহার বৈশিষ্ট্য (Meaning and Features of Mixed Economy) :—

বর্তমান যুগে কারবারী ক্ষেত্রে **তিনপ্রকার** অর্থনীতি দেখা যায়। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমস্ত কারবার ব্যক্তিগত মালিকানায় গড়িয়া উঠে যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত কারবার সরকার পরিচালনা করে। ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। যেমন রাশিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়। আর যে অর্থনীতিতে সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রকার মালিকানাকে কাজ করিতে দেখা যায় তাহাকে মিশ্র-অর্থনীতি বলে। এইরূপ অর্থনীতিতে সরকারী ও বে-সরকারী মালিকানায় সমানভাবে কাজ হইতে দেখা যায় এবং একে অপরকে সাহায্য করে। ইহা ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলিতে হয়, যে অর্থনীতিতে সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রকার মালিকানাই দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে **মিশ্র অর্থনীতি বলে**। এই মিশ্র অর্থনীতির **বৈশিষ্ট্যগুলি** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(১) **সরকারী ও বে-সরকারী মালিকানার সহ-অবস্থান :—**

এই অর্থনীতিতে শিল্পগুলি সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রকার মালিকানায় পরিচালিত হয়। ইহাতে সরকারী বে-সরকারী মালিকানা সমানভাবে কাজ করিতে পারে। এই মালিকানার কোনটি অপরটি অপেক্ষা কোনক্রমেই ছোট নহে। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি হইতেই এই পদ্ধতি ভারতবর্ষে গৃহীত হইয়াছে।

(২) **সরকারী ও বে-সরকারী মালিকানার সীমা :—**

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে সমগ্র শিল্পকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি ১৭টি শিল্পকে প্রথম শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে। ইহাদের মালিকানা ও পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে সরকারের। দ্বিতীয়

শ্রেণীর শিল্পগুলির মধ্যে রাসায়নিক সার, কৃত্রিম রবার, ঔষধ প্রভৃতি ১২টি শিল্পকে রাখা হইয়াছে। ইহারা সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রকার মালিকানায় পরিচালিত হইতে পারে। অবশিষ্ট শিল্পকে তৃতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে। ইহাদের পরিচালনা ও মালিকানা বে-সরকারী আওতাভুক্ত।

(৩) বে-সরকারী শিল্পে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ :—

১৯৫১ সালের শিল্প আইনে বলা হইয়াছে যে, এক লক্ষ টাকার অধিক মূলধন সম্পন্ন কোম্পানীকে সরকারী লাইসেন্স লইতে হইবে। ইহাদের সম্প্রসারণ সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষ। ইহা ছাড়াও প্রয়োজনবোধে সরকার ক্রেতাদের স্বার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এমনকি পরিচালনা নিজের হাতে লইতেও পারে।

(৪) অবাধ বাণিজ্যনীতির অবসান :—

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য সরকার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। জাতীয় স্বার্থে ইহা একান্ত দরকার। প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে আমদানি লাইসেন্সও সরকার দিতে পারে।

(৫) সরকারী ও বেসরকারী মালিকানার ভারসাম্য রক্ষা :—

সমাজের কল্যাণের জন্য এই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। এই উভয়প্রকার মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানই একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবে। সেজন্য উভয়ের মধ্যে সমন্বয় অপরিহার্য। আর এই সমন্বয় সাধনের জন্য ভারতে বিভিন্ন প্রকার কারবারী কার্যকলাপকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় আনা হইয়াছে। ইহা দ্বারা উহাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হইবে।

(৬) যৌথ কোম্পানী পরিচালনায় সরকারী হস্তক্ষেপ :—

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে এই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। এই সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে সকল প্রকার যৌথ মূলধনী কারবারের হিসাব রক্ষা পদ্ধতি সরকারী আইন অনুসারে করিতে হইবে। যৌথ কোম্পানীর পরিচালক সমিতিতে সরকার মনোনীত সংখ্যালঘু প্রতিনিধি থাকিবে। সাধারণ সভা, ব্যবস্থাপকের অপসারণ, মূলধন সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারেও সরকারী আইন কার্যকরী হইবে।

(৭) **সামাজিক নিরাপত্তা :—**

শ্রমিক কল্যাণ মূলক ব্যবস্থাই ইহার মূলনীতি। বিনামূল্যে শ্রমিকের চিকিৎসা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুবিধা, অসুস্থতা, নারীশ্রমিকের মাতৃত্বের কারণে বেতনসহ ছুটি মঞ্জুর প্রভৃতি এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম।

(৮) **সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিনিয়োগ হার :—**

সরকারী ও বে-সরকারী মালিকানা উভয় পদ্ধতিতে দেশের শিল্পের উন্নতি হয়। কোন খাতে কত অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে তাহা বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থির করা হয়। বৃহদায়তন ও খনিজ শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছিল ৫৪ : ৪৬ অনুপাত এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ছিল ৫৭ : ৪৩ অনুপাত।

(৯) **জনকল্যাণ :—**

বে-সরকারী মালিকানার মুনাফা অপেক্ষা সরকারী মালিকানায় কম মুনাফা হয়। সরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কারবারে অধিক গুরুত্ব অর্পণ করা হয় জনকল্যাণ মূলক কাজে। সেজন্য মুনাফার পরিমাণ কম হয় এবং জনকল্যাণই তখন ইহার মূলমন্ত্র হইয়া উঠে।

(১০) **প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা :—**

জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের জন্য এই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। সম্পত্তি কর, দান কর, ব্যয় কর, প্রভৃতি প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার অন্যতম। ইহা ছাড়াও আয় কর নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই প্রকার প্রগতিশীল নীতি লক্ষণীয়।

ভারতবর্ষে মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা (**Necessity for the introduction of Mixed Economy in India**)

বর্তমান ভারতে মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উন্নতির সাথে সাথে প্রাচীন ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা আজ ধ্বংসের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেজন্য সরকারী ও বে-সরকারী উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় সমগ্র অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। জনজীবন বিপর্যস্ত হইবে। ইহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজ দেশের সকল প্রকার শিল্প ও বাণিজ্যকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হইতেছে।

জনগণের উন্নতির দ্বারা গণতান্ত্রিক সরকার স্থায়ী হইতে পারে। সেজন্য

সরকারকে সমাজের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। জনকল্যাণমূলক কাজ করার জন্যই সরকার আজ পরিবহণ ব্যবস্থা, গ্যাস, জল, বিদ্যুৎ, বীমা, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিজের হাতে লইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিশেষ প্রয়োজন। সেজন্য ভারতবর্ষে আজ এই সকল প্রতিষ্ঠান সরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রাষ্ট্র বহুকাল হইতে শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আইনপ্রনয়ণ করিয়াছে। ক্রেতাদের সুবিধার জন্য পণ্যের গুণগত মানও সরকার নির্ধারিত করিয়াছে। এইরূপে সরকার ক্রমে ক্রমে সকল কারবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। সেজন্য অনেকে মনে করেন সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সাধন হওয়া দরকার। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সকলে সুস্থ ভাবে বাঁচিতে পারে না। সেজন্য আজ রাশিয়া, প্রভৃতি দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। দেশের সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার উপরে থাকিবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ। ইহার ফলে সম্ভব হইবে দেশের সামগ্রিক উন্নতি।

কোন কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজে সমন্বয় প্রয়োজন। অনুরূপভাবে দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও সমন্বয় সাধন দরকার। কিন্তু ইহা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব নহে। সেজন্য দরকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আমাদের দেশ গরীব হওয়ায় ইহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হয় নাই। সেজন্য কিছুটা সরকারী ও কিছুটা বে-সরকারী মালিকানায় অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতি পদ্ধতিতে আমাদের দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান একত্রে কাজ করিবে। একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া সহযোগিতা করিবে। সুতরাং ভারতীয় অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসারে অগ্রসর হইতেছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তিগত ও স্বাধীন মালিকানার কথা স্বীকার করা হইয়াছে। সেজন্য ভারতে আজ মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সীমারেখা করিয়া দিয়াও সরকার ব্যক্তিগত ও সরকারী কারবারকে পাশাপাশি চলিতে সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং ভারতে এই মিশ্র অর্থনীতির ভূমিকা একটি সময় উপযোগী ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে দ্বিমতের কারণ নাই।

প্রাথমিক শিল্পগুলিতে সরকারী পরিচালনা ও মালিকানা (Government Management and Ownership of Basic Industries) :—

কোন দেশের শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উপর। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া শুধু শিল্প নয়, দেশের কোন কিছুর উন্নতিই সম্ভব হয় না। এই নির্দিষ্ট পরিকল্পনার জন্য আবার দরকার হয় স্বাধীন সরকারের। কারণ স্বাধীন সরকার না থাকিলে কে ঐ সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে। ব্যক্তিগত মালিকানায় ইহা সম্ভব নহে। কারণ সেবা অপেক্ষা মুনাফাই এই ব্যক্তিগত মালিকানায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পরাধীনতার সময় সেজন্য ভারতবর্ষে কোন পরিকল্পিত, সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি ছিল না। আর সেইজন্য আজ ভারত শিল্পের উন্নতিতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক পিছিয়ে আছে। ব্যবসায়ীগণ ও মহাজন গণ দরিদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দিনের পর দিন শোষণ করিয়াছে। ঐ সময় জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ বিদেশে প্রেরিত হইত। আর ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। ভারত হইতেই বিদেশী সরকার কাঁচামাল তাহাদের দেশে প্রেরণ করিত এবং ইহা হইতে উৎপন্ন পণ্য বেশীদামে আবার ভারতবর্ষে বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা অর্জন করিত। এ সময় ভিত্তিমূলক ও মূলধনী শিল্পের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নতুন শিল্পনীতি গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালে ভারতবর্ষে প্রথম শিল্পনীতি গৃহীত হয় এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া আরও উন্নত শিল্পনীতি হয় ১৯৫৬ সালে।

এই শিল্পনীতিতে সমগ্র শিল্পকে সরকারী ও বে-সরকারী মালিকানায় বিভক্ত করা হয়। একমাত্র বে সরকারী মালিকানায় সমস্ত শিল্প রাখিলে উহার দ্রুত উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ সেখানে মুনাফা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এবং অনেক কাজ আছে যাহার ব্যয়ভার বহন বে-সরকারী মালিকানায় সম্ভব নয়। এমনকি কতকগুলি শিল্প আছে যাহাদের উন্নতি ব্যক্তিগত মালিকানায় ছাড়িয়া দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। এই শিল্পগুলিকে ভিত্তিমূল ও মূলধনী শিল্প বলে ; যেমন, গোলাবারুদ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, প্রভৃতি। সেজন্য ব্যক্তিগত মালিকানায় একমাত্র ভোগ্যপণ্য ছাড়িয়া দেওয়া উচিৎ। এই ভিত্তিমূলক শিল্পের উপর দেশের অপর শিল্পও অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেজন্যে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে ঘোষিত হয় যে, ভিত্তিমূলক ও প্রয়োজনীয় সকল শিল্প সরকারী মালিকানায় পরিচালিত হইবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বে-সরকারী মালিকানায়ও ইহা চলিতে পারে কিন্তু প্রয়োজনবোধে সরকার উহা জাতীয়করণ করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া দেশরক্ষা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রভৃতি সরকারী

মালিকানায় পরিচালিত হইবে। সেজন্য আমরা দেশের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে সরকারী মালিকানা সর্বদা সমর্থন করি।

শিল্পজাত পণ্যের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা (Role of Government over distribution and Prices of Manufactured goods) :—

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মূল কথা। ইহাতে সামাজিক স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিলেও ব্যক্তিগত স্বার্থকে অবহেলা করা হয় না। মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থাতে জনগণের কল্যাণের জন্য সরকারকে উদ্‌যোগী হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষেও আজ এই প্রকার প্রচেষ্টা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

এই মিশ্র অর্থনীতিতে পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী কম মূল্যে উহা বাজারে সরবরাহ করা যায়। এবং সুস্থ নীতি অনুযায়ী পণ্য মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে। ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হইলেও যুদ্ধোত্তর কালে দ্রব্যমূল্য কিন্তু স্বাভাবিক স্তরে ফিরিয়া আসে। প্রত্যেক দেশের সরকার এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি রোধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারত সরকার প্রথমে পণ্যমূল্য রাখার জন্য সম্মেলন, কমিশন প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু ইহার ফল শুভ হয় নাই। ফলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যুদ্ধের সম্ভাবনা ও সরকারী প্রচেষ্টা কার্যকরী না হওয়ায় একপ্রকার ব্যবসায়ী লাভবান হইতে শুরু করিল। লোকের দুঃখও ইহাতে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই মূল্য বৃদ্ধি যুদ্ধোত্তর যুগেও আজ আমরা দেখিতে পাই। পণ্যের মূল্য পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনধারণ করা এক সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। একান্ত প্রয়োজনীয় পণ্য অসাধু ব্যবসায়ীরা ধরিয়া রাখিয়া কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। ধনী ব্যক্তিদের উচ্চমূল্যে সরবরাহ করিয়া প্রচুর মুনাফা অর্জন করিতেছে। কিন্তু কোন জনদরদী সরকার চুপচাপ এ অবস্থা দেখিতে পারে না। সেজন্য আজ সরকার পণ্য বণ্টনের উপরও হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহা দ্বারা জনগণের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। সেজন্য প্রতিটি পণ্যের নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন সরকারী পর্য্যায়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে জনগণ ন্যায্য মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে। সেজন্য শুধুমাত্র শিল্পজাত পণ্য নহে, সকলপ্রকার পণ্যের বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ সরকারকে লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন বর্তমান অবস্থায় দরিদ্র জনগণের বাঁচিবার আর দ্বিতীয় পথ নাই।

কারবারের আয়তন পরিমাপের নীতিসমূহ (Factors that determine the Size of a Business Unit) :—

কারবারের আয়তন পরিমাপের কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। বিভিন্ন প্রকৃতির কারবারের আয়তন উহার নিজ নিজ বিভিন্ন বিষয় দ্বারা পরিমাপ করিতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, মোটামুটি এই আয়তন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা অনেকটা পরিমাপ করা যায়।

(ক) **মূলধন :—**

অধিক মূলধন লইয়া যে কারবার গঠিত হয় তাহাকে আমরা বৃহৎ কারবার বলিয়া থাকি। এরূপ কারবারের মূলধন সাধারণতঃ ২০ লক্ষের অধিক হয়। আর এই মূলধন ৫ হইতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে তাহাকে মাঝারি এবং ৫ লক্ষ টাকার কম হইলে তাহাকে ছোট কারবার বা ব্যবসা বলা হয়। সুতরাং মূলধনের পরিমাপ দ্বারা কারবারের আয়তন নির্ণয় করা যাইতে পারে।

(খ) **শ্রমিক :—**

শ্রমিকের পরিমাণ দিয়াও কোন প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারণ করা যায় শ্রমিক সংখ্যা খুব বেশী হইলে তাহাকে আমরা বৃহৎ কারবার বলিতে পারি।

(গ) **কাঁচা পণ্যের ব্যবহার :—**

কোন কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন উহার ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যবহার দ্বারাও নির্ধারণ করা যায়।

(ঘ) **উৎপাদিত পণ্য ও তাহার মূল্য :—**

মোট উৎপাদিত পণ্য ও তাহার মূল্যদ্বারাও কোন কারবারের আয়তন নির্ধারিত হইতে পারে। যে সকল প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট মানের পণ্য উৎপন্ন হয় সে সকল স্থানে ইহা দ্বারা আয়তন সহজে পরিমাপ করা যায়। যেমন, চিনি, সিমেণ্ট প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান। পণ্যের মূল্য দ্বারা আয়তন ঠিক করার সময় দ্রুত মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হইবে। অন্যথায় প্রকৃত অবস্থা পরিমাপ করা যাইবে না।

(ঙ) **উৎপাদন ক্ষমতা :—**

পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারাও কারবারের আয়তন নির্ণয় করা যায়। যে সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের মান একরূপ নহে সে সকল

স্থানে এই যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা কারবারের আয়তন পরিমাপে বিশেষ সাহায্য করে।

(চ) মুনাফা :—

ইহা দ্বারাও কারবারের আয়তন নিরূপণ করা যায়। এক্ষেত্রে ধরিয়া লইতে হইবে যে কারবারটি সৎপথে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। অন্যথায় বিভিন্ন খারাপ কাজের মাধ্যমে এই মুনাফা বৃদ্ধি পাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই মুনাফা কারবারের পরিমাপক হিসাবে আর কাজ করিতে পারিবে না।

সুতরাং উপরোক্ত বিষয়দ্বারা আমরা কোন কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিমাপ করিতে পারি।

যে সকল অবস্থায় উভয় কারবারের আয়তন নির্ভর করে (Factors on which the size of any business unit depends) :—

(ক) কোন প্রতিষ্ঠানের আয়তন অনেকাংশে উহার উৎপাদিত পণ্যর উপর নির্ভর করে। অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রচুর মূলধন দরকার হয় যেমন, চিনি, সিমেন্ট ইত্যাদি। ইহাদের আয়তন সাধারণতঃ বড় হয়।

(খ) জনকল্যাণমূলক ও অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান যেমন বিদ্যুৎ, পরিবহণ প্রভৃতি, ইহাদের আয়তনও বড় হয়।

(গ) যে সকল শিল্পে জটিল ও কঠিন প্রকৃতির পণ্য উৎপাদিত হয় তাহাও বৃহদাকার হইতে দেখা যায় যেমন, কম্পটোমিটার, মোটরযান প্রভৃতি।

(ঘ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রেতার রুচি, অভ্যাস প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সে সকল কারবার বড হইতে পারে না। যেমন উচ্চ শ্রেণীর আসবাবপত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি। চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে উৎপাদনেরও হ্রাস, বা বৃদ্ধি ঘটে।

(ঙ) অনেক পণ্য আছে যাহা কোনদিন বৃহদাকারে উৎপন্ন হইতে পারে না ; কারণ তাহাদের বাজার সীমিত। বেশী উৎপাদন করার অর্থ লোকসান।

(চ) কারবারের আয়তন আবার পরিবহণ ব্যয়ের দ্বারাও অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। পরিবহণ খরচ বেশী হইলে সে সকল কারবার বৃহদায়তনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

(ছ) কারবারের উন্নতি যখন সুনিপুণ শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল হয় তখন ঐ কারবার বৃহৎ হইতে পারে না।

(জ) পণ্যর প্রকৃতি ও স্থায়িত্বের উপরও কারবারের আয়তন অনেকাংশে নির্ভর করে। যে পণ্য যত পচনশীল হইবে তাহার বাজার ততই ক্ষুদ্র হইবে যেমন মাছ দুধ, বরফ প্রভৃতি।

(ঝ) আঞ্চলিক পার্থক্যের জন্যও কারবারের আয়তন পৃথক হইতে দেখা যায়। যেমন বোম্বাই-এর শিল্প কোলকাতা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।

(ঞ) বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে কৃত্রিমভাবে এই আয়তন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সমানে চলিয়াছে। যেমন সংরক্ষণ দ্বারা পণ্যকে পচনমুক্ত করিয়া কারবারের আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু ইহা ব্যয় বহুল। সেজন্য বলা যায়, উপরে বর্ণিত কারণ সমূহের উপর কোন কারবারের আয়তন নির্ভর করে।

কারবারী প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম এবং কাম্য আয়তনের ধারণা (Concept of Economic and Optimum size of Business Unit) :—

সকল শিল্পের জন্য একটা নির্দিষ্ট মানের উৎপাদন ব্যবস্থা দরকার। প্রয়োজনীয়-মান অপেক্ষা উৎপাদন পদ্ধতি ছোট হইলে ঠিকমত পণ্য উৎপন্ন করা যায় না। লোকসানে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। যান্ত্রিক উৎপাদনও এই সময় সম্ভব হয় না। সেজন্য যে নিম্নতম আয়তনে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে পণ্য উৎপাদন করা যায় তাহাকে **সর্বোত্তম আয়তন** বলে। এই আয়তন হইতে কোন কোন কারবার আবার বৃহদায়তন হইয়া পড়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ঐ একই রূপ থাকিয়া যায়।

ব্যবসায়ী কিন্তু এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। কারণ সব সময় এই আয়তনকে আরও বড় করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে তাহার মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এরূপভাবে বৃদ্ধি করিতে করিতে এমন একটা পর্যায় আসে যখন আর ব্যবসায়ের আয়তন সম্প্রসারণ লাভ-জনক মনে হয় না। এই অবস্থাকে প্রতিষ্ঠানের **কাম্য আয়তনের সীমা** বলে। ইহার পরে সম্প্রসারণ কারবারের মুনাফা হ্রাস করে। সেজন্য বলা যায়, যখন কোন একটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের এমন সীমায় আসিয়া পৌছায় যখন উহার সামান্য সম্প্রসারণও লাভ-জনক ভিত্তিতে সম্ভব হয় না তখনই তাহাকে **কাম্য আয়তনের প্রতিষ্ঠান** বলিতে পারি। এই অবস্থায় দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে গড় উৎপাদন খরচ সব চাইতে কম হয়।

ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহদায়তন কারবারের ধরণ এবং ভারতবর্ষে উহাদের স্থান (Concept of Small, Medium and Large Scale industries and their place in India) :—

যদি কোন কারবারে মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম হয় এবং শক্তির ব্যবহারের দ্বারা শ্রমিক সংখ্যা ৫০ জন হয় এবং শক্তি ব্যবহার না করিলে শ্রমিক সংখ্যা ১০০ জনের বেশী না হয় তবে উহাকে **ক্ষুদ্রায়তন কারবার** বলে।

আর যে কারবারে মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা বেশী অথচ ২০ লক্ষ টাকাব কম তাহাকে **মাঝারি আয়তন** কারবার বলে।

আর যে কারবারের মূলধনের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকাব বেশী তাহাকে **বৃহদায়তন কারবার** বলে।

ভারতবর্ষে ঐ তিনপ্রকার কারবারই দেখিতে পাওয়া যায়। মালিকানার ভিত্তিতে ইহাদের আবার একমালিকী, অংশীদারী, যৌথ কারবারী, সমবায় প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তন শিল্প ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করিয়া লইয়াছে। জাতীয় আয় সমিতির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হইতে ৯০০ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ একই সময়ে বৃহদায়তন শিল্প হইতে ৫৫০ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দ্বারা দেশের বেকার সমস্যা অনেকাংশে সমাধা হইতে পারে। সেজন্য ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। এই শিল্প আবার কৃষকদের আয়ের উৎস। কারণ সারা বৎসর চাষ হয় না। যখন চাষ বন্ধ থাকে তখন কৃষকেরা কুটির শিল্প দ্বারা তাহাদের জীবিকা অর্জন করিতে পারে।

আমাদের দেশে শিল্পের উন্নতি শুরু হইলেও এখনও সম্পূর্ণ উন্নতি সম্ভব হয়নি। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্প তাহার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল করিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতির জন্য দরকার হয় প্রচুর মূলধন, জাতীয় সম্পদ্ ও উন্নত কারিগর। ইহা ভারতে যথেষ্ঠ পরিমাণে দেখা যায় না। সেজন্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ইহার জন্য দরকার প্রচুর বিদেশী মূলধন, যাহা ভারতবর্ষের মত অনুন্নত কৃষি ভিত্তিক দেশের পক্ষে সম্ভব নয়।

বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতির ফলে দেখা যায় ধনবৈষম্য, গৃহসমস্যা প্রভৃতি। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ইহার কোন সমস্যা নাই। দেশের ধনবৈষম্য ও ব্যয় কমানোর

জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব অশেষ। ইহাতে স্থির ব্যয় কম বলিয়া মন্দার হাত হইতেও কারবার তথা দেশের অর্থনীতি সহজে রক্ষা পায়। স্বল্পকালের মধ্যে ইহা আবার পণ্য উৎপাদন করিয়া ঐ পণ্যর মূল্য ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করে। ইহাতে জনগণ উপকৃত হয়। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে এই ক্ষুদ্রও মাঝারি শিল্পের উন্নতিতে সকলের উদযোগী হওয়া উচিৎ।

কৃষিশিল্প ও কুটিরশিল্প ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া মৃৎ শিল্প, তাঁতশিল্প, পোশাক, বিড়ি, সাবান, ছাপাখানা, প্রভৃতি মাঝারি ও ক্ষুদ্রাকারে গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। ক্রয়-বিক্রয় শিল্পও ক্ষুদ্রাকার ও মাঝারি আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ভারতের অর্থনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। শুধু ভারতে বলিলে একটু ভুল হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শিল্পের শতকরা ৯১ ভাগ, জাপানের শতকরা ৮০ ভাগ এই ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্প। এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প যতটা ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করিতে পারে বৃহদায়তন শিল্পে তাহা সম্ভব নহে।

অনেক সময় এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের সহযোগী হইয়া কাজ করে। এমন অনেক কাজ আছে যাহার জন্য বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে হয়। জাপানের অনেক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দ্রব্যের অংশের জন্য ছোট প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। সেজন্য বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের উচিৎ ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দেওয়া। ইহাতে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদন ব্যয় কম হইবে। এই সকল কারণে ভারতীয় অর্থনীতিতে ও পরিকল্পনায় সরকার ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে।

বৃহদায়তন কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of Large Scale Industries) :—

মোটামুটিভাবে বৃহদায়তন শিল্পের **সুবিধাগুলিকে** নিম্নোক্ত **চারিপ্রকারে** বিভক্ত করা যায়।

(ক) **উৎপাদন ব্যয়সঙ্কোচ :—**

প্রতিটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করে। **পাইকারী** দরে অনেক কাঁচামাল ক্রয় করিলে অনেক কমদামে

উহা পাওয়া যায়। ফলে পণ্য উৎপাদন খরচ কম পড়ে। বাজারে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা যায়। **বিশেষজ্ঞদের** পরামর্শ ইহাতে পাওয়া যায়। ইহাতে **পরিবহণ খরচও** কম হয়। কারণ বেশী কাঁচামাল ক্রয় করিয়া একবারে বহন করিয়া আনা সম্ভব হয়। কারবার বড় হইলে **শ্রমবিভাগ সম্ভব** হয়। ফলে শ্রমবিভাগের সুবিধাও ইহাতে পাওয়া যায়। প্রতিটি কাজের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক নিয়োগ করা যায়। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকের **দক্ষতাও বৃদ্ধি** পায়। অব্যাহত গতিতে এই পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদন করা যায়। ইহাতে শ্রমিকও কাঁচামালের **পূর্ণ** ব্যবহার সম্ভব হয়। সব রকম **অপচয় বন্ধ** করা যায়। এই রূপ কারবারে **উপজাত ব্যবহার দ্রব্যের** প্রকৃত ব্যবহারও করা যায়। ইহাতে প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি পায় বলিয়া এই পদ্ধতিতে **গবেষণারও** যথেষ্ট সুযোগ আছে। উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হয় বলিয়া ইহাতে গবেষণার ব্যয় অনেক কম পড়ে।

(খ) **পুঁজির ব্যয় সঙ্কোচ :—**

বৃহদায়তন কারবারকে অনেকে বিশ্বাস করে এবং অনেকে অল্প সুদে টাকা দিতে রাজী হয়। সে জন্য **অল্প মূলধন** লইয়াও এই কারবার শুরু করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে কিন্তু ইহা সম্ভব হইতে পারে না।

অনেক মূলধন থাকে বলিয়া ইহাতে **মুনাফার** পরিমাণও বেশী হয় এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অপেক্ষা বৃহদায়তন শিল্পের বিক্রয় খরচ অনেক কম।

অনেক সময় প্রয়োজনে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান **একচেটিয়া** কারবার আরম্ভ করিয়া প্রচুর মুনাফালাভ করিতে পারে অথবা **অনাদায়ী দেনা** তুলিয়া লইতে পারে।

ব্যবসায়ে **মন্দা** দেখা দিলেও এই বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান সুস্থভাবে অনেক দিন কারবার পরিচালনা করিতে পারে।

(গ) **পরিচালনায় ব্যয়সঙ্কোচ :—**

বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের অনেক কাজ মালিক অপরের উপর অর্পণ করিতে পারে। ইহাতে মালিক অন্য অধিক **গুরুত্বপূর্ণ কাজে** মন দিতে পারে। কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র কারবারে সম্ভব নয়। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে সমস্ত কাজ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার ফলে ঐ সকল বিভাগে একজন করিয়া দক্ষ লোক নিয়োগ করা যায়। ইহাতে অল্প খরচে **দক্ষ কর্মচারী** পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিভাগের **সমন্বয়** সাধনও ইহা দ্বারা সম্ভব হয়। সেজন্য দেখা যায় একমাত্র বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানেই **যোগ্য ব্যক্তিদের** কাজের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। ইহাতে অল্প খরচে উন্নত

পদ্ধতিতে **হিসাবও রাখা** যায়। উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব রক্ষা একমাত্র বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায়।

(ঘ) বিক্রয় ব্যয়-সঙ্কোচ :—

এইরূপ প্রতিষ্ঠানে পাইকারী হারে পণ্য ক্রয়-ও বিক্রয় হয়। সেজন্য বিক্রয় ব্যয়ও কম হয়। ইহাতে বিক্রয়ের **পরিবহণ খরচও** কম পড়ে। বিভিন্ন প্রতিনিধি মাধ্যমে এই ব্যবস্থায় পণ্য বিক্রয় হইতে পারে। বিক্রয়ক্ষেত্রে **বিশেষজ্ঞের** পরামর্শ গ্রহণ কেবলমাত্র এরূপ বৃহদায়তনে সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুযায়ী সময়মত প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করিতে পারে। কোনপ্রকার পণ্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে অন্যপ্রকার পণ্য দিয়া তাহার সমতা রক্ষা করা যায়। একটি বিভাগের ক্ষতি অন্য বিভাগ দ্বারা পোষাইয়া যায়। এমনকি বিভিন্ন বাজারে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা দ্বারাও ইহা চাহিদার অবনতি সংশোধন করিয়া লইতে পারে।

বৃহদায়তন শিল্পের অসুবিধা (ইহাকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা বলে) :—

(ক) ব্যক্তিগত রুচি বৃহদায়তন শিল্পে পূরণ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য বড় বড় কাপড়ের দোকানের পার্শ্বে আমরা ছোট দর্জির দোকান দেখিতে পাই।

(খ) কারবার বড় হইলে উহার মালিক প্রতিটি কাজ পরিচালনা করিতে পারে না। ইহাতে কারবারে লোকসান হইতে পারে এবং ইহাতে শ্রমিক মালিক, ক্রেতা মালিক সম্পর্ক ভাল হয় না। ইহা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সম্ভব হইতে পারে।

(গ) আমাদের দেশে অনেক শিল্প আছে যাহা বৃহদায়তন পদ্ধতিতে একেবারেই সম্ভব নহে। যেমন, সুক্ষ্ম কারুকার্যের কাজ। ইহা একমাত্র ক্ষুদ্রাকারে হইতে পারে।

(ঘ) পণ্যের প্রকৃতির উপরও কারবারের আয়তন নির্ভর করে। এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা বৃহদাকারে করা সম্ভব নহে। যেমন মাছ, বরফ প্রভৃতি।

(ঙ) বাজারের চাহিদার উপরও অনেক শিল্পের আয়তন নির্ভর করে। চাহিদা প্রচুর হইলেই তবেই বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে।

(চ) বৃহদায়তন শিল্প প্রয়োজনে দ্রুত পরিবর্তন করা যায় না। সেজন্য অনেকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প পছন্দ করেন।

অনেক সময় কারবার বড় হইলে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা আসিয়া দেখা দেয়। সেজন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অধিক প্রিয়।

বৃহদায়তন শিল্পের উক্ত অসুবিধা সমূহ থাকার জন্য আজও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. মিশ্র অর্থনীতি কাহাকে বলে ? ইহার বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা কর।
(What is Mixed Economy ? Discuss its Features).

2. ভারতীয় অর্থনীতিতে মিশ্র অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
(Discuss the Necessity of Mixed Economy in Indian Economy).

3. ভারতে শিল্পোন্নতি সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে সংঘটিত হইতেছে। ইহা কি সুস্থ পন্থা ? আলোচনা কর।
(In India industries are being developed both in Public and Private Sectors. Do you think it is a Sound Policy ? Discuss.)

4. আমরা সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগের নাম শুনিয়া থাকি। উহাদের কি অর্থ এবং এই বিভাগের কি প্রয়োজন ?
(We often hear about Public and Private Sectors in India. What do they Really mean and why this division is needed ?)

5. সরকারী ক্ষেত্র ও বে-সরকারী ক্ষেত্র বলিতে কি বুঝ ? ভারতে তুমি কোনটি পছন্দ কর ? কারণ দর্শাও।
(What do you Understand by Public Sector and Private Sector ? Which one would you advocate in India ? Give reason).

6. ভারত সরকারের পক্ষে ভিত্তিমূলক শিল্পগুলির মালিকানা ও পরিচালনা গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে কেন ?
(Why it has become necessary for India-Government to own and manage basic industries ?)

7. শিল্পজাত পণ্যের বণ্টণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা আলোচনা কর।
(Discuss the Role of the Government over distribution and Prices of Manufactured goods).

8. কোন কারবারের আয়তন পরিমাপের নীতি আলোচনা কর।
(Discuss the factors that determine the Size of a Business Unit).

9. কি কি অবস্থার উপর কারবারের আয়তন নির্ভর করে ?
(What are the factors which determine the Size of a Business Unit ?)

10. "কত বড়, অত্যাধিক বড়"—এই প্রশ্ন কারবারীদের সম্মুখীন হইতে হয়। কি প্রকারে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে ?
("How big is too big" is a Question which Confronts businessman. How the Problem is Solved ?)

11. কারবারী প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম ও কাম্য আয়তনের ধারণার উপর টীকা লিখ।
(Write notes on the Concept of Economic Size and Optimum Size of Business Unit).

12. ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহদায়তন কারবারের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে উহাদের ভূমিকা আলোচনা কর।
(Discuss the Concept of Small, medium and Large-Scale industries and discuss their Role in Indian Economy).

13. বৃহদায়তন কারবারী প্রচেষ্টায় সুবিধা ও অসুবিধা উভয় আছে বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।
(Large Scale business Enterprise has got both advantages and dis-advantages. Explain fully.)

14. বৃহদায়তন শিল্পগুলির নিজেদের স্বার্থে মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতিতে সহায়তা করা উচিত। তুমি কি এই মত পোষণ কর ? কারণ দেখাও।
(The Big industries should, in their own interest, foster the growth of Medium and Small Scale industries. Do you share this view ? Give reasons.)

বিভিন্ন প্রকারের কারবারী প্রতিষ্ঠান এবং উহাদের তুলনা মূলক আলোচনা

(Different Types of Business Organisation and their Comparative Study.)

বিভিন্ন প্রকার মালিকানার ভিত্তিতে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকার কারবারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

(ক) **একক মালিকানা অথবা একমালিকী কারবার** (Sole Proprietorship Business)

(খ) **যৌথ হিন্দু অথবা অবিভক্ত হিন্দু পারিবারিক কারবার** (Joint Hindu or Undivided Hindu Family Business.)

(গ) **অংশীদারী কারবার** (Partnership form of Business).

(ঘ) **যৌথ মূলধনী কারবার** (Joint Stock Company)

(ঙ) **সমবায় কারবার** (Co-operative Business)

(চ) **রাষ্ট্রীয় কারবার** (State Enterprise).

(ক) **একমালিকী কারবারের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ঠ্য :**—(Definition and Characteristics).

যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক মাত্র একজন লোক তাহাকে একমালিকী কারবার বলে। এই সকল প্রতিষ্ঠান একজন ব্যক্তির উদ্যোগে স্থাপিত হয়। মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ অথবা ঋণই এই ব্যবসার মূলধন। ইহার সমস্ত দায় ও সম্পত্তি মালিকের নিজস্ব। ইহাই প্রাচীনতম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

একমালিকী কারবারের প্রধান প্রধান **বৈশিষ্ট সমূহ** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

১। **গঠন ও মালিকানা** (Formation and Ownership) :—

এই প্রকার কারবার গঠনে কোনপ্রকার জটিলতা নাই। আইনের বাধ্য-

বাধকতা ইহাতে নাই বলিলেও চলে। মালিক ইচ্ছা করিলেই এই প্রকার ব্যবসা শুরু করিতে পারে।

২। **অর্থ সংস্থান** (Financing) :—

মালিক একাই এই ব্যবসার অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। নিজের সঞ্চিত অর্থ কম হইলে মালিক নিজের দায়িত্বে অন্যের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া এই ব্যবসায়ের মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।

৩। **ঝুঁকি ও মুনাফা** (Risk and Profit):—

এই ব্যবসায়ের সমস্ত ঝুঁকি মালিককেই বহন করিতে হয় এবং লাভ লোকসানও একমাত্র মালিকই ভোগ করে।

৪। **পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ** (Management and Control) :—

এই ব্যবসায়ে মালিকই সর্বে সর্বা, সুতরাং কর্মচারী নিয়োগের দ্বারা মালিক নিজেই এ ব্যবসা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। **দায়-দায়িত্ব** (Liability) :—

এই প্রকার ব্যবসায়ে মালিক অসীম দায়ে আবদ্ধ থাকে। কারণ ইহাতে অন্য কেহ মালিক থাকে না, সুতরাং সমস্ত দায়-দায়িত্ব মালিককেই বহন করিতে হয়।

৬। **স্থায়িত্ব** (Continuity) :—

এই প্রকার ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মালিকের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

৭। **সত্তা** (Entity) :—

এই ব্যবসায়ের আইনগত কোন পৃথক সত্তা নাই। কারবারে নাম দিয়া কোন কিছু করা যায় না।

একমালিকী কারবারের **সুবিধা ও অসুবিধা** (Advantages and Disadvantages) :—

একমালিকী কারবারের সুবিধা এবং অসুবিধা সমূহ নিম্নরূপে আলোচনা করা যাইতে পারে :—

সুবিধা সমূহ :—

১। **গঠনের সুবিধা** (Easy Formation) :—

আইনগত কোন বাধা না থাকায় মালিক ইচ্ছা করলেই যে কোন সময়ে এই কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

২। **সহজ ও সরল পরিচালনা** (Easy Management) :—

মালিকের নিজের দেখাশুনায় কারবার পরিচালিত হয় বলিয়া ইহা সহজ ও সরল হইয়া উঠে। কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অন্যান্য কাঠামো অপেক্ষা ইহাতে অনেক কম হয়।

৩। **ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ** (Direct Contact between Sellers and Buyers) :—

এই পদ্ধতিতে বিক্রেতা ক্রেতার সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে পারে এবং তাহাদের রুচি অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করিতে পারে। ইহাতে প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ দৃঢ় হয়।

৪। **কর্মচারী ও মালিক সম্পর্ক** (Relation between Employees and Employers) :—

কর্মক্ষেত্রে মালিক কর্মচারীর সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহাদের সুবিধা অসুবিধা মালিক বুঝিতে পারে। ইহাতে কর্মচারী খুশী হয় এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে সব রকম চেষ্টা করে, সে জন্য সুন্দররূপে ব্যবসা পরিচালিত হয়।

৫। **দ্রুত কর্ম-পন্থা নির্ধারণ** (Quick Decision) :—

এই প্রকার কারবারে মালিক প্রয়োজনবোধে সহজেই দ্রুত কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে পারে। কারণ আইন অথবা অন্য মালিকের ঝামেলা নাই।

৬। **হিসাব রক্ষণে সুবিধা** (Fecility in the Preperation of Accounts) :—

আইনের বাধা-বাধকতা না থাকায় মালিক কম খরচে নিজের ইচ্ছানুযায়ী হিসাব পত্র রাখিতে পারে।

৭। **ঋণ সংগ্রহেরসুবিধা** (Availability of Loan) :—

ঋণের জন্য মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়ী থাকায় ঋণগ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না।

৮। **বৃহৎ কারবারের সূচনা** (Origin of Big Business) :—

ছোট হইতে যেমন বড়র সৃষ্টি হয় তেমনি এই ক্ষুদ্র একমালিকী ব্যবসা হইতে ধীরে ধীরে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

৯। **ব্যবসায়ের গোপনীয়তা** (Business Secrecy) :—

এই প্রকার ব্যবসায়ের একজন মালিক থাকে বলিয়া ব্যবসায়ের গোপনীয়তা সুষ্ঠভাবে রক্ষা করা যায়।

১০। **সামাজিক সুবিধা** (Social advantages) :—

সমাজের দিক হইতে বিচার করিলেও এই কারবারের যথেষ্ঠ গুরুত্ব আছে যেমন, ইহা জনগণকে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনে সহায়তা করে, ইহা হইতে দেশে দক্ষ পরিচালক সৃষ্টি হয় এবং এই প্রকার ব্যবসা দেশের বেকারত্ব অনেকাংশে দূর করে।

অসুবিধা সমূহ :—

১। **পুঁজির স্বল্পতা** (Limited Capital) :—

ইহার জন্য ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মালিকের ব্যক্তিগত সঞ্চয় অপেক্ষা ব্যবসায়ে বেশী টাকা প্রয়োজন হইতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যবসা সংকটের সম্মুখীন হয়।

২। **সীমাহীন দায়** (Unlimited Liability) :—

এই প্রকার অসীম দায়ের জন্য অনেকে এই ব্যবসা করিতে সাহস পায় না এবং অনেকে চালু ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হয়।

৩। **অনিশ্চিত স্থায়িত্ব** (Uncertain Duration) :—

এইরূপ ব্যবসার স্থায়িত্ব মালিকের উপর নির্ভরশীল। দক্ষ মালিক হইলে এই ব্যবসা কিছুদিন চলে কিন্তু অদক্ষ মালিক হইলে অচিরেই ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়।

৪। **দক্ষতার সীমা** (Limits of Efficiency) :—

সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষের দক্ষতার একটা সীমা থাকে। ব্যবসা যদি তাহার বাহিরে পরিধি বিস্তার করিতে চাহে তখন অসুবিধার সৃষ্টি হয় কারণ মালিক তখন আর সুষ্টুভাবে ঐ ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারে না।

৫। **মালিকের খেয়াল খুশী** (Whims of the Owner) :—

একমালিকী ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে মালিকের খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল। কোন কারণে মালিক ব্যবসা হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিলে কর্মচারীগণের দুঃখের সীমা থাকে না।

৬। **অধিক উৎপাদন ব্যয়** (High Cost of Production) :—

এক মালিকী ব্যবসায়ে অল্প পরিমাণে কাঁচামাল খরিদ করিতে হয়। কারণ মূলধন কম থাকে। এরূপ অল্প কাঁচামাল খরিদ করিলে পণ্যের ক্রয় মূল্য বৃহদায়তন

শিল্পের ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক বেশী পড়ে। ফলে যখন উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রয় করিতে হয় তখনও ঐ পণ্যের মূল্য অধিক হয়।

একক মালিকানার উপযুক্ত স্থান (Suitable place of Sole Proprietorship) :—

একক মালিকানায় ব্যবসা সর্বত্র উপযুক্ত হইবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে এই একমালিকী কারবার সুন্দর রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে।

(ক) যে সকল ব্যবসায়ে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন হয় না। যেমন, মুদির দোকান।

(খ) যে সকল ব্যবসা কোনদিন বৃহদায়তন হইবে না। যেমন, কুটির শিল্প।

(গ) যে সকল ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত রুচি, কলা-কৌশলের গুরুত্ব রহিয়াছে যেমন, উকিল, ডাক্তার, দর্জি, তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতির ব্যবসা।

(খ) **যৌথ হিন্দু বা অবিভক্ত হিন্দু পারিবারিক কারবারের সংজ্ঞা** (Definition) :—

একান্নবর্তী পরিবারের অথবা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের সভ্যদের লইয়া যৌথ মালিকানায় যদি কোন ব্যবসা পরিচালিত হয় তবে তাহাকে যৌথ হিন্দু পাবিবারিক কারবার বলে।

এইরূপ ব্যবসা দুইটি হিন্দু আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি দায়ভাগ আর অপরটি মিতাক্ষরা।

দায়ভাগ নিয়ম অনুসারে পিতা জীবিত অবস্থায় উইল করিয়া সম্পত্তি অপরকে দান না করিলে, তাহার মৃত্যুর পর পুত্রকন্যারা যৌথভাবে ঐ পিতার সম্পত্তির মালিক হইয়া থাকে।

কিন্তু মিতাক্ষরা আইন অনুসারে পিতার মৃত্যুর পর পরবর্তী ৪র্থ পুরুষ পর্যন্ত পুরুষ সভ্যরা পিতার সম্পত্তির মালিক বা সহ মালিক হইয়া থাকে।

এই প্রকার কারবারের **প্রধান বৈশিষ্ট্য** (Features or Characteristics) :—

১। **পত্তন** (Formation) :—

মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী একমাত্র পুরুষ সভ্যরাই এই প্রকার কারবার গঠন করিতে পারে।

২। **পরিচালনা** (Management and Control) :—

এই কারবার পরিচালনার দায়িত্ব একমাত্র কর্তার উপরই ন্যস্ত থাকে। আর পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ সভ্যই কর্তা বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩। **কর্তার ভূমিকা** (Importance of Karta) :—

কর্তাই ব্যবসা পরিচালনা করে। অন্য সভ্য কর্তার বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিতে পারে না। কর্তার দায় অসীম। কর্তা কোন অর্থ আত্মসাৎ করিলে অন্যসভ্যরা কর্তার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবে।

৪। **সভ্যপদ** (Membership) :—

জন্মসূত্রেই সভ্যপদ অর্জিত হয়। চুক্তির দ্বারা নহে। এই ব্যবসায়ে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য থাকে না।

৫। **নাবালকের স্থান** (Minor as a member) :—

পরিবারে কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই সে সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬। **আইন** (Law) :—

এই যৌথ পারিবারিক ব্যবসা হিন্দু আইন দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং কোন সভ্যর মৃত্যু অথবা জন্ম দ্বারা এই ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায় না। এরূপ ব্যবসায়ের জন্য কোন নিবন্ধন প্রয়োজন হয় না।

৭। **অবসর গ্রহণ এবং দেউলিয়া** (Retirement and Insolvency) :—

কোন সভ্য এই ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে কারবারের ও অন্যান্য সম্পত্তির অংশ দিয়া দিতে হয়। আর প্রাপ্ত বয়স্ক সভ্যই একমাত্র দেউলিয়া হইতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সভ্য দেউলিয়া হইতে পারে না। যদি কোন সভ্য দেউলিয়া হয় তবে তাহার অংশটুকুমাত্র কারবারের ঋণের জন্য দায়ী হইবে। তাহার বেশী নহে।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের **সুবিধা ও অসুবিধা** (Merits and De-merits) :

সুবিধা সমূহ (Advantages) :—

১। **আয়ের উৎস** (Source of Income) :—

এই ব্যবসা হইতে প্রত্যেক সভ্যই কিছু আয় করিয়া থাকে। ইহা হইতে তাহারা জীবিকার্জনের দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পায়।

২। **ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা** (Experience) :—

নাবালক অবস্থা হইতে সভ্যগণ পারিবারিক ব্যবসায় যুক্ত থাকায় পরবর্তীকালে নিজেরা পৃথকভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারে। সুতরাং সভ্যগণের ব্যবসায় জ্ঞান লাভ করার ইহা একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র।

৩। **শ্রমবিভাগ** (Division of Labour) :—

এই পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ সম্ভব হয়, কারণ প্রত্যেক সভ্যই নিজেদের দক্ষতা ও পছন্দমত কাজ ভাগ করিয়া লইয়া সম্পন্ন করিতে পারে।

৪। **স্থায়িত্ব** (Durability) :—

এই ব্যবসা বহুদিন চলিতে পারে। কারণ কোন সভ্যর মৃত্যু অথবা জন্মদ্বারা ইহা প্রভাবিত হয় না।

৫। **সভ্যপদ** (Membership) :—

সভ্যপদ লইতে কোন খরচ হয় না। কারণ ইহা জন্মসূত্রেই পাওয়া যায়। এমনকি নাবালকও জন্মসূত্রে ইহার সভ্য হইতে পারে।

৬। **দায়** (Liability) :—

সভ্যগণের দায় সীমাবদ্ধ। নিজ নিজ অংশের জন্যেই সভ্যগণ দায়ী হইবে। এই ব্যবসায়ে সভ্যগণ ব্যক্তিগতভাবে অভিযুক্ত হইতে অথবা অভিযোগ করিতে পারে না।

অসুবিধা সমূহ (De-merits) :—

১। **গুরু দায়িত্ব** (Endless Responsibility) :—

ইহাতে কর্তার দায়িত্ব অসীম। সুতরাং তাহাকে দিনরাত প্রচণ্ড চিন্তার ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিতে হয়।

২। **মহিলাদের শরিকানা থাকে না** (Loss of Right to Women) :—

এই প্রকার ব্যবসায়ে স্ত্রীলোকের কোন অংশ থাকে না। ইহা তাহাদের প্রতি একপ্রকার অবিচার।

৩। **স্বার্থপরতা** (Selfishness) :—

কর্তাই একমাত্র ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারে। নবীনেরা যদি কর্তার বিপক্ষে কোন কারণে চলিয়া যায় তবে ঐ ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এমনকি ইহাতে ব্যক্তি স্বার্থপরতা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিতে পারে।

৪। **সুনির্দিষ্ট অংশের অভাব** (Absence of fixed share) :—

সভ্যগণের ব্যবসায়ে কোন সুনির্দিষ্ট অংশ থাকে না। কারণ কোন সভ্যর জন্ম ও মৃত্যুদ্বারা ঐ অংশ পরিবর্তিত হয়। সুতরাং সভ্যগণকে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনপাত করিতে হয়।

৫। **কর্মক্ষমতা হ্রাস** (Decrease of ability) :—

কোন সভ্য এই ব্যবসায়ে কাজ না করিয়াও অংশ পাইতে পারে। ইহা অলসতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস করে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে একমালিকী ও যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসায়ের ভূমিকা (The Role of the Sole Proprietorship and Joint Hindu Family Business in Indian Economy):—

ভারত অত্যন্ত গরীব দেশ। এই গরীব দেশের অর্থনীতিতে উপরোক্ত ব্যবসায়ের ভূমিকা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কুটির, ক্ষুদ্র প্রভৃতি শিল্পে এবং খুচরা ব্যবসায়ের উপরে ঐ দুই প্রকার ব্যবসা অতি প্রাচীনকাল হইতেই দারুণ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারাই আমাদের জাতীয় জীবন বেকারত্বের গ্লানি হইতে অনেকটা মুক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে। অংশীদারী ও যৌথ মূলধনী কারবার একমালিকী অপেক্ষা নবীন হইলেও সাম্প্রতিক কালে ইহারাও ভারতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

সামাজিক দৃষ্টিকোন হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, এই একমালিকী ও যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসায়ে ভারতের মোট জনসমষ্টির এক বিরাট অংশ নিয়োজিত রহিয়াছে।

ইহা ছাড়াও এই জাতীয় ব্যবসা বহু ভারতীয়ের স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের একটি প্রধান উপায়।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, যতদিন ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব থাকিবে এবং খুচরা বিক্রেতার প্রয়োজন অনুভূত হইবে ততদিন এই প্রকারের একমালিকানা ব্যবসা ও যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসা চলিতে থাকিবে।

(গ) **অংশীদারী কারবার এবং ইহার বৈশিষ্ট** (Meaning and Features) :

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যক্তি যখন নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে তখন তাহাকে **অংশীদারী কারবার বলে।*** এই ব্যবসায়ে সকল অংশীদার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে লাভ বা লোকসান ভাগ করিয়া লয়।

* "The Partnership is the Relation between Persons who have agreed to share the Profits of the Business carried on by all or any one of them acting for all." Indian Partnership Act.

যে সকল ব্যক্তি মিলিতভাবে এই ব্যবসা গড়িয়া তোলে তাহাদিগকে অংশীদার বলে এবং ঐ ব্যবসাটীকে অংশীদারী কারবার বলা হয়।

অংশীদারী কারবারের **প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য** (Features or Characteristics) :—

১। **সভ্যসংখ্যা** (Membership) :—

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কমপক্ষে দুইজন অংশীদার দরকার হয়। আর সর্বাধিক সংখ্যা বিশের অধিক নহে। কিন্তু ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী ব্যবসায় এই সর্বাধিক সংখ্যা দশ।

২। **পত্তন** (Formation) :—

এইরূপ ব্যবসায়ে কোন আইনগত বাধা নেই।

৩। **চুক্তি** (Agreement) :—

অংশীদারগণ একটা চুক্তির দ্বারা ব্যবসায়ের পত্তন করিয়া থাকে। এই চুক্তি না থাকিলে ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

৪। **সংস্থার নাম** (Firm Name) :—

এইরূপ ব্যবসায়ের নামের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কারণ, ইহা ব্যবসায়ের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে।

৫। **মূলধন** (Capital) :—

অংশীদারগণই এই মূলধন সরবরাহ করে। সকলের প্রদত্ত অর্থ সমান নাও হইতে পারে। প্রয়োজনে সভ্যরা ঋণ করিয়াও ব্যবসায়ের মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।

৬। **পরিচালনা** (Management) :—

প্রত্যেক অংশীদার ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারে। সাধারণতঃ এক বা একাধিক অংশীদার সকলের পক্ষে কারবার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সকলকে নিজের কাজের জন্য দায়ী করিতে পারে।

৭। **সত্ত্বা** (Entity) :—

আইনের চোখে অংশীদার ভিন্ন ঐ কারবারের কোন পৃথক সত্ত্বা নাই।

৮। **দায়-দায়িত্ব** (Liabilities) :—

অংশীদারগণ পৃথক পৃথক ভাবে অথবা মিলিতভাবে ব্যবসায়ের সমস্ত ঋণের জন্য দায়ী থাকিবে।

৯। **মুনাফা বণ্টন** (Profit) :—

কারবারের লাভ-লোকসান পূর্ব চুক্তি অনুসারে ভাগ হইবে। আর চুক্তি না থাকিলে সকল অংশীদার উহা সমান সমান ভাবে ভাগ করিয়া লইবে।

১০। **বিলোপসাধন** (Dissolution) :—

কোন অংশীদার পাগল হইলে, কাহারও মৃত্যু ঘটিলে অথবা কেহ দেউলিয়া হইলে ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন ঘটে। ইহা ছাড়া যে কোন অংশীদার যে কোন সময়ে কারবারের অবলুপ্তি ঘটাইতে পারে।

অংশীদারী **চুক্তিপত্র** এবং ইহার প্রধান প্রধান **ধারাসমূহ** (Partnership Deed or Articles and its main clauses) :—

অংশীদারী কারবার চুক্তিরই ফল। সুতরাং ইহা লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই চুক্তিপত্র মৌখিক অথবা লিখিত হইতে পারে। সুতরাং যে দলিলে অংশীদার-গণের মধ্যে এই চুক্তি লিখিত হইয়া থাকে তাহাকে চুক্তিপত্র অথবা চুক্তিনামা বলে।

এই চুক্তিনামায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত **ধারাগুলি** লিখিত থাকে :—

১। ব্যবসায়ের নাম।

২। ব্যবসায়ের প্রকৃতি।

৩। ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব।

৪। মূলধনের যোগান।

৫। মূলধনের উপর সুদ।

৬। হিসাব রক্ষা ও হিসাব পরীক্ষা পদ্ধতি।

৭। মুনাফা ও লোকসান বণ্টনের অনুপাত।

৮। পরিচালনায় অংশীদারের ভূমিকা।

৯। কাহারও মৃত্যু ঘটিলে কারবারের ব্যবস্থা।

১০। কারবারের সুনামের মূল্যায়ণ।

১১। নতুন অংশীদারের আগমন পদ্ধতি।

১২। অংশীদারগণের বেতন।

১৩। কারবার ভঙ্গ হইলে হিসাব পত্রের মীমাংসা।

১৪। বিবাদ মীমাংসার পদ্ধতি।

১৫। কারবার বিলোপ সাধনের পদ্ধতি।

অংশীদারী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits) :—

অংশীদারী কারবারে বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত **সুবিধাগুলিই** বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১। **প্রচুর মূলধন** (Large Capital) :—

অংশীদারী কারবারে অধিক পরিমাণ মূলধন পাওয়া যায়। কারণ অংশীদারগণই উহা প্রদান করে। এরূপ অধিক মূলধন থাকিলে সুন্দরভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা যায়।

২। **সহজ ঋণ** (Easy Loan) :—

অংশীদারী ব্যবসায়ে সহজে ঋণ পাওয়া যায়। কারণ ঋণদাতা ব্যবসা ছাড়াও অংশীদারগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে তাহার ঋণের অর্থ আদায় করিতে পারে।

৩। **পরিবর্তন** (Flexible) :—

প্রয়োজনবোধে অংশীদারগণ নিজেরা আলোচনা করিয়া ব্যবসায়ের রূপ সহজেই পরিবর্তন করিতে পারে।

৪। **আইনগত** সুবিধা (Legal facilities) :—

এরূপ কারবারে আইনের চাপ খুব কম থাকে। সুতরাং অংশীদারগণ ইহা সহজেই প্রতিষ্ঠা করিয়া চালু করিতে পারে।

৫। **দক্ষ অংশীদার** (Efficient Partner) :—

অংশীদারগণ নিজেদের প্রয়োজনবোধে কোন অভিজ্ঞ লোককে তাহাদের অংশীদার করিয়া লইতে পারে। ইহাতে ব্যবসা সুন্দরভাবে চলে।

৬। **ব্যক্তিগত স্বাধীনতা** (Individual Freedom) :—

প্রত্যেক অংশীদার এই কারবারে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে। কোন কারণে মতের অমিল হইলে যে কোন অংশীদার চলিয়া যাইতে পারে।

৭। **অতি সতর্ক পরিচালনা** (Cautious Management) :—

অংশীদারগণের দায় অসীম বলিয়া পরিচালকগণ অত্যন্ত যত্নসহকারে কারবার পরিচালনা করে। কারণ তাহারা জানে যে, লোকসান হইলে তাহাদিগকে বহন করিতে হইবে। সুতরাং দক্ষ পরিচালনা এই অংশীদারী কারবারে দেখিতে পাওয়া যায়।

অংশীদারী কারবারের **প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলি** নিম্নরূপে আলোচনা করা যায় :—

১। **অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান** (Uncertainly of Duration) :—

অংশীদারের মৃত্যু, মতানৈক্য, দেউলিয়া প্রভৃতি কারণে অংশীদারী কারবার বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং উহারা অনিশ্চিত এবং যে কোন সময়ে এইরূপ হইতে পারে। সেই জন্য প্রতিষ্ঠানও যে কোন সময়ে উঠিয়া যাইতে পারে।

২। **প্রচুর ঝুঁকি** (Great Risk) :—

অসীম দায় হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে। কম লোকেই উহা বহন করিতে চাহে।

৩। **বিশ্বাসের অভাব** (Want of Faith) :—

অংশীদারগণ সব সময় একে অন্যকে বিশ্বাস করিতে পারে না। ফলে কারবার বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

৪। **একে অন্যের কাজের ফল ভোগ করে** (Liability for the work of Others) :—

সকল অংশীদারই সমান। একে অন্যের হইয়া কাজ করে। সুতরাং একের ভুল অপরকেও বহন করিতে হয়।

৫। **জনতার অবিশ্বাস** (Less Public Faith) :—

আইনের কড়াকড়ি না থাকায় জনগণ এইরূপ প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারে না।

অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties) :—

ভারতীয় অংশীদারী আইন অনুসারে অংশীদারগণের **অধিকার ও কর্তব্যগুলি** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

অধিকার (Rights) :—

১। সকল অংশীদারগণই ঐ ব্যবসা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং নীতি নির্ধারণ করিতে পারে।

২। যে কোন অংশীদার কারবারের দলিলপত্র ও হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।

৩। চুক্তিতে কোন কিছু লিখিত না থাকিলে প্রত্যেক অংশীদার সমানভাবে

লাভ-লোকসান ভাগ করিয়া লইবে এবং কারবারকে প্রদত্ত ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ পাইবে।

৪। জরুরী অবস্থায় কারবারকে রক্ষা করিতে যদি কোন অংশীদার অর্থ ব্যয় করে তবে সেই অংশীদার কারবারের নিকট হইতে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পাইবে।

৫। নতুন অংশীদার গ্রহণের সময় যে কোন অংশীদার ইচ্ছা করিলে আপত্তি করিতে পারে।

৬। অবসর গ্রহণের পর যে কোন অংশীদার অন্য নামে পূর্ব কারবারের অনুরূপ কারবার চালাইতে পারে।

৭। নোটিশ দিয়া যে কোন অংশীদার কারবার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারে।

৮। চালু কারবারে কোন নতুন অংশীদার গ্রহণ করিলে ঐ নতুন অংশীদার তাহার আগমনের দিনের পূর্বের কোন দেনার জন্য কারবার দায়ী হইবে না।

৯। অংশীদারের রদবদল বা বহিষ্কার করিতে হইলে সকল অংশীদারের মতামত প্রয়োজন হইবে।

১০। কারবারের অগ্রগতি সম্বন্ধে যে কোন অংশীদার যে কোন সময়ে উপদেশ বা ব্যবস্থা করিতে পারে।

কর্তব্য (Duties) :—

১। সকলের সুবিধার জন্য অংশীদারেরা কারবারের কার্য পরিচালনা করিবে।

২। সততার সহিত প্রত্যেক অংশীদার কারবার পরিচালনা করিবে।

৩। ব্যবসায়ের সকলপ্রকার তথ্য অংশীদারগণ অন্য অংশীদারের নিকট অকপটে প্রকাশ করিবে।

৪। অংশীদারেরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর বিশ্বাসী হইবে।

৫। চুক্তিতে কিছু বলা না থাকিলে কোন অংশীদার পারিশ্রমিক পাইবে না।

৬। কারবারের সম্পত্তি কেবলমাত্র কারবারের জন্যই ব্যবহৃত হইবে।

৭। সমস্ত অংশীদারের মতামতভিন্ন কোন নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যাইবে না।

৮। কোন অংশীদার ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করিতে পারিবে না।

বিভিন্ন প্রকারের অংশীদারী ব্যবসা (Various Types of Partnership Business) :—

অংশীদারী কারবারকে প্রাথমিক পর্যায়ে **দুই ভাগে** ভাগ করা যায় যেমন, (ক) **সাধারণ অংশীদারী কারবার** এবং (খ) **পরিমিত অংশীদারী কারবার।**

কারবারের প্রত্যেক অংশীদার যদি পৃথকভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে ব্যবসায়ের সমস্ত ঋণ ও দেনার জন্য দায়ী থাকে তাহা হইলে তাহাকে **সাধারণ অংশীদারী কারবার বলে।**

এই সাধারণ অংশীদারী কারবারকে আবার নিম্নরূপে **বিভিন্ন শ্রেণীতে** ভাগ করা যায় :—

১। **সক্রিয় অংশীদার** (Active Partner) :—

কারবার পরিচালনার দৈনন্দিন কার্যে যে অংশীদার অংশগ্রহণ করে তাহাকে সক্রিয় অংশীদার বলে।

২। **নিষ্ক্রিয় অংশীদার** (Dormant Partner or Sleeping Partner) :—

যে সকল অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে না, কেবলমাত্র মূলধন সরবরাহ করিয়াই মুনাফা ভোগ করে তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে।

৩। **প্রকারান্তর অংশীদার** (Quasi Partner) :—

যে অংশীদার কারবার হইতে বিদায় লইয়াছে কিন্তু তাহার মূলধন ঐ কারবারে ঋণ হিসাবে আছে এবং তাহার উপর সুদ পাইয়া থাকে তাহাকে প্রকারান্তর অংশীদার বলে।

৪। **আচরণে অনুমিত অংশীদার** (Partner by holding out) :—

অনেক ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কারবারে থাকে না। অথচ ঐ ব্যক্তি তাহার আচার ব্যবহারের দ্বারা অন্যকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাহাতে অন্য লোক তাহাকে অংশীদার বলিয়া মনে করে। এইরূপ লোককে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে।

৫। **কর্মী অংশীদার** (Working Partner) :—

যে অংশীদার কারবারে কোন মূলধন বিনিয়োগ করে নাই কিন্তু কেবলমাত্র পরিশ্রম ও কর্মকুশলতার জন্য অংশীদার হইয়াছে তাহাকে কর্মী অংশীদার বলে।

কোন অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারগণের দায় **পরিমিত এবং অপরিমিত** হইতে পারে। এই দুইপ্রকার অংশীদারগণকে পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদার বলে। তাঁহাদের **অধিকার ও দায়িত্ব** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

১। ব্যবসায়ে ইহারা সক্রিয় অংশে গ্রহণ করিতে পারে না।

২। ব্যবসায়ের চুক্তি শেষ হওয়ার আগে কোনপ্রকারে তাহারা ব্যবসা হইতে তাহাদের মূলধন তুলিয়া লইতে পারে না।

৩। কারবার পরিচালনার জন্য ইহারা ভাল পরামর্শ দিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে কারবারের হিসাবপত্র দেখিতে পারে।

৪। তাহারা কারবারে যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিবে, কারবারের লোকসানের জন্য সেই অনুপাতে দায়ী থাকিবে।

পরিমিত অংশীদারী কারবারের **প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট** (Main Features) :—

১। সাধারণ অংশীদারী ব্যবসার ন্যায় ইহারও **ন্যূনতম** সভ্যসংখ্যা **দুইজন** এবং **সর্বাধিক** সংখ্যা **বিশজন**। কিন্তু **ব্যাঙ্কিং**-এর ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যা **দশজন**।

২। দায়সীমিত ও অসীম এই **দুইপ্রকার অংশীদার** দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। এইরূপ অংশীদারীতে **নিবন্ধন বাধ্যতামূলক**।

৪। সীমিতদায়ের অংশীদারগণ **পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না**।

৫। **নতুন অংশীদার** গ্রহণে সীমিত অংশীদারগণের কোন **হাত নেই**।

৬। এরূপ ব্যবসায়ে কেহ **দেউলিয়া** হইলে অথবা কাহারও **মৃত্যু** হইলে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায় না।

৭। সীমিত অংশীদারগণ ব্যবসা হইতে তাহাদের **মূলধন** তুলিতে পারে না।

৮। সকল অংশীদারগণের সম্মতি লইয়া সীমিত অংশীদারগণ **স্বত্বাধিকারী** নিয়োগ করিতে পারে।

পরিমিত অংশীদারী কারবারের **সুবিধা ও অসুবিধা** (Merits and Demerits) :—

সুবিধা (Merits) :—

১। যে ব্যক্তির প্রচুর **অর্থ আছে** কিন্তু পরিচালনার অভিজ্ঞতা নাই তাঁহার পক্ষে এই প্রকার কারবার সুবিধাজনক।

২। যাহার পরিচালনার **অভিজ্ঞতা আছে** কিন্তু প্রচুর অর্থ নাই, তাঁহার পক্ষে এই প্রকার কারবার বিশেষ সুবিধাজনক।

৩। এইরূপ কারবার দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়া থাকে।

অসুবিধা (Demerits) :—

১। নিবন্ধন ইহাতে বাধ্যতামূলক না হওয়ার জন্যে কারবারের গোপনীয়তা রক্ষা হয় না।

২। সীমিত ও অসীমিত অংশীদারের দায়িত্ব বিভিন্ন প্রকার হওয়ার জন্যে এই ব্যবসা ন্যায় নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হইতে পারে না।

৩। ইহাতে অসীমিত অংশীদারগণের দায়িত্ব অত্যধিক হইয়া পড়ে।

অংশীদারী ও যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Partnership and Joint Hindu Family Business) :—

অংশীদারী কারবার	যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার
১। ইহা চুক্তিদ্বারা সৃষ্ট হয়।	১। ইহা হিন্দু আইনের দ্বারা সৃষ্ট হয়।
২। সকল সভ্যই পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে।	২। পরিচালনায় একমাত্র সর্বজ্যেষ্ঠ সভ্যই অংশ গ্রহণ করিতে পারে।
৩। নাবালকের সহিত কোন চুক্তি হইতে পারে না।	৩। নাবালক জন্মগত অধিকারে সভ্য হয়।
৪। নারী ও পুরুষ উভয়েই অংশীদার হইতে পারে।	৪। মিতাক্ষরা আইনে নারীরা সভ্যা হইতে পারে না।
৫। কারবার নিবন্ধনের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়।	৫। ইহাতে নিবন্ধনের কোন দরকার নাই।
৬। সকল সভ্যের দায়িত্ব সমান।	৬। ইহা সভ্যদের শরিকানা দ্বারা সীমাবদ্ধ।
৭। সকল সভ্যই কারবারের প্রতিনিধি।	৭। কর্তাই একমাত্র সাধারণ প্রতিনিধি।

অংশীদারী কারবার	যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার
৮। লাভ-লোকসান একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে বণ্টিত হয়।	৮। লাভ-লোকসান শরিকানা অনুপাতে বণ্টিত হয়।
৯। ইহা অংশীদারী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	৯। ইহা হিন্দু আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
১০। কোন অংশীদারের মৃত্যু অথবা ইচ্ছানুযায়ী এই কারবার বন্ধ হইতে পারে।	১০। কোন সভ্যর মৃত্যু অথবা ইচ্ছা দ্বারা এই কারবার বন্ধ হইতে পারে না।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার ও পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের মধ্যে পার্থক্য (**Distinction between Joint Hindu Family Business and Limited Partnership Business**) :—

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার	পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার
১। এই প্রকার কারবার জন্মসূত্র হইতে উৎপত্তি হয়।	১। এই প্রকার কারবার চুক্তি হইতে উদ্ভূত হয়।
২। কোন নাবালক ইহার সভ্য হইতে পারে।	২। কোন নাবালক ইহার সভ্য হইতে পারে না।
৩। স্ত্রীলোক অংশীদার (সভ্য) হইতে পারে না।	৩। স্ত্রীলোক অংশীদার হইতে পারে।
৪। ইহাতে নিবন্ধন প্রয়োজন হয় না।	৪। ইহাতে নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়।
৫। হিন্দু মিতাক্ষরা আইন অনুসারে ইহা পরিচালিত হয়।	৫। পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের আইন অনুসারে ইহা পরিচালিত হয়।
৬। কোন পুত্র সন্তানের জন্ম ও মৃত্যু ঘটিলে অপর সভ্যর অংশ কম ও ও বেশী হয়।	৬। ইহা চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার	পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবার
৭। এরূপ কারবার ভারতের বৈশিষ্ট্য।	৭। এই প্রকার অংশীদারী কারবার ভারতে নাই।

একমালিকী ও অংশীদারী কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Individual Ownership form of Business and Partnership form of Business) :—

একমালিকী কারবার	অংশীদারী কারবার
১। একমালিকী কারবার সহজে প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং ইহা জটিলতা মুক্ত।	১। একমালিকী কারবারের ন্যায় ইহা সহজে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।
২। ইহাতে পারস্পরিক কোন চুক্তির দরকার হয় না।	২। পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩। ইহা কোন আইন দ্বারা পরিচালিত হয় না।	৩। ইহা অংশীদারী আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।
৪। একজন লোকই এই কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।	৪। ইহাতে কমপক্ষে দুইজন লোক প্রয়োজন হয়।
৫। মালিকই এই কারবার পরিচালনা করে।	৫। সমস্ত অংশীদারই ইহার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবে এরূপ নিয়ম নাই।

নিবন্ধন (Registration) :—

অংশীদারী কারবারে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু নিবন্ধনের ফলে ঐ প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করিতে পারে। সে জন্য নিবন্ধন কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

নিবন্ধনের পদ্ধতি (Method of Registration) :—

কোন অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধীকৃত করিতে হইলে নিবন্ধক অফিসারের নিকট প্রয়োজনীয় ফি ও নিম্নলিখিত তথ্যাদিসহ আবেদন করিতে হয়।

(ক) ব্যবসায়ের নাম।

(খ) ব্যবসায়ের ঠিকানা।

(গ) ব্যবসায়ের প্রকৃতি।

(ঘ) অংশীদারের নাম ও ঠিকানা।

(ঙ) অংশীদারগণের ব্যবসায়ে যোগ দেওয়ার শেষ তারিখ।

(চ) ব্যবসাটি কত দিনের ইত্যাদি।

নিবন্ধনের সুবিধা (Advantages of Registration) :—

(ক) ব্যবসায়ে অসাধুতা ও প্রতারণা হ্রাস পায়।

(খ) অংশীদারগণ তাহাদের প্রকৃত পাওনা পায়।

(গ) অবসরগ্রহণকারী অংশীদার তাহার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

নিবন্ধনের অসুবিধা (Disadvantages of Registration) :—

(ক) প্রয়োজনে এইরূপ কারবারের কোন অংশীদার তাহার পাওনা অর্থ আদায় করিবার জন্য আদালতে মামলা করিতে পারে না।

(খ) কোন অংশীদার তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে একশ টাকার উর্দ্ধে পাওনা অর্থের জন্য মামলা করিতে পারে না।

অংশীদারী কারবার ভঙ্গ (Dissolution) :—

অংশীদারী চুক্তিতে যে পদ্ধতির কথা বলা থাকে সেই অনুযায়ী অংশীদারী কারবার ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু যেখানে কোন চুক্তি থাকে না সেখানে আইনের নির্দেশমত নিম্নলিখিত যে কোন একটি কারণে ঐ কারবার ভাঙ্গিতে পারে।

(ক) সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে।

(খ) মেয়াদ শেষ হইলে।

(গ) নির্দিষ্ট সময়ের কারবার হইলে ঐ সময় অন্তে।

(ঘ) ইচ্ছানুযায়ী কারবার হইলে যে কোন অংশীদারের ইচ্ছানুযায়ী।

(ঙ) কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে অথবা দেউলিয়া হইলে।

(চ) কোন কারণে ব্যবসা বে-আইনী বলিয়া বিবেচিত হইলে এবং

(ছ) কোন অংশীদার নিম্নলিখিত অবস্থাতে আদালতে আবেদন করিয়া প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিতে পারে :—

(i) কোন অংশীদার পাগল হইলে

(ii) কোন অংশীদার চুক্তিভঙ্গ করিলে

(iii) যখন কারবার লোকসানে পরিচালিত হয়

(iv) কোন অংশীদার তাহার কর্তব্য পালনে অক্ষম হইলে।

(v) কোন কারণে আদালত কারবার তুলিয়া দেওয়ার কথা মনে করিলে ইত্যাদি।

(ঘ) **যৌথ মূলধনী কারবারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য** (Definition and Characterestics) :—

বহুসংখ্যক লোকে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যদি একটি সমিতি গঠন করে এবং ঐ সমিতির যৌথ মূলধনের তহবিলে অর্থ প্রদান করে এবং ঐ তহবিলকে একটা সাধারণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তবে তাহাকে **যৌথ মূলধনী কারবার বলে**।

ঐ যৌথ মূলধনের তহবিলকে যে সকল হস্তান্তর যোগ্য তহবিলে বিভক্ত করা হয় তাহাকে **শেয়ার** বলে। যাহারা ঐ শেয়ার ক্রয় করে তাহাদিগকে **শেয়ার হোল্ডার** বলে। এই শেয়ার হোল্ডররাই কোম্পানীর মালিক। শেয়ারের পরিমাণ দ্বারা তাহাদের দায় দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে।

বৈশিষ্ট্য সমূহ (Features) : —

১। **কারবারের পত্তন** (Formation) :—

নির্দিষ্ট কতকগুলি আইন মানিয়া লইয়া এই প্রকার কারবার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২। **নিবন্ধন** (Registration) :—

নিবন্ধন ভুক্তির দ্বারাই এই কারবার প্রতিষ্ঠা হয়। আইনের দৃষ্টিতে এই কারবারকে একজন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়।

৩। **মূলধন ও তাহার বিভাগ** (Capital and its devision)

কারবারের সমস্ত অর্থ কতকগুলি অংশে বিভক্ত করা হয়। এই সকল অংশই শেয়ার। এই শেয়ার ক্রয় দ্বারা সদস্যপদ গ্রহণ করা যায়।

৪। **আইনগত সত্তা** (Legal Entity) :—

আইনের চোখে কারবার একজন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হয়। যে কোন ব্যক্তি কোম্পানীর নামে মোকদ্দমা করিতে পারে।

৫। **সাধারণ শীলমোহর** (Common Seal) :—

এই কারবার একটি সীলমোহরের দ্বারা কৃত্রিম পরিচয় লাভ করে। কারবারের দলিলপত্রে সীলমোহর অঙ্কিত না হইলে তাহা আইনত গ্রাহ্য হয় না।

৬। **সীমাবদ্ধদায়** (Limited Liability) :—

নিজ নিজ ক্রীত শেয়ারের পরিমাণ দিয়া সভ্যগণের দায় দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে। উহার বেশী দায়ের জন্য সভ্যগণ দায়ী হইবে না।

৭। **পরিচালনা** (Management) :—

সভ্যগণ প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে না। তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ব্যবসা পরিচালনা করে।

৮। **মালিকানা ও পরিচালনা** (Ownership and Management) :—

কোম্পানী পরিচালনার ভার প্রধান কার্যনির্বাহকের হাতে দেওয়া হয়। উহারা উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করে, সে জন্য মালিকানা ও পরিচালনায় বিচ্ছেদ ঘটে।

৯। **বার্ষিক হিসাব-নিকাশ** (Annual Account and Audits) :—

এই ব্যবসায়ের বার্ষিক ফলাফল একটা পুস্তিকাকারে সভ্যগণের নিকট জানানো হয়। এই হিসাব রক্ষা ও তাহার পরীক্ষা আইনের চোখে একান্ত প্রয়োজনীয়।

১০। **লভ্যাংশ বণ্টন** (Division of Profit) :—

পরিচালকগণের সুপারিশ অনুসারে এবং বার্ষিক সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এই লভ্যাংশ শেয়ার গ্রহীতাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

১১। **চিরস্থায়িত্ব** (Perpetual Succession) :—

এই কারবার কোন সময় শেষ হয় না। ইহা চিরস্থায়ী। কোন সভ্যের মৃত্যু ঘটিলে অথবা দেউলিয়া হইলে এই কারবার বন্ধ হয় না। কেবলমাত্র আইনগত পন্থা অনুসারে এই কারবারে বিলুপ্তি হইতে পারে।

যৌথমূলধনী কারবারের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Joint Stock Company):—

যৌথ মূলধনী কারবার বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। সেজন্য উহাদের গঠন

পদ্ধতিও বিভিন্ন। যে সকল যৌথ মূলধনী কারবার সাধারণত আমরা দেখিতে পাই তাহা সহজে নিম্নরূপে আলোচনা করা যাইতে পারে :—

১। **চার্টার্ড কোম্পানী** (Chartered Company) :—

কোন প্রকার কোম্পানী আইন পাশ হওয়ার পূর্বের রাজকীয় সনদ অনুযায়ী যে কোম্পানী গঠিত হইত তাহাকে চার্টার্ড কোম্পানী বলে। যেমন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, ইত্যাদি।

২। **সংবিধিবদ্ধ কোম্পানী** (Statutory Company) :—

কোম্পানী আইন দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া অন্য কোন বিশেষ আইন দ্বারা যদি কোন কোম্পানী সৃষ্ট হয় তবে তাহাকে সংবিধিবদ্ধ কোম্পানী বলে। যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশণ ইত্যাদি।

৩। **নিবন্ধনভুক্ত কোম্পানী** (Registered Company) :—

১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানীর আইন অনুযায়ী যে যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে নিবন্ধনভুক্ত কোম্পানী বলে। এই কোম্পানী আবার **নিম্নরূপ** হইতে পারে :—

(ক) সদস্যগণের **অসীম দায় সম্পন্ন** কারবার। ইহা বর্তমানে বেশী দেখা যায় না।

(খ) সদস্যগণের গ্যারান্টি দ্বারা **সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন** কারবার। যেমন চেম্বার্স অব কমার্স।

(গ) সদস্যগণের **শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় সম্পন্ন** কারবার। ১৯৬৭-৬৮ সালে এরূপ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৮০০০।

এই শেয়ারদ্বারা সীমিত দায় সম্পন্ন কারবার আবার **নিম্নরূপ** হইতে পারে :—

(i) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। ইহারা সাধারণত বিবরণ পত্র প্রচার করে না। কিছু সংখ্যক বন্ধুবা মিলিয়া প্রতিষ্ঠা করে।

(ii) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী নিবন্ধীভুক্তির পর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য জনগণের নিকট বিবরণপত্র প্রচার করে। এই কোম্পানীতে সর্বনিম্ন সভ্যসংখ্যা ৭ (সাত) জন। কিন্তু সর্বোচ্চ সংখ্যার কোন সীমা নাই।

(iii) সরকারী যৌথ মূলধনী কোম্পানী। এই কোম্পানীর পরিচালনায় সরকার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

সীমিত কোম্পানী (Limited Liability) ঃ—

এইরূপ কোম্পানী যৌথ কারবারে দেখিতে পাওয়া যায়। একমালিকী ও অংশীদারী কারবারের দায় অসীম। যে কোন কারণে কারবার বন্ধ হইয়া গেলে অংশীদারগণকে অনেক সময় অসীম দায় বহণ করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু যৌথ কারবারী ক্ষেত্রে সীমিত দায় প্রচলন হওয়ায় এই ঝুঁকি অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ফলে সামর্থ্য অনুযায়ী অনেকে এই কারবার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। এইরূপ কোম্পানীর নামের শেষে **সীমিত** (Limited) কথা ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু ঐ কোম্পানী ঘরোয়া হইলে উহার নামের শেষে **ঘরোয়া সীমিত** (Private Limited) কথাটি ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু যদি ঐ কোম্পানী কে না লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে **সীমিত** (Limited) কথাটি ব্যবহার করিতে হয় না। যেমন ভারত চেম্বার অব্ কমার্স।

কিন্তু কোন কোম্পানীর সীমিত কথাটির আগে যদি 'ভারত' কথাটি থাকে তবে বুঝিতে হইবে বিদেশী কোম্পানী ও ভারতীয় কোম্পানী একত্রে নিবন্ধ হইয়া কারবার করিতেছে যেমন—The Imperial Chemical Industry (India) Limited.

সীমিত কোম্পানী গঠনের পদ্ধতি (Formation of Limited Company) ঃ—

১। একাধিক ব্যক্তিকে এই কোম্পানী গঠনে উদ্যোগী হইতে হইবে। কমপক্ষে ঘরোয়া কোম্পানীর জন্য দুইজন এবং সার্বজনিক কোম্পানীর জন্য সাতজন সভ্য হইবে। নিবন্ধকের নিকট প্রযোজনীয় ফি দিয়া নিবন্ধীকৃত হইতে হইবে। এই নিবন্ধীকৃত হইতে হইলে স্মারকলিপি, নাম, উদ্দেশ্য, অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী, পরিচালকের নাম, যোগ্যতা প্রভৃতি দলিল দিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে।

২। উপরোক্ত ফি ও দলিল সমূহ পাওয়ার পরে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হইলে ঐ কোম্পানীর নাম রেজিষ্ট্রার ভুক্ত হয়। নিবন্ধক ঐরূপ করার পরে ঐ কোম্পানীকে একখানা অভিজ্ঞান পত্র প্রদান করে।

৩। অভিজ্ঞান পত্র পাওয়ার পরে শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঐ কোম্পানী প্রচারপত্র বিলি করে।

৪। কোন প্রকার প্রচারপত্র সার্বজনিক কোম্পানী বিলি না করিলে সে সম্পর্কে নিবন্ধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। এই প্রচারপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি বিলি করিতে পারে।

৫। ঐরূপ প্রচারপত্র বিলির পরে শেয়ার ক্রয় ইচ্ছুক ক্রেতাগণ কোম্পানীর নিকট নির্দিষ্ট ফর্মে শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করিবে।

৬। কমপক্ষে কি পরিমাণ শেযার পরিচালকগণ বিক্রয় করিতে পারিবেন তাহাও এই পত্রে উল্লেখ থাকে।

৭। পরিচালকগণ চুক্তিমত তাহাদেব প্রদেয় অর্থ প্রদান করিয়াছে কিনা তাহাও জানাইতে হয়।

৮। ঐ সমস্ত সংবাদ পাওয়ার পরে নিবন্ধক (রেজিষ্ট্রার) কোম্পানীকে **কারবার আরম্ভের অনুমতিপত্র** প্রদান করে। এই অনুমতি পত্র পাওয়ার পরে কোম্পানী কারবার শুরু করে।

যৌথ মূলধনী কোম্পানীর 'স্মারকলিপি' (Memorandum of Association):—

স্মারকলিপি যৌথ মূলধনী কারবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কারবার নিবন্ধনের **মৌলিক বিষয়গুলি** ইহাতে বর্ণিত থাকে। কোম্পানীর ক্ষমতাও ইহাতে বর্ণিত থাকে। এই সনদের উল্লেখযোগ্য **ধারাগুলি নিম্নরূপে** আলোচনা করা যায়:—

১। **কোম্পানীর নাম** (Name):—

যে কোন নাম কোম্পানী গ্রহণ করিতে পারে। তবে দেখিতে হইবে ঐ নামে যেন অন্য কোন কোম্পানীর না থাকে অথবা ঐ নাম সরকার দ্বারা অবাঞ্ছিত বিবেচিত না হয়। কোম্পানীর নামের শেষে সীমিত এবং ঘরোয়া কথাটি ব্যবহার করিতে হইবে।

২। **ঠিকানা** (Situation):—

কোম্পানীর কার্যালয় কোন রাজ্যে অবস্থিত তাহা সনদে উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। **উদ্দেশ্য** (Objects):—

ইহা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোন খারাপ উদ্দেশ্য থাকিলে কোম্পানী চলিতে পারে না। ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য কি হইবে তাহাও ইহাতে লিখিত থাকিবে।

৪। **মূলধন** (Capital) :—

প্রস্তাবিত মূলধন এবং উহা কতগুলি শেয়ারে বিভক্ত হইবে তাহা এখানে লিখিতে হইবে।

৫। **দায়-দায়িত্ব** (Liability) :—

বিভিন্ন শেয়ার হোল্ডারগণের দায-দায়িত্ব কোম্পানীতে কি হইবে তাহা ইহাতে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। **কারবার সংগঠনের স্বীকৃতি** (Subscription) :—

সবশেষে ইহা লিখিতে হইবে যে, দলিলে স্বাক্ষরকারী সমস্ত ব্যক্তি কোম্পানী গঠনে সম্মত এবং তাহারা প্রয়োজনীয় শেয়ার লইতেও সম্মত। এইরূপ ঘোষণা ব্যাপক এবং সীমাবদ্ধ কারবারের ক্ষেত্রে যথাক্রমে সাত এবং দুইজন ব্যক্তির দ্বারা স্বীকৃত হইবে।

এই স্মারকলিপিতে উপরের বিষয়গুলি বিভিন্ন **ছত্রে ছাপার** অক্ষরে লিখিতে হইবে।

অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী (Articles of Association) :—

ইহা কোম্পানী পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অভ্যন্তরীণ কোম্পানী পরিচালনার সমস্ত নিয়মকানুন ইহাতে বর্ণিত থাকে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হয়।

১। পরিচালকমণ্ডলী নিয়োগ। তাহাদের পারিশ্রমিক, ক্ষমতা ও দায়িত্ব।

২। বিভিন্ন শেয়ার ক্রেতার অধিকার ও দায়িত্ব।

৩। শেয়ার হস্তান্তর পদ্ধতি।

৪। অনাদায়ী শেয়ার বাজেয়াপ্ত করণ পদ্ধতি।

৫। মূলধন পরিবর্তনের পদ্ধতি।

৬। সদস্যগণের ভোটাধিকার ও ভোটদান পদ্ধতি।

৭। লভ্যাংশ ঘোষণা এবং উহার অংশবিশেষ মূলধনে পরিণত পদ্ধতি।

৮। কোম্পানীর শীলমোহর রক্ষা ও উহার ব্যবহার পদ্ধতি।

৯। হিসাবরক্ষা ও পরীক্ষার পদ্ধতি।

১০। কোম্পানীর বিলোপ সাধনের পদ্ধতি।

সর্বশেষে স্মারকপত্রে সহিকারী সকল সদস্যগণই এই অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে সহি করিবে।

স্মারকলিপি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী "পরিবর্তনের পদ্ধতি" (Alteration of Memorandum and Articles) :—

স্মারকলিপি	অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী
একমাত্র কোম্পানী আইনের ১৬ নং ধারানুযায়ীই ইহা করিতে হয়। সদস্যগণ সম্মিলিত ভাবে সরকারী অনুমতি লইয়া **নাম** পরিবর্তন করিতে পারে। সদস্যগণ একটা বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা আদালতে অনুমতি লইয়া কোম্পানীর **কার্যালয়** অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করিতে পারে। নিবন্ধকের নিকট ২৮ দিনের নোটিশ দিতে হয়। বিশেষ প্রস্তাব পাশ করাইয়া সদস্যগণ আদালতের অনুমতি লইয়া কোম্পানীর **উদ্দেশ্য পরিবর্তন** করিতে পারে। ইহার উদ্দেশ্য হইবে কম ব্যয়ে দক্ষতার সহিত কোম্পানী পরিচালনা অভ্যন্তরীণ। আইনে বিধান থাকিলে কোম্পানী একটি সাধারণ প্রস্তাবের দ্বারা **পুঁজির পরিবর্তন** ঘটাইতে পারে। সকলপ্রকার সংশোধনই কোম্পানী আইনের আওতায় থাকিয়া করিতে হইবে।	অতি সহজেই ইহা করা যায় কারণ আদালতে অনুমতি প্রয়োজন হয় না। মাত্র একটি বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা ঐ পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু ঐ পরিবর্তন স্মারকলিপির ভিতরে হইতে হইবে। পরিবর্তনেব ফলে যদি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি দরকার হয়। এইরূপ পরিবর্তন দ্বারা কোম্পানীর কোন পূর্বচুক্তি ভঙ্গ হয় না।

বিজ্ঞাপনী (Prospectus) :—

ঘরোয়া কোম্পানী অভিজ্ঞান পত্র পাওয়ার পরেই কারবার আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু সার্বজনীক কোম্পানীর পক্ষে ইহা সম্ভব হয় না। কারণ উহাকে এই বিজ্ঞাপনীর মাধ্যমে জনগণকে কোম্পানীর পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি জ্ঞাপন করিতে হয়। ইহার উপর নির্ভর করিয়া জনগণ ঐ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে। সুতরাং ঐ বিজ্ঞাপনী সর্বদা সত্য তথ্য প্রকাশ করিবে। যদি না করে তবে, পরিচালকগণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় দুই বৎসর কারাদণ্ড বা ৫০০০ টাকা জরিমানাও হইতে পারে। তবে যদি কোন পরিচালক প্রমাণ করিতে পারেন যে ঐ প্রকার বিজ্ঞাপন তাহার বিনা অনুমতিতে অথবা অজ্ঞাতসারে প্রচার করা হইয়াছে তাহা হইলে তিনি ঐ শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন।

বিজ্ঞাপনীতে মুদ্রিত অক্ষরে ও বিভিন্ন ছত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা থাকে।

১। স্মারকলিপির বিষয়বস্তু ও উহাতে স্বাক্ষরকারীদের নাম।

২। শেয়ারেব সংখ্যা, শ্রেণীবিভাগ ও মূল্য।

৩। শেয়ার হোল্ডারগণের ভোটেব অধিকার ও লভ্যাংশের নিয়ম।

৪। পরিচালকদের শেয়ারসংখ্যা ও তাহার মূল্য।

৫। পরিচালনার অধিকার, ভোটপ্রদান, প্রভৃতি।

৬। শেয়ার বিক্রয়ের নিয়ম-কানুন।

৭। কোম্পানী গঠনের প্রাথমিক ব্যয়ের পরিমাণ।

৮। ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার প্রভৃতি থাকিলে তাঁহাদের পারিশ্রমিক।

৯। বিক্রেতার পরিচয় ও তাহাকে দেয় টাকার পরিমাণ।

১০। হিসাব পরীক্ষকের নাম ও ঠিকানা।

১১। অংশীদারগণের ভোটদান পদ্ধতি ও প্রাপ্ত লভ্যাংশ।

১২। ঋণপত্র গ্রহণের ক্ষমতা।

১৩। শেয়ার ও ঋণপত্রে বিক্রয়ের জন্য প্রদত্ত কমিশণ।

১৪। পূর্বের সঞ্চিত আয়ের ব্যবহার পদ্ধতি প্রভৃতি।

স্মারকলিপি ও অভ্যন্তরিণ নিয়মাবলীর মধ্যে পার্থক্য (**Differences between the Memorandum of Association and the Articles of Association of a Company**) :—

স্মারকলিপি	অভ্যন্তরিণ নিয়মাবলী
১। ইহা তৈয়ারী সকলপ্রকার কোম্পানীর পক্ষে বাধ্যতামূলক।	১। শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানীর পক্ষে ইহা বাধ্যতামূলক নহে।
২। ইহাকে কোম্পানীর সনদ বলে। কোম্পানীর সকল প্রকার ক্ষমতা ইহাতে লেখা থাকে।	২। ইহাতে কোম্পানী সব ক্ষমতা লেখা থাকে না। পরিচালনার অভ্যন্তরিণ নিয়মাবলী ইহাতে লেখা থাকে।
৩। ইহা সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।	৩। ইহা স্মারকলিপির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
৪। বাহিরের লোকের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক ইহাতে বর্ণিত থাকে।	৪। অভ্যন্তরিণ ব্যক্তিদের সহিত পারস্পরিক সম্পর্ক ইহাতে বর্ণিত থাকে।
৫। ইহার পরিবর্তন অথবা সংশোধন আদালতের অনুমতি দ্বারা হইয়া থাকে।	৫। ইহার পরিবর্তন করিতে কোনপ্রকার আদালতের অনুমতি প্রয়োজন হয় না।
৬। স্মারকলিপি ও অভ্যন্তরিণ নিয়মে কোন দ্বিমত দেখা দিলে স্মারকলিপির বক্তব্যই স্বীকৃত হয়।	৬। স্মারকলিপির বাহিরের কোন নিয়ম-কানুন ইহাতে স্থান পায় না।

যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (**Advantages and Dis-Advantages**) :

সুবিধা সমূহ (**Advantages**):—

১। **মূলধন** (**Capital**) :—

একমালিকী অথবা অংশীদারী কারবার অপেক্ষা ইহার মূলধন অনেক বেশী। কোম্পানী বড় হইতে হইলে ইহা একান্ত দরকার।

২। **কম ঝুঁকি** (Minimum Risk) :—

সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। শেয়ারও সহজে বাজারে বিক্রয় করা যায়। এজন্য অনেক সভ্য পাওয়া যায়।

৩। **উৎপাদন ব্যয়** (Cost of Production) :—

বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ইহাতেও উৎপাদন ব্যয় অনেক কম।

৪। **দক্ষতা** (Skill) :—

মূলধন ও দক্ষতার সমতা এই প্রকার ব্যবসায় দেখা যায়। কারণ প্রচুর মূলধন থাকায় এবং বৃহদায়তন ব্যবসা হওয়ায় দক্ষ লোক পরিচালনার জন্য নিয়োগ করা যায়।

৫। **অল্প মূলধন নিয়োগ** (Small Investment) :—

অল্প টাকা লইয়াও যে কোন ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করিতে পারে। ইহা দ্বারা অল্প অর্থের মালিকও ব্যবসায়ের সুযোগ পায়। তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছাও বৃদ্ধি পায়।

৬। **সত্তা** (Legal Entity) :—

আইনের চোখে কোম্পানীকে একজন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হয় এবং তৃতীয় যে কোন ব্যক্তি কোম্পানীর সহিত চুক্তি বদ্ধ হইতে পারে।

৭। **স্থায়িত্ব** (Stability) :—

এই কোম্পানী সহজে উঠিয়া যায় না। ইহার স্থায়িত্ব পুরুষানুক্রমিক। এই জন্য অনেকে ইহাতে অর্থ বিনিয়োগ করে, ফলে কোম্পানী ভাল ভাবে চলিতে পারে।

৮। **চিরস্থায়ী** (Continious Succession) :—

পুরুষানুক্রমে এই কারবার চলে। ফলে দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনা লওয়া ইহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

৯। **জনগণের আস্থা** (Public Confidence) :—

বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে ইহার উপর যথেষ্ট সরকারী নিয়ন্ত্রণ আছে। সেজন্য জনগণ এই কোম্পানীর উপর যথেষ্ট বিশ্বাস করে।

১০। **সীমিত দায়** (Limited Liability) :—

প্রত্যেক শেয়ার ক্রেতার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য শেয়ার বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ এই প্রকার কোম্পানীতে কোন অসুবিধা হয় না।

অসুবিধা (Dis-Advantages) :—

১। **আইনের কড়াকড়ি** (Legal Formalities) :—

কোম্পানীর গোড়াপত্তন হইতে শুরু করিয়া শেষ পর্যন্ত যাইতে বিভিন্নপ্রকার আইনের বাঁধা নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এইরূপ বাঁধা নিষেধ অনেক সময় সুষ্ঠ পরিচালনায় ব্যঘাত সৃষ্টি করে।

২। **বিবাদ** (Dispute) :—

মালিক ও শ্রমিকের মধ্য সম্পর্ক না থাকায় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৩। **স্বজন পোষণ** (Nepotism) :—

দক্ষ কর্মচারী নিয়োগের পরিবর্তে এরূপ কারবারে স্বজন-পোষণ নীতিই অধিক প্রচলিত।

৪। **উৎসাহহীন কারবার** (Less Incentive Business) :—

পরিচালকগণ এখানে উৎসাহ সহকারে কাজ করে না। ইহাতে প্রকৃত মালিকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। কিছুদিন এইরূপ চলার পরে কোম্পানী বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

৫। **ফাটকাবাজী** (Speculation) :—

প্রকৃত মুনাফার অর্থ প্রকাশ না করিয়া অনেক সময় পরিচালকমণ্ডলী নিজেদের স্বার্থে শেয়ারের মূল্য হ্রাস করিয়া দেয় এবং অল্প মূল্যে শেয়ার ক্রয় করিয়া তাঁহারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

৬। **অসাধু ব্যবসায়ী** (Dishonest Business) :—

মূলধন আদায়ের ব্যাপারে অনেক সময় অসাধু ব্যবসায়ীও ইহাতে স্থান করিয়া লয়। ইহাতে সাধু ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭। **পুঁজিবাদ** (Capitalism) :—

আইনতঃ গণতন্ত্রমূলক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাস্তবে ইহা পুঁজিবাদের ধারক ও বাহক। মুষ্টিমেয় কিছু লোক ইহা পরিচালনা করে।

অংশীদারী ও যৌথ কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Partnership and Joint Stock Company with Limited Liability) :—

অংশীদারী কারবার	সীমিত যৌথ কারবার
১। ইহা অংশীদারী আইনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	১। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রিত হয়।
২। সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা দু'জন। সর্বোচ্চ সংখ্যা ২০ জন কিন্তু ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় ১০ জন।	২। ঘরোয়া কোম্পানীর সর্বনিম্ন-সদস্য সংখ্যা ২জন। সার্বজনীন কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৭জন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫০ জন।
৩। অংশীদারের দায় অসীম।	৩। সভ্যগণের দায় সীমাবদ্ধ।
৪। পরিচালনায় সকল অংশীদার অংশগ্রহণ করিতে পারেন।	৪। নির্বাচিত পরিচালকেরাই কোম্পানী পরিচালনা করেন।
৫। আইনের চোখে ইহার কোন পৃথক সত্তা নাই।	৫। আইনের চোখে ইহার পৃথক সত্তা আছে।
৬। সভ্যদের ইচ্ছানুসারে পুঁজির পরিবর্তন করা যায়।	৬। আইন মান্য করিয়া পুঁজির পরিবর্তন করিতে হয়।
৭। পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী ইহা সৃষ্টি হয়।	৭। আইন মান্যদ্বারা ইহার সৃষ্টি হয়।
৮। কোন অংশীদারের মৃত্যু বা দেউলিয়া হইলে কারবার বন্ধ হইতে পারে।	৮। সভ্যের মৃত্যুদ্বারা কোম্পানী বন্ধ হয় না।
৯। ইহা অল্পস্থায়ী কারবার।	৯। ইহা দীর্ঘস্থায়ী কারবার।
১০। প্রত্যেক অংশীদার ভোট দিতে পারে।	১০। সভ্যরা প্রতিনিধিদ্বারা ভোট দিতে পারে।
১১। অংশীদারদের শেয়ার, সার্টিফিকেট প্রভৃতি নীতি নাই।	১১। সভ্যদের এই প্রকার সার্টিফিকেট দেওয়ার রীতি আছে।
১২। বার্ষিক লাভ-লোকসানের হিসাব নিবন্ধকের নিকট দাখিলার কোন বাধ্যতামূলক নিয়ম নাই।	১২। লাভ-লোকসান, উর্দ্বত পত্র দাখিলা ইহাতে বাধ্যতামূলক।

সার্বজনিক ও ঘরোয়া কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য (Differences between Public and Private Company) :—

সার্বজনিক কোম্পানী	ঘরোয়া কোম্পানী
১। ইহার সর্বনিম্ন সভ্য সংখ্যা ৭জন এবং সর্বোচ্চ সভ্য সংখ্যা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ।	১। সর্বনিম্ন সভ্যসংখ্যা ২জন এবং সর্বোচ্চ সভ্যসংখ্যা ৫০ জন।
২। নামের শেষে 'Public' কথাটি ব্যবহার করিতে হইবে।	২। নামের শেষে Private কথাটি ব্যবহার করিতে হইবে।
৩। শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনী প্রচার করিতে হয়।	৩। শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোন বিজ্ঞাপনী প্রচার করিতে হয় না।
৪। সব চাইতে কম-ডিরেক্টর তিনজন হইবে।	৪। ইহার ক্ষেত্রে দুইজন।
৫। ডিরেক্টরগণকে শেয়ার ক্রয় করিতে হয়।	৫। ইহাতে কোন শেয়ার ক্রয় করিতে হয় না।
৬। ইহার শেয়ার হস্তান্তর যোগ্য।	৬। ইহা অবাধ হস্তান্তর যোগ্য নহে।
৭। ইহাতে বার্ষিক সভার জন্য ২১ দিনের নোটীশ দিতে হয়।	৭। ইহাতে ২১ দিনের নোটীশ না দিলেও চলে।
৮। কোম্পানী আইন অনুযায়ী পরিচালকের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়।	৮। ইহাতে কোন আইনের প্রয়োজন হয় না।
৯। পরিচালকের সংখ্যা পরিবর্তনে সরকারী আদেশ দরকার হয়।	৯। ইহাতে সরকারী আইনের প্রয়োজন নাই।
১০। আবর্তন প্রথায় পরিচালকগণ অবসর গ্রহণ করে	১০। উহা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

কোম্পানী আইনে ঘরোয়া কোম্পানীর উপর বাধা নিষেধ (Restriction on Private Company according to Companies Act) :—

১। প্রত্যেক ঘরোয়া কোম্পানীর নামের শেষে 'ঘরোয়া' কথাটি লিখিতে হইবে।

২। উপযুক্ত হিসাব পরীক্ষক দ্বারা ইহার হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে।

৩। কমপক্ষে ইহাতে দুইজন পরিচালক রাখিতে হইবে।

৪। নিবন্ধকের নিকট ইহার হিসাবপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৫। সভ্য সংখ্যা ৫০ জনের বেশী হইবে না।

৬। বিজ্ঞাপনী প্রচার করে নাই বলিয়া নিবন্ধকের নিকট লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

৭। ইহার শেয়ার অবাধ হস্তান্তর যোগ্য নহে।

নিম্নলিখিত অবস্থাতে ঘরোয়া কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানী বলিয়া গণ্য হয় :—

(ক) মোট মূলধনের অন্ততঃ ২৫ ভাগ যদি একটি কোম্পানীতেই বিক্রয় করা হইয়া থাকে এবং—

(খ) ঐ শেয়ার ক্রেতা কোম্পানীর একটিও যদি সার্বজনিক কোম্পানী হয় তবে ঐ ঘরোয়া কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানী বলিয়া গণ্য হইবে।

সার্বজনিক কোম্পানী অপেক্ষা ঘরোয়া কোম্পানীর জনপ্রিয়তার কারণ (Popularity of Private Company Over Public Company) :—

১। **গঠন** (Formation) :—

ঘরোয়া কোম্পানীর গঠন সার্বজনিক অপেক্ষা অনেক সহজ। দুইজন সভ্য হইলেই কোম্পানীর পত্তন করা যায়। অভিজ্ঞান পত্রের দরকার নাই। বিজ্ঞাপনী প্রচারের প্রয়োজনও ইহাতে নাই।

২। **মূলধন** (Capital) :—

ইহাতে মূলধন সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ। শেয়ার অবাধ হস্তান্তর যোগ্য না হওয়ায় বন্ধুত্ব ও প্রীতি আরও অধিক হয়। ফলে তাহারা প্রচুর মূলধণ সরবরাহ করে।

৩। **দায়িত্ব** (Liability) :—

শেয়ার হোল্ডারগণের উভয় প্রকার কোম্পানীতে দায় দায়িত্ব সীমাবদ্ধ।

৪। **পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ** (Managemant and Control) :—

সভ্যগণ ঘরোয়া কোম্পানীতে পরস্পর পরিচিত। সেজন্য মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না। আর সে জন্য পরিচালনায় কোনরকম শিথিলতা আসে না। সুতরাং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়া ঘরোয়া কোম্পানী শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে।

সমবায় কারবারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য (Meaning and Features of Co-operative Form of Business) :—

নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে দরিদ্র একক ব্যক্তিরা যদি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কোন আর্থিক সংস্থা গড়িয়া তোলে তাহা হইলে তাহাকে **সমবায় সমিতি** বলে। যেমন, দরিদ্র কৃষক সমিতি, ক্রেতা সমিতি প্রভৃতি।

বৈশিষ্ট্য (Features) :—

১। **পুঁজি** (Capital) :—

সমিতির সভ্যরা যৌথভাবে ইহার পুঁজি সরবরাহ করে।

২। **ভোটাধিকার** (Voting Right) :—.

মূলধনের পরিমাণ বিচার না করিয়াই প্রত্যেক সভ্যই একটি করিয়া ভোট দিতে পারে।

৩। **দায়িত্ব** (Liability) :—

সভ্যদের দায়িত্ব এরূপ সমিতিতে সীমিত অথবা অসীম উভয়ই হইতে পারে।

৪। **পরিচালনা** (Management) :—

এই সমিতির পরিচালনা নির্বাচিত সভ্যর হাতে ন্যস্ত হয়। পরিচালক মণ্ডলীতে একজন সভাপতি ও একজন কর্মসচিব থাকেন।

৫। **সদস্যপদ** (Membersip) :—

এই সমিতির সদস্যপদ সারাবৎসর খোলা থাকে। যে কোন সময় সদস্যপদ গ্রহণ করা যায়।

৬। **শেয়ারের হস্তান্তর যোগ্যতা** (Transfer of Shares) :—

এই সমিতির শেয়ার হস্তান্তর করা যায় না। শেয়ারগুলি সমিতির নিকট ফেরৎ দেওয়া যায়। কোন সদস্যর মৃত্যুর পরে তাহার উত্তরাধিকারীগণই উহার মালিক হয়।

৭। **পারস্পরিক বিশ্বাস** (Mutual Faith) :—

সভ্যদের পারস্পারিক বিশ্বাসই এই সমিতির মূল মন্ত্র।

৮। **মুনাফা** (Profit) :—

মুনাফা অর্জ্জন এই কারবারের মুলকথা নহে। সদস্যদের সেবাই এই সমিতির প্রাণকেন্দ্র।

৯। **আইন স্বীকৃত সত্তা** (Legal Entity) :—

যৌথ মূলধনী কারবারের মতই এই কারবারেরও একটা পৃথক আইন স্বীকৃত সত্তা আছে। সদস্যদের হইতে এই আইন স্বীকৃত সত্তাটী সম্পূর্ণ পৃথক।

১০। **গঠন** (Formation) :—

এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য কমপক্ষে দশজন সভ্যব প্রয়োজন হয়।

সমবায়ের মূলনীতি সমূহ (Fundamental Principles of Co-operative) :—

১। **ঐচ্ছিক** (Optional) :—

সমবায় সমিতি একটি ঐচ্ছিক প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে সভ্যদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

২। **সাম্য** (Equality) :—

এরূপ ব্যবসা সাম্যর উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ প্রত্যেক সভ্যর অধিকার সমান। কেহ ছোট বড় নহে।

৩। **একতা** (Unity) :—

ধনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্যই এরূপ কারবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং সভ্যদের ভিতরে একতাবোধ খুব বেশী দেখা যায়।

৪। **মিতব্যয়িতা** (Less Expensive) :—

সমস্ত রকম খরচ কমাইয়া সভ্যরা এরূপ প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ পায়ে দাঁড়াইতে উৎসাহী হয়।

৫। **শান্তি** (Happiness) :—

সভ্যদের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ থাকে না বলিয়া সকলেই সুখে-শান্তিতে কাজ করিতে পারে। কেহ অসন্তুষ্ট হয় না।

সমবায়ের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Dis-advantages of Co-operative) :—

সুবিধা (Advantages) :—

১। এই সমিতির সভ্যরা সাধারণতঃ দরিদ্র ও দুর্বল। তাহারা কম সুদে-এই সমবায় হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। মহাজনদের শিকার হয় না।

২। অল্প সঞ্চয়ের উপরও সভ্যরা সুদ পায়। ইহাতে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধিপায়।

৩। কম ও ন্যায়সঙ্গত মূল্যে সভ্যগণ সমিতি হইতে প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করিতে পারে।

৪। সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের একচেটিয়া ও মুনাফাখোরী কারবার অনেকাংশে হ্রাস পায়।

৫। সমিতির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিয়া সভ্যগণ ক্রয়, বিক্রয় ও সমিতি পরিচালনায় দক্ষ হইয়া উঠে।

৬। এই সমিতি গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হয় এবং ইহার মাধ্যমে গণতন্ত্রের নীতিও সহজে প্রচারিত হইতে পারে।

অসুবিধা (Dis-Advantages) :—

১। এই সমিতির প্রধান অসুবিধা হইতেছে পুঁজির স্বল্পতা। পুঁজির স্বল্পতার জন্য অনেক সময় এই সমিতি টিকিয়া থাকে না।

২। দরিদ্রশ্রেণীর সুবিধার জন্য এই সমিতির সৃষ্টি। কিন্তু শিক্ষার অভাবে অনেক সময় তাহারা এই সমিতিতে উৎসাহ পায় না।

৩। যথেষ্ট পরিমাণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ এই সমিতির উপর না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনায় অসুবিধা দেখা যায়।

৪। অনেক ক্ষেত্রে কর্ত্তা ব্যক্তিদের পক্ষপাতিত্বের জন্য এই সমিতির সুবিধা মাত্র একটা শ্রেণীর উপর বর্ষিত হয়।

৫। চাহিদার ক্রম-পরিবর্তনশীলতার সহিত অনেক সময় সমিতি সমতা রাখিতে পারে না।

৬। সমবায় সমিতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সভ্যদের ত্যাগ স্বীকার, সেবার মনোভাব, প্রভৃতি গুণের উপর। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ সকল গুণাবলী সভ্যদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলে সমিতি বন্ধ হইয়া যায়।

বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি (Kinds of Co-operative Societies) :—

১। **উৎপাদক সমবায় সমিতি** (Producers' Co-operative Society) : |
একই প্রকার দরিদ্র পণ্য-উৎপাদকগণ নিজেরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যদি কোন সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তবে তাহাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে।

মূলধন ও পরিচালনা তাহারা নিজেরাই দেখাশুনা করে ও লাভ-লোকসান ভাগ করিয়া লয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এরূপ সমিতি স্বার্থকতা লাভ করিতে

পারে না কারণ সীমিত মূলধন ও অনভিজ্ঞ পরিচালনাই ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রকার সমিতিকে আবার শিল্প সংক্রান্ত সমবায় সমিতিও বলা হয়।

২। **ক্রেতা সমবায় সমিতি** (Consumers' Co-operative Society) :—

নিরীহ ক্রেতাগণ সাধারণতঃ ধূর্ত্ত ব্যবসায়ী ও মধ্য-ব্যবসায়ী দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে। সমাজ হইতে উহাদের অত্যাচার দূর করিবার জন্য যদি ক্রেতাগণ নিজেরাই সম্মিলিত ভাবে কোন-পণ্য ক্রয়ের জন্য কোন সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তবে তাহাকে ক্রেতা সমবায় সমিতি বলে। এই প্রকার সমিতির প্রধান লক্ষ্য হইল ক্রেতাগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করা। সাধারণতঃ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ এই বিপণীতে বিক্রয় হইয়া থাকে। সদস্যগণই পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ও মুনাফা ভাগ করিয়া লয়।

৩। **সমবায় ক্রয় সমিতি** (Co-operative Purchasing Society) :—

সাধারণত: কাঁচামাল, সার, বীজ, প্রভৃতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রকার সমিতি অনেকাংশে দরিদ্র কৃষক ও কুটির-শিল্পীকে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর হাত হইতে রক্ষা করে।

৪। **ঋণদান ও অঋণদান সমবায় সমিতি** (Credit and Non-Credit Co-operative Society) :—

১৯০৪ সালে দরিদ্র কৃষকগণকে ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে ঋণদান সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠে। প্রত্যেক সভ্যকে তাহার সুবিধা মত সর্ত্তে কিস্তীতে ঋণ দেওয়া হয়। ইহার লভ্যাংশের একটা অংশ সঞ্চিত রাখিয়া বাকী অংশ সভ্যদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। নিরীক্ষককে দিয়া ইহার হিসাব পরীক্ষা করাইয়া লইতে হয়। অন্যদিকে ১৯১২ সালে অঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রধান কাজ সার, বীজ, সূতা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সভ্যদের সরবরাহ করা।

৫। **সমবায় গৃহনির্ম্মাণ সমিতি** (Co-operative Housing Society) :—

অল্প-আয়সম্পন্ন লোকের গৃহসমস্যা সমাধানের জন্য এই প্রকার সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। সমিতির শেয়ার বিক্রয় লব্ধ অর্থ ও অন্যান্য অর্থ হইতে সভ্যদের কমসুদে গৃহনির্ম্মাণের জন্য ধার দেওয়া হয়। সদস্যদের গৃহই তাহাদের জামিনের কাজ করে।

৬। **বহুমুখী সমবায় সমিতি** (Multipurpose Co-operative Society) :—

যখন কোন সমিতি একের অধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে। যেমন ; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, প্রভৃতি উদ্দেশ্যে যদি কোন সমিতি-গঠিত হয় তবে তাহাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে।

উপরে বর্ণিত সমিতি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার সমিতি হইতে পারে, যেমন : গো-বীমা সমিতি, সেচ প্রকল্প সমিতি, দুগ্ধ-সমবায় সমিতি, পুস্তক সমবায় সমিতি ইত্যাদি।

সমবায় সমিতি ও যৌথ কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Co-operative Society and Joint Stock Company) :—

সমবায় সমিতি	যৌথ কোম্পানী কারবার
১। মুনাফা লাভের একমাত্র আশায় ইহা প্রতিষ্ঠা হয় না। জন-কল্যাণমূলক কাজও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।	১। মুনাফা অর্জনই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই আশায় যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করা হয়।
২। ইহার গঠন পদ্ধতি খুব জটিল নয়। ইহার গঠন স্বল্প-ব্যয়সাধ্য।	২। ইহার গঠন বিভিন্নপ্রকার আইনগত পদ্ধতির মধ্য দিয়া সম্ভব হয়। ইহার গঠন অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য।
৩। সভ্যদের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ যখন খুশী পরিবর্তন করা যায়। কোন অসুবিধা হয় না।	৩। ইহার শেয়ার মূলধনের পরিবর্তন ইচ্ছামত করা যায় না। সরকারের অনুমতি লইতে হয়।
৪। এই সমিতির শেয়ারের মূল্য ফেরৎ পাওয়া যায়।	৪। কোম্পানী এই শেয়ারের মূল্য ফেরৎ দেয় না।
৫। ইহাতে পরিচালকদের কোন শেয়ার ক্রয় করার বাধ্য-বাধকতা নাই।	৫। ইহাতে পরিচালকদের একটি নির্দিষ্ট মূল্যের শেয়ার ক্রয় করিতে হয়।
৬। সদস্যরা পরিচালনায় প্রত্যক্ষ-ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে।	৬। ইহাতে সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না।
৭। ইহাতে সকল সদস্যই একটি করিয়া ভোট দিতে পারে।	৭। ইহাতে সদস্যদের ভোটের ক্ষমতা ক্রীত শেয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়।
৮। এই সমিতিকে আয়কর অথবা ষ্ট্যাম্প ফি দিতে হয় না।	৮। ইহাকে আয়কর, ষ্ট্যাম্প ফি প্রভৃতি দিতে হয়।
৯। সদস্যরা অল্প পরিচালনার পারিশ্রমিকে সমিতি পরিচালনা করে।	৯। সদস্যরা প্রচুর অর্থ পারি-শ্রমিক হিসাবে লয়।

সমবায় সমিতি	যৌথ কোম্পানী কারবার
১০। ইহাতে শ্রমিক ও মালিক বিরোধ দেখা যায় না।	১০। ইহাতে শ্রমিক মালিক বিরোধ দেখা যায়।

রাষ্ট্রীয় কারবারের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও গঠন পদ্ধতি (Meaning, Objects and Formation of State Enterprise) :—

সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্র যদি কোন কারবার পরিচালনা করে তবে তাহাকে **রাষ্ট্রীয় কারবার** বলে।

সাধারণতঃ সমাজতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র এই প্রকারের কারবার গড়িয়া উঠে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সমস্ত কারবারই সরকার পরিচালনা করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপাদকের হাতে উৎপাদন ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আর মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার ও ব্যক্তি উভয়েই উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে।

উদ্দেশ্য (Objects) :—

১। সেবাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, মুনাফা নহে। ব্যক্তিগত মালিকানায় ক্রেতাগণ বেশী মূল্যে পণ্য ক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সরকারী কারবারে ইহা সম্ভব হয় না।

২। দেশের নিরাপত্তার জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা একান্ত দরকার।

৩। রাষ্ট্রীয় কারবার দ্বারাই দেশের অসম ধনবণ্টন ব্যবস্থা রদ করা যায়।

৪। রাষ্ট্রীয় কারবার দ্বারাই দেশের বেকার সমস্যা বহুলাংশে রদ করা যায়।

৫। অনুন্নত দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রীয় কারবার একান্ত দরকার।

৬। ব্যক্তিগত মালিকানায় পুঁজির জন্য অনেক সময় কারবার বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কারবারে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

গঠন পদ্ধতি (Formation) :—

১। জাতীয়করণ নীতির দ্বারা রাষ্ট্রীয় কারবার গঠিত হইতে পারে। যেমন, ব্যাঙ্ক।

২। কোন কারবারের একটি অংশকে সরকারী বিভাগে পরিণত করিয়া রাষ্ট্রীয় কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যেমন, ডাক বিভাগ।

৩। যে কোন বে-সরকারী কারবারের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমেও এই রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

৪। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সরকারী কর্মীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও রাষ্ট্রীয় কারবার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

৫। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থেও রাষ্ট্রীয় কারবার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Dis-advantages of State Enterprise) :—

সুবিধা (Advantages) :—

১। প্রচুর পরিমাণ পুঁজি লইয়া কারবার আরম্ভ করা যায়। ইহাতে উন্নত ধরণের কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে।

৩। মুনাফা অর্জন ইহার উদ্দেশ্য নহে। সেজন্য কম মূল্যে ক্রেতাগণ ভাল পণ্য ক্রয় করিতে পারে।

৪। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলিয়া কোন প্রকার ফাটকাবাজী কারবার গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৫। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় সরকারী মালিকানা ও পরিচালনা থাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত হইতে পারে না।

৬। সরকারী মালিকানাতে জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্ভব হয় ও পণ্যর উর্ধ্বমূল্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

অসুবিধা (Dis-advantages) :—

১। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত না হওয়ার জন্য এ ব্যবসায়ে প্রচুর পরিমাণে সম্পদের ধ্বংস হয়। ইহা ব্যয় বহুল হইয়া উঠে।

২। পণ্য উৎপাদন দ্রুত হইতে পারে না। কারণ সরকারী মালিকানায় কাজকর্ম অত্যন্ত ধীর ভাবে হয়। ইহাতে বাজারে সুনাম নষ্ট হয়।

৩। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবসা আত্মীয়পোষণ ক্ষেত্র হইয়া থাকে।

৪। মুনাফা অনেক সময় কারবারের অগ্রগতি পরিমাপ করে। এ কারবারে মুনাফা না থাকায় কারবারের অগ্রগতি পরিমাপ করা যায় না।

৫। অনেক ক্ষেত্রে পণ্যর উর্ধ্বমূল্য এই কারবার দ্বারা রোধ করা যায় না।

রাষ্ট্রীয় কারবার ও বে-সরকারী কারবারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction beetween State and Private Enterprise) :—

রাষ্ট্রীয় কারবার	বে-সরকারী কারবার
১। জনকল্যাণই এই প্রকার কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশের সম্পদের প্রকৃত ব্যবহারই ইহার উদ্দেশ্য।	১। এই ব্যবসার প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। জনগণকে অধিক পরিমাণ শোষণ ও প্রকৃত সম্পদের অপব্যবহার এই কারবারের অন্যতম উদ্দেশ্য।
২। সরকারই এই কারবারের মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকে।	২। কারবারের মালিকেরাই এই কারবারের মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকে।
৩। সরকারী কারবারে প্রতিযোগিতা থাকে না। কারণ ইহা প্রতিযোগিতামূলক নহে।	৩। মুনাফা অর্জনই ইহার উদ্দেশ্য সুতরাং প্রতি পদক্ষেপে প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়।
৪। নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত হওয়ায় সরকারী কারবারে কোনপ্রকার ফাটকা ব্যবসায়ের স্থান নাই।	৪। ফাটকা কারবার এইপ্রকার কারবারের প্রতিটি স্তরে দেখা যায়।
৫। এই প্রকার ব্যবসায়ে কোন প্রকার মূলধনের অভাব হয় না। কারণ সরকার প্রচুর মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকে।	৫। অনেক সময় মূলধনের অভাবে এই কারবার বন্ধ হইয়া যাইতে দেখা যায়।
৬। সরকারী কারবার অতি নিপুণতার সহিত পরিচালিত হয় বলিয়া ইহা কম মূল্যে ক্রেতাদের পণ্য সরবরাহ করিতে পারে।	৬। দক্ষ পরিচালনার অভাবে এইপ্রকার কারবারে উৎপাদন ব্যয় বেশী হয়। ফলে ক্রেতাগণ বেশী দামে পণ্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

রাষ্ট্রীয় কারবারে লোকসানের কারণ (Causes for the loss in State Enterprises) :—

বিভিন্ন প্রকার কারবার সরকার আমাদের দেশে পরিচালনা করিয়া থাকে।

ইহাদের কিছু কিছু লাভের ভিত্তিতে আবার কিছু কিছু লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। দক্ষ পরিচালক, প্রচুর মূলধন, প্রচুর কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও সরকারী কারবারে যে সকল কারণে লোকসান হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে নীচের কারণ সমূহ প্রধান।

১। সেবার ভিত্তিতে কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই চিন্তা ধারা মুনাফা অর্জনের দিকে কোন গুরুত্ব দেয় না। ফলে লোকসান হয়।

২। রাষ্ট্রীয় কারবারে প্রচুর উচ্চ বেতন ভোগী কর্মচারী থাকে। ইহাতে পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং লোকসানে পরিচালিত হয়।

৩। আত্মীয় ও স্বজন পোষণ নীতি অনেকাংশে এই লোকসানের জন্য দায়ী।

৪। দ্রুত সরকারের পরিবর্তনের ফলে সরকারী নীতিরও পরিবর্তন হয়। ইহার ফলে কারবারে লোকসান হয়।

৫। রাষ্ট্রীয় কারবারের যাহারা কর্ণধার তাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা না, থাকার জন্যও কারবার লোকসানে পরিচালিত হয়। এমনকি তাহাদের অনেকের কর্ম-প্রেরণাও থাকে না।

রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত কারবার সমূহ (Various Business Controlled by State Enterprises) :—

১। **প্রতিরক্ষা শিল্প :—**

দেশরক্ষার জন্য এই শিল্প যেমন অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রভৃতি আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পবিচালিত হয়।

২। **ডাক ও তার বিভাগ :—**

ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে সরকারী পরিচালনায় রহিয়াছে। ইহা বে-সরকারী মালিকানায় ছাড়িয়া দিলে জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে।

৩। **বিদ্যুৎ উৎপাদন :—**

ইহা অতি প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পদ। সেজন্য সরকার আমাদের দেশে ইহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছে।

৪। **ভারী শিল্প ও মূল শিল্প :—**

আমাদের দেশের ভারী ও মূল শিল্প যেমন, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, প্রভৃতি সরকারী মালিকানায় পরিচালিত হয়। দেশের উন্নতি অনেকাংশে এই শিল্পের উপর

নির্ভর করে। বে-সরকারী মালিকানায় ইহা ছাড়িয়া দিলে দেশের প্রচুর ক্ষতি হয়।

৫। **মুদ্রা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসা :**

পণ্যমূল্য ও অর্থের মূল্য স্থির রাখিবার জন্য আমাদের দেশে ইহা সরকার পরিচালনা করে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে সম্প্রতি আমাদের দেশে আবার রাষ্ট্রায়ত্ব করা হইয়াছে।

৬। **বীমাব্যবসা :—**

জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে এই ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে।

৭। **ভেষজ ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহ :—**

আমাদের দেশে আফিম, পেনিসিলিন প্রভৃতির মান ও মূল্য ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে ইহা সরকারী মালিকানায় পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইহা ছাড়াও আমাদের দেশে একচেটীয়া কারবার, যান-বাহন নির্মাণ শিল্প, আমদানী-রপ্তানী শিল্প প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হইতে দেখা যায়।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. এক মালিকী কারবার কাহাকে বলে? এই কারবারের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(What do you mean by Sole-Proprietorship Business ? Discuss briefly its characteristics, advantages and dis-advantages).

2. যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার কাহাকে বলে? উহার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

(What is meant by a Joint Hindu Family Business ? Discuss its features).

3. যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার ও একমালিকী কারবারের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(Discuss the erits and De-merits of Joint Hindu Family

Business. Disscuss also the importance of Joint Hindu family business and Sole-Propritorship Business in Indian Economy).

4. অংশীদারী কারবার কাহাকে বলে ? ইহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট কি ?

(What is meant by Partnership Business ? What are its essential Features ?)

5. অংশীদারী কারবারের দলিলের প্রধান ধারাগুলি আলোচনা কর।

(Discuss the main clauses of Partnership Deed).

6. অংশীদারীকারবারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Discuss the advantages and Dis-advantages of Partnership Business).

7. অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের অধিকার ও দায়িত্ব বর্ণনা কর।

(Discuss the Rights and obligations of Partners in Partnership Business).

8. বিভিন্ন প্রকার অংশীদারী কারবার সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(Briefly discuss the various types of Partnership Business).

9. পরিমিত অংশীদারী কারবারের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা এবং অসুবিধা বর্ণনা কর।

(Discuss the Features, Advantages and Dis-advantages of Limited Partnership).

10. অংশীদারী কারবার ও যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

(Distinguish between Partnership business and Joint Hindu Undivided family Business).

11. যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার ও পরিমিত দায়যুক্ত অংশীদারী কারবারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

(Distinguish between Joint Hindu Undivided Family Business and Limited Partneship Business).

12. একমালিকী কারবার ও অংশীদারী কারবারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

(Distinguish between Individual Ownership form of Business and Partnership form of Business).

13. অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন বলিতে কি বুঝ? কি প্রকারে ইহা করিতে হয়? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What is meant by Registration of Partnership Business? How it is done? Discuss the advantages and dis-advantages of such Registration).

14. অংশীদারী কারবার কি ভাবে ভঙ্গ হয়?

(How can a firm of Partnership be dissolved)?

15. যৌথ মূলধনী কারবার কাহাকে বলে? ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

(What is meant by Joint Stock Company? What are its main Features or Characteristics)?

16. সংক্ষেপে বিভিন্ন প্রকার যৌথ মূলধনী কোম্পানীর পরিচয় দাও।

(Discuss briefly the different kinds of Joint Stock Company).

17. সীমিত কোম্পানী কাহাকে বলে? ইহা কি প্রকারে গঠিত হয়?

(What do you mean by Limited Liability Company? How it is formed)?

18. যৌথ মূলধনী কোম্পানীর 'স্মারকলিপি' ও 'আভ্যন্তরিন নিয়মাবলী' বলিতে কি বুঝ? ঐ সকল দলিলের প্রধান প্রধান ধারাগুলি আলোচনা কর।

(What do you mean by 'Memorandum of Association' and Articles of Association of a Joint Stock Company? What are the main clauses of those documents)?

19. যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Discuss the advantages and dis-advantages of Joint Stock Company).

20. অংশীদারী কারবার ও সীমিত যৌথ মূলধনী কারবারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

(Distinguish between a Partnership business and Joint Stock Company with Limited Liability business).

21. সাবজনিক ও ঘরোয়া কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

(Discuss the differences between Public and Private Company).

22. কোম্পানী আইনে ঘরোয়া কোম্পানীর উপর কি কি বাধা নিষেধ আরোপ

করা হইয়াছে? এবং সার্বজনিক কোম্পানী অপেক্ষা ঘরোয়া কোম্পানীর জনপ্রিয়তার কারণ আলোচনা কর।

(Briefly discuss the restrictions imposed on Private Company according to Companies Act. And also discuss the cause of popularity of Private Company over Public Company).

23. সমবায় কারবার কাহাকে বলে? ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(What is meant by Co-operative form of Business? What are its essential Features)?

24. সমবায় কারবারের সুবিধা, অসুবিধা ও মূলনীতিগুলি আলোচনা কর।

(Discuss the advantages, dis-advantages and main principles of Co-operative form of Business).

25. বিভিন্ন-প্রকার সমবায় সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the different kinds of Co-operative Societies).

26. সমবায় সমিতি ও যৌথ কারবারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

(Distinguish between a Co operative Society and a Joint Stock Company).

27. রাষ্ট্রীয় কারবার কাহাকে বলে? ইহা কি প্রকারে গড়িয়া উঠে? এবং ইহার উদ্দেশ্য কি?

(What is meant by State Enterprise? How it is formed? What are its objects)?

28. রাষ্ট্রীয় কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

(Discuss the advantages and dis-advantages of State Enterprise).

29 রাষ্ট্রীয় কারবার ও বেসরকারী কারবারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

(Distinguish between State Enterprise and Private Enterprise).

30. যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ে রাষ্ট্রীয় কারবার প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা আলোচনা কর এবং ভারতে রাষ্ট্রীয় কারবার লোকসানে-চলার কারণ বর্ণনা কর।

(Discuss briefly the important fields of bnsiness in which State Enterprise has been introduced. And discuss also the reasons of running State Enterprise in India at a loss).

যৌথ মূলধনী কারবারের প্রবর্তন

(Promotion of Joint Stock Company)

যৌথ মূলধনী কারবারের প্রবর্তন ও উহার প্রবর্তকের কার্যপদ্ধতি (Promotional Steps and Functioning of Promoter in Joint Stock Company)—

পৃথিবীতে কোন জিনিষ আপনা হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না। ইহার জন্য ত্যাগ স্বীকার ও সাধনার দরকার হয়। এই ত্যাগ স্বীকার ও সাধনা যে কোন একজন লোককে করিতেই হইবে। অন্যথায় কোন কাজ তাহার পক্ষে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে না। সেজন্য যে ব্যক্তি কোন একটি জিনিষকে শুরু থেকে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বাস্তবে রূপায়িত করেন তাহাকে আমরা সাধারণ কথায় 'স্রষ্টা' বলিতে পারি। আর কারবারের ভাষায় তাঁহাকেই প্রবর্তক বলা হয়। ব্যাপারটাকে আর একটু ভাল করিয়া অর্থাৎ পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, কোন একটি কোম্পানীর স্থাপন করিবার চিন্তা হইতে শুরু করিয়া উঁহাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন কার্য বা দায়িত্ব যিনি সম্পন্ন করেন তিনি **প্রবর্তক** নামে পরিচিত। আর তাঁহার সমস্ত রূপদানের কাজকে **প্রবর্তন** বলা হয়। এই প্রবর্তক একজন ব্যক্তি হইতে পারেন আবার একের অধিক ব্যক্তিও হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা প্রবর্তক নামেই পরিচিত হইবেন।

ব্যবসা জগতে বিভিন্ন ধরণের প্রবর্তক দেখা যায়। কিন্তু উহাদিগকে তিনটি পরিষ্কার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই শ্রেণী বিভাগ অবশ্য উহাদের কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই করা হইয়াছে। এই **তিনপ্রকার প্রবর্তক** হইতেছেন যথাক্রমে (ক) **পেশাদার**, (খ) **সাময়িক** এবং (গ) **বিশেষ প্রবর্তক**।

প্রথম শ্রেণীর প্রবর্তক বা **পেশাদার প্রবর্তকেরা** নতুন নতুন কোম্পানী বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে স্থাপন করেন। এইরূপ স্থাপনের পর যখন ঐ কোম্পানী নিবন্ধীকৃত হইয়া যায় তখন উহাদের নিকট হইতে ঐ পেশাদার প্রবর্তকগণ তাহাদের পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। তাহার পরে তাহারা ঐ কোম্পানীর সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ইহার পরেই তাঁহারা আবার অন্য নতুন কোম্পানী স্থাপনে উদ্যোগী হন। এইরূপে তাহাদের কার্য চলিতে থাকে।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবর্তক অর্থাৎ **সাময়িক প্রবর্তকেরা** বিভিন্ন কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন। প্রয়োজনবোধে তাহারা বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালকের ভূমিকা ভালভাবে গ্রহণ করেন। ঐ সমস্ত কোম্পানীর বেশীর ভাগ শেয়ার তাহারা ক্রয় করিয়া লয় এবং ঐ প্রকার শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা তাহারা ঐ সকল কোম্পানীতে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। কোন সময়ে সহজেই তাহারা ঐ কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক খারাপ করেন না।

শেষ শ্রেণীর প্রবর্তক অর্থাৎ **বিশেষ প্রবর্তকেরা** সর্বদা একটিমাত্র কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হন এবং সব সময় ঐ কোম্পানীর উপর নিজেদের অধিক কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। ইহারা অনেক সময় বিভিন্ন একমালিকী, অংশীদারী কারবারের পরিবর্তন ঘটাইয়া এই যৌথ মূলধনী কোম্পানী স্থাপনে উদ্যোগী হন। কোম্পানীর উপর ইহারা প্রচুর অধিকার বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর প্রবর্তককে বিশেষ প্রবর্তক বলা হয়।

কোন একটা কোম্পানীর শুরু বা প্রবর্তন এই প্রবর্তকের প্রধান কাজ। এই সকল কাজ প্রবর্তকেরা সাধারণতঃ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রবর্তকেরা কোন একটা কোম্পানীর প্রবর্তনের কাজ সম্পন্ন করেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

১। **কারবারের সম্ভাবনা উদ্ভাবন** (Discovery of idea) :—

কোন একটি কারবারের প্রবর্তনের জন্য প্রবর্তক সকল প্রকার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেন। তিনি ঐ কারবারের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথাও চিন্তা করেন। এই প্রকার সমস্ত সম্ভাবনা চিন্তা করিয়াই তিনি তাহার চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে অগ্রসর হইবেন। ইহা ছাড়াও তিনি কাজের প্রকৃতি, ঝুঁকি, মূলধন, ও অন্যান্য সমজাতীয় বিষয়ও চিন্তা করেন। কারণ এই সকল কথা চিন্তা না করিয়া কাজে অগ্রসর হইলে সমূহ বিপদ এবং হয়তো তাহার পক্ষে কারবারটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নাও হইতে পারে।

২। **অনুসন্ধান** (Investigation) :—

কারবারের প্রাথমিক স্তরের পরে অর্থাৎ কারবারের সম্ভাবনা উদ্ভাবনের পরে প্রবর্তক কারবারের সম্পর্কে অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখেন। এই অনুসন্ধান হইতে কোম্পানীটি পরিচালনা করা লাভজনক হইবে কিনা তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে তিনি বিচার করিয়া দেখেন। কারণ বলাবাহুল্য, লাভ ভিন্ন কোন কারবার পরিচালনা

করা অর্থহীন। এই লাভ-লোকসান হিসাব করিবার সময় তিনি প্রস্তাবিত কোম্পানীর কাল্পনিক একটি আয়-ব্যয়ের হিসাবও মোটামুটি করিয়া দেখেন। ইহাতে যদি ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হয় তবে কারবারটি আশাপ্রদ হইবে। অন্যথায় ঐ কারবার পরিচালনা করা অর্থহীন হইবে। এই অনুসন্ধান দ্বারা তিনি যদি সন্তুষ্ট হইতে পারেন তবে তিনি পরবর্তী স্তরের কথা চিন্তা করিবেন।

৩। **প্রয়োজনীয় প্রবর্তক সংগ্রহ** (Assembly of Requisite number of Promoters) :—

একজন লোকের বিচার-বুদ্ধি যতই প্রখর হোক তাহা কোন না কোন দিক দিয়া অসম্পূর্ণ থাকিবেই। সেজন্য প্রবর্তক তাঁহার কারবারের কথা বিভিন্ন লোকের সহিত আলোচনা করিবেন। ইহাতে তাঁহার নিজের কোথাও দোষত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন হইয়া যায়। ইহার পরে দেখা দেয় কোম্পানীর নিবন্ধনের প্রশ্ন। ঘরোয়া কোম্পানী হইলে এইরূপ নিবন্ধন করিতে হইলে কমপক্ষে দুইজন এবং সার্বজনিক কোম্পানী হইলে কমপক্ষে সাতজন সদস্যের দরকার হয়। সুতরাং এই প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তকেরা নিজেরাই সদস্যের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন এবং নিবন্ধীকৃত হইতে সাহায্য করেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, যে সকল ক্ষেত্রে একজন মাত্র প্রবর্তক থাকে সেস্থানে সাতজন সদস্য কোথা হইতে আসিবে ? সেজন্য, ঐ সকল স্থানে ঐ প্রবর্তককে আরও বাকী ছয়জন প্রবর্তক সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার পরে ঐ কোম্পানী নিবন্ধীকৃত হয়। ঐরূপ নিম্নতম প্রবর্তক সংগ্রহ করার পরে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার পরে ঐ দলিল পত্রে স্বাক্ষর করিয়া, এবং প্রয়োজনীয় আইনের সাহায্যে নিয়মমাফিক উহা নিবন্ধকের নিকট পেশ করিতে হয়। ইহার পরে উহা ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া যদি নিবন্ধক সন্তুষ্ট হন তবেই ঐ কোম্পানীকে নিবন্ধকভুক্ত করেন। সুতরাং ঐ নিবন্ধনভুক্ত হইবার জন্য প্রবর্তককে প্রয়োজনীয় প্রবর্তক সংগ্রহ করিতে হয়।

৪। **মূলধন সংগ্রহ** (Capital Collection) :—

ঘরোয়া কোম্পানী যে কোন সময় কারবার আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু সার্বজনিক কোম্পানী তাহা পারে না। কারণ ইহাকে সর্বনিম্ন মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। সেজন্য ইহাকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা ঐ সর্বনিম্ন মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে যে, এই সর্বনিম্ন মূলধন ছাড়াও কোম্পানীর অন্য ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন প্রথমেই হইতে পারে। যেমন ঐ সকল সম্ভাবনা,

অনুসন্ধান, প্রভৃতির জন্য টাকার দরকার। এই সকল টাকা কোথা হইতে আসিবে। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ঐ সকল ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রবর্তকেরা তাহাদের ব্যক্তিগত তহবিল হইতে ঐ খরচ বহণ করিবেন। ইহার জন্য কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের প্রশ্ন উঠে না। এখন শেয়ার বিক্রয় করিবার সময় প্রবর্তকেরা বিজ্ঞাপনীর সাহায্যও লইয়া থাকেন। ঐ বিজ্ঞাপনী হইতে জনগণ ঐ নতুন কোম্পানী সম্পর্কে খবর পায় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ঐ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহ প্রকাশ করে। এইভাবে যখন কোম্পানী সর্বনিম্ন মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে তখন উহারা কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট হইতে কারবার আরম্ভের অনুমতি পত্র পায়।

৫। **আইনগত পদ্ধতি** (Legal Formalities) :—

কোম্পানী গঠনের প্রতিটি স্তরে আইন মানিয়া চলিতে হয়। অন্যথায় বে-আইনী ভাবে কোন কোম্পানী চলিতে পারে না। যখন কোন কোম্পানী তাহার নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট আবেদন করে তখন উহাকে আইন মাফিকই করিতে হয় এবং ঐ ব্যাপারে উহাকে আইনজ্ঞের সহিত পরামর্শ করিয়া লইতে হয় এবং ঐ প্রকার পরামর্শের পরে তবেই নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারে। যদি কখনও প্রমাণিত হয় যে কোন কোম্পানী বে-আইনীভাবে কোন কাজ কর্ম করিয়া চলিয়াছে তবে তাহার নিবন্ধন যে কোন সময়ে নিবন্ধক নষ্ট করিয়া দিতে পারেন।

৬। **সংগঠন** (Organisation) :—

ইহা কোম্পানীর প্রাণকেন্দ্র। সমস্ত নিয়মকানুন মানিয়া কোন একটা কোম্পানী শুরু হইল। কিন্তু তাহার পরে যদি উহার সংগঠন খারাপ হয় তবে ঐ কোম্পানী আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। সেজন্য প্রবর্তকগণকে সংগঠনের প্রতি ভাল ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বিভিন্ন প্রকার জমি ক্রয় করিয়া, গৃহ নির্মাণ করিয়া, যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া, কাঁচামাল, শ্রমিক প্রভৃতি উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া এই সংগঠনকে মজবুত করিয়া তুলিতে হয়। ইহাকে ঠিকমত করিতে না পারিলে কোম্পানী তৈয়ারী অথবা স্থাপনা বিফল হইয়া পড়ে এবং কোম্পানীর উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না।

সুতরাং উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, কোন যৌথ কোম্পানীর উন্নতি বা সফলতা উহার প্রবর্তকের উপরই নির্ভর করে। প্রবর্তক যত বিচক্ষণ, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন হইবে ঐ প্রতিষ্ঠান তত সহজেই উন্নতি লাভ করিবে।

যৌথ কোম্পানী ও ইহার বিভিন্ন প্রকার মূলধন (Joint Stock Company and its different kinds of Capital) :—

কোন একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানীর বিভিন্নপ্রকার মূলধন থাকিতে পারে। এই মূলধনকে সংক্ষেপে আমরা নিম্নরূপে বর্ণনা করিতে পারি :—

১। **অনুমোদিত মূলধন** (Authorised Capital) : —

কোন যৌথ মূলধনী কোম্পানী যে মূলধন লইয়া নথিভুক্ত হয় এবং যে পরিমাণ মূলধনের কথা উহার স্মারকলিপিতে উল্লেখ থাকে তাহাকেই অনুমোদিত মূলধন বলে। আপাতদৃষ্টিতে ঐ কোম্পানী উহা অপেক্ষা বেশী মূলধন থাকিলেও তাহার উল্লেখ করিতে পারে না। ঐ অর্থ কোম্পানীর সর্বোচ্চ অর্থ। এই অর্থকে কোম্পানীর প্রস্তাবিত, নামিক বা রেজিষ্ট্রীকৃত মূলধনও বলা হয়।

২। **বিক্রয় যোগ্য মূলধন** (Issued Capital) :—

কোম্পানীর স্মারকলিপিতে যে মূলধনের কথা উল্লেখ থাকে তাহাকে অনুমোদিত মূলধন বলে। কোন কোম্পানী ঐ অনুমোদিত মূলধন একসাথে শেয়ার বাজারে বিক্রয়ের জন্য নাও ছাড়িতে পারে। সেজন্য ঐ অনুমোদিত অর্থের যে অংশটুকু শেয়ার বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়ে তাহাকে বিক্রয়যোগ্য মূলধন বলে। অবশিষ্ট অংশ আবার কোম্পানী পরবর্তী সময়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়িতে পারে। ইহা সম্পূর্ণরূপে ঐ কোম্পানীর কারবারের নীতির উপর নির্ভর করিয়াই ঐ কোম্পানী করিয়া থাকে। এই মূলধনকে আবার প্রচারিত মূলধনও বলা হয়।

৩। **বিক্রীত মূলধন** (Subscribed Capital) :—

বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের সবটাই জনগণ ক্রয় করিতে নাও পারে। সেজন্য বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের যে অংশটুকু জনগণ ক্রয় করে তাহাকে বিক্রীত মূলধন বলে। বিক্রয়যোগ্য মূলধন এবং বিক্রীত মূলধন যে সব সময় এক হইবে তাহার কোন স্থীরতা নাই। এই পার্থক্যর কারণ বিভিন্নপ্রকার হইতে পারে। যেমন সব শেয়ার বাজারে বিক্রয় হয় নাই। সেক্ষেত্রে বিক্রীত মূলধন বিক্রয়যোগ্য মূলধন অপেক্ষা কম হইবে। আবার যাহারা শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থও জমা দিয়াছেন কিন্তু সবাইকে শেয়ার বিক্রয় করা হয় নাই, সেক্ষেত্রেও বিক্রীত মূলধন বিক্রয়যোগ্য মূলধন অপেক্ষা কম হইতে বাধ্য। সুতরাং বিক্রয়যোগ্য মূলধনের যে অংশ বা পরিমাণ ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে তাহাকেই বিক্রীত মূলধন বলে। ইহাকে আবার প্রতিশ্রুত মূলধনও বলা হয়।

৪। **তলবী মূলধন** (Called-up-Capital) :—

শেয়ার জনগণের নিকট বিক্রয় করিলে উহার মূল্য কিভাবে আদায় করা হইবে তাহা কোম্পানীর উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণ যেটা দেখা যায় তাহাতে ঐ শেয়ারের মূল্য কোম্পানী ক্রেতার নিকট হইতে একসাথেই আদায় করে না। ইহা করিলে ক্রেতার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং ইহার ফলে শেয়ার বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। সেজন্য ঐ সমস্ত টাকাটা বিভিন্ন ভাগে ভাগে আদায় করিতে পারে। ইহাতে ক্রেতাগণও খুশী হয়। সেজন্য ঐ টাকা বিভিন্ন সময়ে ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। কিন্তু ঐ টাকা আদায়ের আগে ক্রেতাদের তলব অর্থাৎ টাকা প্রদানের কথা মনে করাইয়া দিতে হয়। ঐ প্রকার তলব দিতে হয় বলিয়া উহাকে তলবী মূলধন বলা হয়।

৫। **আদায়ী মূলধন** (Paid-up-Capital) :—

তলব দেওয়ার পরে ক্রেতাগণ শেয়ারের মূল্যের যে অংশটুকু পরিশোধ করিয়া দেয় তাহাকে আদায়ী মূলধন বলে। কারণ ঐ টাকা আদায় হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ক্রেতাগণ কোম্পানীকে পরিশোধ করিয়া দিয়াছে।

৬। **অনাদায়ী মূলধন** (Un-paid Capital) :—

শেয়ারের মূল্যের সবটাই যে আদায় হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন শেয়ার ক্রেতাকে তাহার ক্রীত শেয়ারের উপর প্রদত্ত কিছু অর্থ হয়তো একটা নির্দিষ্ট দিনের ভিতরে পরিশোধ করিয়া দিতে বলা হইল। কিন্তু কোন কারণে ঐ শেয়ার ক্রেতা ঐ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে পরিশোধ করিতে পারিল না। তাহা হইলে এই অবস্থায় ঐ অর্থকে অনাদায়ী মূলধন বলা হয়। কারণ ঐ নির্দিষ্ট দিনের ভিতরে ঐ অর্থ বা মূলধন আদায় হয় নাই।

৭। **অতলবী মূলধন** (Uncalled Capital) :—

আপাতদৃষ্টিতে অনাদায়ী ও অতলবী মূলধন একমনে হইলেও উহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শেয়ারের মূল্যের যে অংশ ডাকা অর্থাৎ তলব করা হয় নাই তাহাকেই অতলবী মূলধন বলে। ধরা যাক প্রতিটি শেয়ারের দাম ১০ টাকা। ইহার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কোম্পানী ৮টাকা শেয়ার প্রতি ডাকিয়া আদায় করিয়া লইয়াছে। কিন্তু অবশিষ্ট ২ টাকা আর ঐ কোম্পানী কোন কারণবশত ডাকে নাই। তাহা হইলে ঐ ২ টাকাকে শেয়ার প্রতি অতলবী মূলধন বলা হইবে। পক্ষান্তরে যে শেয়ারের টাকা ডাকা অর্থাৎ তলব করা হইয়াছে কিন্তু শেয়ার ক্রেতা

কোন কারণবশত দিতে পারে নাই তাহাকেই অনাদায়ী মূলধন বলে। অর্থাৎ যে শেয়ারের টাকা তলব করা হয় নাই তাহাকে অতলবী মূলধন বলে।

৮। **মজুত মূলধন** (Reserved Capital):—

যে ক্ষেত্রে শেয়ারের সমস্ত অর্থই তলব করা হয় নাই অর্থাৎ একটা অংশ এখনও আদায় যোগ্য, সে ক্ষেত্রে যদি ঐ অর্থ আর না ডাকার সিদ্ধান্ত লওয়া হয় তবে তাহাকে মজুত মূলধন বলা হয়। ব্যাপারটা একটা উদাহরণের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া বলা যাইতে পারে যেমন, 'ক' কোম্পানী তাহার ১০ টাকার শেয়ারের মূল্যর ৯ টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে। আর শেয়ার প্রতি ক্রেতাদের নিকট ১ টাকা বাকী আছে। এই অবস্থায় কোম্পানী যদি বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা স্বীকার করিয়া লয় যে ঐ ১ টাকা শেয়ার প্রতি আর এখন ডাকা হইবে না। যখন কোম্পানী উঠিয়া যাইবে তখন ঐ টাকা আদায় করা হইবে। তাহা হইলে ঐ কোম্পানীর শেয়ার প্রতি মজুত মূলধনের পরিমাণ হইবে ১ টাকা। সুতরাং উহাই কোম্পানীর মজুত মূলধন।

শেয়ারের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Shares):—

কোন একটি যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকারের শেয়ারকে সংক্ষেপে আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করিতে পারি :—

১। **অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার** (Preference Shares):—

বিভিন্ন প্রকারে শেয়ার একটা কোম্পানীর থাকিতে পারে। কিন্তু ঐ বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের মধ্যে যে শ্রেণীর শেয়ার অন্যান্য শেয়ার অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করে তাহাদিগকে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বলা হয়। এই সুবিধাগুলি সাধারণত নিম্নরূপ হইয়া থাকে। লভ্যাংশ বণ্টনের ব্যাপারে এই অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ারের মালিকেরা অধিক সুবিধা ভোগকরে। এই শ্রেণীর মালিককে প্রথমে লভ্যাংশ পরিশোধ করিতে হয়। পরে অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে ভাগকরিয়া দেওয়া হয় এবং যখন কোম্পানী উঠিয়া যায় তখন ঐ শ্রেণীর শেয়ারের মালিকের দাবী অগ্রগণ্য হয়। অর্থাৎ উহাদের দাবী মিটাইয়া বাকী অর্থ অন্যান্য শেয়ারের মালিকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই দুইটি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার মালিকেরা উপরোক্ত সুবিধা ভোগ করে।

এই অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার আবার **নিম্নলিখিত প্রকারের** হইতে পারে যথা, (ক) সঞ্চয়ী-অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার, (খ) অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার

(গ) পরিশোধ্য অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার, (ঘ) অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার, (ঙ) নির্দিষ্ট হারে অংশভোগী অগ্রাধিকার শেয়ার এবং (চ) অনির্দিষ্ট হারে অংশভোগী অগ্রাধিকার শেয়ার।

(ক) **সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার** (Cumulative Preference Shares) :—

প্রত্যেক কোম্পানীর লাভের পরিমান প্রতি বৎসর সমান হয় না। কোন বৎসর কম আবার কোন বৎসর বেশী মুনাফা হয়। এই মুনাফা হইতে কোম্পানী তাহার বিক্রীত শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করে। অর্থাৎ শেয়ারের মালিকেরা লভ্যাংশ পায়। কিন্তু কোন বৎসর কোম্পানীর মুনাফা না হইলে অথবা কম হইলে ঐ কোম্পানী আর প্রয়োজনীয় লভ্যাংশ বণ্টন করিতে পারে না। সে জন্য যাহাদের লভ্যাংশ প্রদান করা হয় না অথবা কম করিয়া প্রদান করা হয় তাহাদের দাবীও পরবর্তী বৎসর পরিশোধ করিতে হইতেও পারে আবার না হইতেও পারে। যে সকল শেয়ারের মালিককে ঐ অপরিশোধ্য লভ্যাংশ পরবর্তী বৎসরে প্রদান করিতে হয় তাহাদিগকে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার, মালিক বলে আর ঐ প্রকার শেয়ারকে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার বলে।

(খ) **অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার** (Non-Cumulative Preference Shares) :—

লাভের পরিমান কম হইলে কোম্পানী প্রয়োজনীয় লভ্যাংশ বণ্টণ করিতে পারে না। তখন প্রয়োজনীয় বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ অপেক্ষা কম বণ্টন করিলে বাকী অংশটুকু শেয়ার ক্রেতারা পরবর্তী বৎসরে দাবী করিতেও পারে আবার নাও পারে। যদি ঐ অপ্রদত্ত লভাংশের পরিমান ঐ শেযার মালিকের আর পরবর্তী বৎসরে দাবী না করে তবে ঐ শ্রেণীর শেয়ারের মালিককে অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার যুক্ত শেযার মালিক বলে এবং ঐ শ্রেণীর শেয়ারকে অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার বলে। এ ক্ষেত্রে ঐ অবণ্টিত লভ্যাংশ আর পরবর্তী বৎসরের জন্য সঞ্চিত হয় না।

(গ) **পরিশোধ্য অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার** (Redeemable Preference Shares) :—

যে শ্রেণীর শেয়ারের মূল্য কোম্পানী চলাকালীন উহার মালিককে ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে তাহাকে পরিশোধ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বলে।

কোম্পানীর অভ্যন্তরীন নিয়মানুযায়ী কোম্পানী এই শ্রেণীর শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে। যখন এই শ্রেণীর শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় হইয়া যায় তখনই এই প্রকার শেয়ারের মূল্য ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে। আংশিক মূল্য প্রদত্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয় না অর্থাৎ ফেরৎ দেওয়া যায় না। এই রূপ শেয়ার সমমূল্যে, অধিমূল্যে প্রভৃতিতে পরিশোধ করা যাইতে পারে।

(ঘ) **অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার** (Irredemable Preference Shares) :—

এই প্রকার শেযারের মূল্য ফেরৎ দিতে হয না। অর্থাৎ শেয়ার বিক্রয় করিবার সময় কোম্পানী যদি উহার মূল্য ফেরৎ দেওযার কথা না বলিযা থাকে তবে ঐ শেয়ারের মূল্য আর ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না এবং ঐ শ্রেণীর শেয়ারকে অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার বলে।

(ঙ) **নির্দ্দিষ্ট হারে অংশভোগী অগ্রাধিকার শেয়ার** (Participating Preference Shares) :—

নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইবার চুক্তি ছাড়াও এই শ্রেণীর শেয়ারের মালিকেরা অধিক লভ্যাংশ পাইযা থাকে। যখন কোন কোম্পানী কোন কারণবশতঃ উঠিয়া যায় তখন উহার দেনা-পাওনা পরিশোধ করিতে হয়। এই প্রকার দেনা-পাওনা পরিশোধ করিবার পরে যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকে তবে ঐ শ্রেণীর শেয়ারের মালিকেরা উহার ভাগীদার হইয়া পড়ে। এই মুনাফা বা লভ্যাংশ কিন্তু তাহারা তাহাদের পূর্ব চুক্তি অপেক্ষাই বেশী পাইয়া থাকে। এই প্রকার সুবিধা ভোগ করার জন্য তাহাদিগকে নির্দিষ্ট হারে অংশভোগী অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রেতা বলা হয়। আর ঐ শ্রেণীর শেয়ারকে অংশভোগী অগ্রাধিকার শেয়ার বলা হয়।

(চ) **অনির্দ্দিষ্ট হারে অংশভোগী অগ্রাধিকার শেয়ার** (Non Participating Preference Shares) :—

এই শ্রেণীর শেয়ারের মালিকেরা তাহাদের পূর্ব চুক্তি অপেক্ষা কোন বেশী লভ্যাংশ পায় না। অর্থাৎ পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী যে শ্রেণীর শেয়ারের উপর লভ্যাংশ পাওয়া যায় তাহাকে অনির্দিষ্ট হারে অংশভোগী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। কোন কারণে কোম্পানী উঠিয়া গেলে এবং ঐ সময় কোন উদ্বৃত্ত থাকিলে এই শ্রেণীর শেয়ারের মালিকেরা ঐ উদ্বৃত্তর অংশীদার হইতে পারে না।

১। **সাধারণ শেয়ার** (Equity Shares) :—

যে সকল শেয়ারের মালিকেরা লভ্যাংশ অথবা মূলধন ফেরৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে না তাহাদিগকে সাধারণ শেয়ার বলে। বিশেষ সুবিধাভোগী শেয়ারের উপর লভ্যাংশ দেওয়ার পরে যদি কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে তবেই তাহা হইতে এই শ্রেণীর শেয়ারের মালিকগণকে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়া থাকে। আর যদি লভ্যাংশের কোন অংশ অবশিষ্ট না থাকে তবে আর এই শ্রেণীর শেয়ারের উপর কোন লভ্যাংশ প্রদানের প্রশ্নই উঠে না।

২। **বিলম্বিত দাবীযুক্ত অথবা উদ্যোক্তাগণের শেয়ার** (Deferred or Founders' or Management Shares) :—

প্রেফারেন্স ও সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা এই শ্রেণীর শেয়ারের উপর প্রদান করা হয়। সার্বজনিক কোম্পানী এই প্রকার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে। কোম্পানীর উদ্যোক্তারাই এই শ্রেণীর শেয়ার ক্রয় করিয়া থাকে। আপাত দৃষ্টিতে এই শ্রেণীর উপর লভ্যাংশ কম হয় মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই শ্রেণীর মালিকেরা সর্বাপেক্ষা অধিক লভ্যাংশ অর্জন করিয়া থাকে। কারণ প্রেফারেন্স ও সাধারণ শেয়ারে-মালিককে তাহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া দিয়া বাকী সমস্ত অংশই ইহারা উপভোগ করে।

৩। **বোনাস শেয়ার** (Bonus Shares) :—

কোম্পানীর সঞ্চিতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ও মূলধন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখাদিলে কোম্পানী শেয়ার গৃহীতাদের মধ্যে যে নতুন শেয়ার বিলি করিয়া তাহাদের দাবী মিটাইয়া দেয় তাহাদিগকে বোনাস বা অধিবৃত্তিমূলক শেয়ার বলে।

কোন কোম্পানী তাহার সমস্ত মুনাফা-লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করিতে চাহে না। কিছুটা সঞ্চয় করে। ঐ সঞ্চয় হইতেই এই শেয়ার বিলির ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকার শেয়ার বিলি করিতে হইলে উহা ঐ কোম্পানীর অভ্যন্তরীন নিয়মাবলীতে উহার উল্লেখ থাকিতে হইবে। এই শ্রেণীর শেয়ার আংশিক অথবা পূর্ণ আদায়ীকৃত শেয়ার হিসাবে বিলি হইতে পারে। ইহা কোন কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধির একটি সহজ উপায় এবং সাধারণত চালু কোম্পানীই ইহা করিয়া থাকে।

৪। **অধিকার যোগ্য শেয়ার** (Right Shares) :—

যখন কোন কোম্পানীর আরও অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় তখন ঐ কোম্পানী নতুন শেয়ার বিলি করিতে পারে। এই নতুন শেয়ার বর্তমান শেয়ার

ক্রেতাদের মধ্যে সমানুপাতিক হারে বণ্টন করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান শেয়ার ক্রেতারা ঐ নতুন শেয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রহণ না করিলে উহা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়। এই অবস্থায় বর্তমান শেয়ার ক্রেতাদের হাতে কোম্পানীর পরিচালনা রাখিবার জন্য শেয়ার হোল্ডারদের এই অধিকার প্রদান করা হয়।

ঋণপত্র ও ইহার শ্রেণীবিভাগ (Debenture and its classification) :—

ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতি দাখিলাই ঋণপত্র। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে হয়, যখন কোন কোম্পানী অন্য কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে তখন ঐ ঋণদাতাকে কোম্পানী একটি রসিদ দেয়। এই রসিদে কোম্পানীর সিলমোহর অঙ্কিত থাকে আর ঐ সিলমোহরাঙ্কিত **দলিলই ঋণপত্র**। মূলধন গ্রহণের ইহা অন্যতম উপায়। ঋণদাতা তাহার প্রদত্ত অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। এই ঋণের হার সাধারণত কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশের হার অপেক্ষা কম হয়। শেয়ার ক্রেতাগণের অপেক্ষা ঋণপত্র ক্রেতাগণের ঝুঁকি অনেক কম। কারণ ঋণপত্রের মালিকেরা নির্দিষ্ট হারে কোম্পানী হইতে সুদ পাইয়া থাকে। কোম্পানীর লাভ-লোকসানের সহিত এই ঋণের সুদের কোন সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে শেয়ার গ্রহীতারা কোম্পানীর লাভ হইলে তবেই লভ্যাংশ পাইবে অন্যথায় নয়।

এই ঋণপত্রকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১। **সাধারণ ঋণপত্র** (Simple Debenture) :—

ঋণগ্রহণের সময় যদি কোন সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা হয় তবে তাহাকে সাধারণ ঋণপত্র বলে। এই প্রকার ঋণ বা উহার সুদ পরিশোধ করিবার জন্য কোন সম্পত্তি জামিন রাখা হয় না।

২। **বন্ধকী ঋণপত্র** (Mortgage) :—

ইহা সাধারণ ঋণপত্রের ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ এই প্রকার ঋণপত্রের ক্ষেত্রে সম্পত্তি জামিন বা বন্ধক রাখিতে হয়। অন্যথায় কোন ঋণ পাওয়া যায় না। ইহাতে কোম্পানীর সমস্ত অথবা আংশিক সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে হইতে পারে। এই সম্পত্তির পরিমান ঋণের পরিমানের উপর নির্ভর করে।

৩। **বাহক প্রদেয় ঋণপত্র** (Bearer Debenture) :—

কোন ঋণপত্র হস্তান্তর করিবার সময় দলিলের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু সর্বত্র এই নিয়ম কার্যকরী নাও হইতে পারে। অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে ঋণপত্র

হস্তান্তর করিবার সময় কোন দলিলের প্রয়োজন হয় না, সেই সকল ঋণপত্রকে বাহকদেয় বা বাহকপ্রদেয় ঋণপত্র বলে। এই প্রকার দলিলের ধারক বা বাহক ঐ ঋণপত্রে উল্লেখিত অর্থের ও উহার সুদের অধিকারী হইয়া থাকে।

৪। রেজিষ্ট্রীকৃত ঋণপত্র (Registered Debenture) :—

যে সকল ঋণপত্রে কোম্পানী উহার ক্রমিক সংখ্যা, হোল্ডারের নাম প্রভৃতি লিখিয়া দেয় এবং হোল্ডারের তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখে তাহাকে রেজিষ্ট্রীকৃত ঋণপত্র বলে। এই প্রকার ঋণপত্র অন্য কাহাকেও দিতে হইলে উহার জন্য হস্তান্তর-করণ দলিলের দরকার হয় এবং ঐ নতুন ধারকের নাম আবার কোম্পানীর খাতায় লিখিয়া রাখিতে হয়।

৫। অরেজিষ্ট্রীকৃত ঋণপত্র (Un-Registered Debenture) :—

এই প্রকার ঋণপত্র ঠিক রেজিষ্ট্রীকৃত ঋণপত্রের বিপরীত। রেজিষ্ট্রীকৃত ঋণপত্রে যেমন ক্রমিক সংখ্যা, হোল্ডারের নাম প্রভৃতি লিখিয়া রাখিতে হয় এই প্রকার ঋণপত্রে আর উহা লিখিয়া রাখিতে হয় না। সুতরাং যে ঋণপত্রে কোন ক্রমিক সংখ্যা, হোল্ডারের নাম প্রভৃতি লিখিতে হয় না অথবা লিখিয়া রাখিতে হয় না তাহাকে অরেজিষ্ট্রীকৃত ঋণপত্র বলে।

৬। পরিবর্তনীয় ঋণপত্র (Floating Debenture) :—

কোম্পানীর পরিবর্তনীয় সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া যে ঋণপত্র প্রদান করা হয় তাহাকে পরিবর্তনীয় ঋণপত্র বলে। পরিবর্তনীয় সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কোম্পানী ঋণ গ্রহণ করে বলিয়া ঐ প্রকার ঋণপত্রের নাম পরিবর্তনীয় ঋণপত্র করা হইয়াছে।

৭। ফেরৎ যোগ্য ঋণপত্র (Redeemable Debenture):—

যে ঋণপত্রের টাকা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তে পরিশোধ্য তাহাকে ফেরৎ যোগ্য ঋণপত্র বলে। আর যদি ঐ নির্দিষ্ট সময় অন্তে ঐ ঋণপত্রের টাকা পরিশোধ্য না হয় তবে তাহাকে অপরিশোধ্য বা স্থায়ী ঋণপত্র বলে।

ষ্টক (Stock) :—কোন কোম্পানীর মোট মূলধন আদায় হইলে তাহাকে ষ্টক বলে। আর্টিকেলে উল্লেখ থাকিলে ষ্টকের অর্থকে বা পুঁজিকে শেয়ার পুঁজিতে রূপান্তর করা যায়।

ষ্টক ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য (**Distinction between Stock and Shares**) :—

ষ্টক	শেয়ার
১। ইহার মূল্য সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত হয়।	১। শেয়ারের মূল্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আদায়ীকৃত হইতে পারে।
২। ইহাতে ক্রমিকসংখ্যা থাকে।	২। ইহাতে ক্রমিক সংখ্যা থাকে না।
৩। ইহা ভগ্নাংশে পরিণত করিয়া বিক্রয় করা চলে।	৩। ইহা অবিভাজ্য। ভগ্নাংশে পরিণত করিয়া কোন শেয়ার বিক্রয় করা যায় না।
৪। ষ্টকের মূল্য নির্দিষ্ট থাকে না।	৪। শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট থাকে।
৫। ইহা টাকার অংকে প্রকাশ করা হয়।	৫। ইহা শেয়ার কোম্পানীর মূলধনের সমান অংশে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করা হয়।

কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার ও ডিবেঞ্চার হোল্ডারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Share-holders and Debenture Holders) :—

শেয়ার হোল্ডার	ডিবেঞ্চার হোল্ডার
১। ইহারা কোম্পানীর মালিক।	১। ইহারা কোম্পানীর ঋণদাতা।
২। বৎসর শেষে ইহারা লভ্যাংশ পায়।	২। বৎসর শেষে ইহারা সুদ পায়।
৩। ইহারা যে অর্থ প্রদান করে তাহাই কোম্পানীর মূলধন বা পুঁজি।	৩। ইহাদের প্রদত্ত অর্থ কোম্পানীর ঋণ।
৪। ইহারা সভায় উপস্থিত হইতে পারে ও ভোট দিতে পারে।	৪। ইহারা সভায় উপস্থিত হইতে পারে না অথবা ভোট দিতে পারে না।

শেয়ার হোল্ডার	ডিবেঞ্চার হোল্ডার
৫। কোম্পানী উঠিয়া যাওয়ার সময় সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া যদি টাকা থাকে তবে ইহারা পাইয়া থাকে।	৫। শেয়ার হোল্ডারগণকে টাকা দেওয়ার আগেই ইহাদের দেনা পরিশোধ করিতে হয়।
৬। পরিশোধ্য শেয়ার না হইলে কোম্পানী চলাকালীন শেয়ারের অর্থ ফেরৎ দেওয়া যায় না।	৬। পরিশোধ্য ঋণ না হইলেও কোম্পানী চলাকালীন উহা ফেরৎ দেওয়ার কোন বাধা নাই।

যৌথ মূলধনী কোম্পানীর মূলধনের উৎস ও সংগ্রহের সমস্যা (Sources of Finance of Joint Stock Company and problems of Corporate Finance) :—

কোন যৌথ মূলধনী কোম্পানীর মোট প্রয়োজনীয় মূলধনকে **দুই শ্রেণীতে** ভাগ করা যায়। যেমন **স্থায়ী মূলধন** এবং **চলতি মূলধন**। কোন কোম্পানী স্থাপন করিতে হইলে উহার জন্য জমি, বাড়ী, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতির দরকার হয়। এই সকল সম্পত্তি ক্রয় করিতে প্রচুর মূলধন দরকার হয়। সুতরাং ঐ সকল সম্পত্তি ক্রয় করিতে যে অর্থের বা মূলধনের দরকার হয় তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে। এই স্থায়ী মূলধন ছাড়াও দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্যও টাকার দরকার হয়। কারণ কোম্পানী চালাইতে হইলে প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার টাকার দরকার হয়। এই দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য যে টাকার দরকার হয় তাহাকে চলতি মূলধন বলে।

কোন একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানী তাহার স্থায়ী এবং চলতি মূলধন নিম্নলিখিত **উৎস** হইতে সংগ্রহ করিতে পারে।

১। **শেয়ার বিক্রয়** (Sale of Shares) : —

নতুন কোন কোম্পানী তাহার মূলধন শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু কোন প্রাইভেট কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে না। কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় করিয়া স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। এই শেয়ারের মূল্য কম থাকায় ধনী, দরিদ্র সকলেই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে পারে। এই শেয়ার বিক্রয় করিয়া কোম্পানী প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে এবং ঐ অর্থ

দিয়া প্রয়োজনীয় স্থায়ী ও চল্‌তি মূলধনের প্রয়োজন মেটাইতে পারে। যাহারা ঐ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে তাহারা ঐ কোম্পানীর মালিক। অন্যান্য ব্যবসায়ে যেমন মালিক সমস্ত অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকেন তেমনি কোম্পানীর ক্ষেত্রে শেয়ার ক্রেতাগণ মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন।

২। **ঋণপত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ** (Debenture Capital) :—

ঋণগ্রহণের স্বীকৃতি দাখিলাই ঋণপত্র। যখন কোন কোম্পানী অন্য কাহারও নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করে তখন ঐ ঋণদাতাকে কোম্পানী একটি রসিদ দেয়। এই রসিদ কোম্পানীর সিলমোহর অঙ্কিত হয়। আর ঐ সিলমোহর অঙ্কিত দলিলই ঋণপত্র। এই ঋণপত্র হইতেও কোম্পানী ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে। শেয়ারের পরেই এই ঋণপত্রের স্থান। এই ঋণপত্রের উপর অবশ্য নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। এই ঋণপত্রের সহিত কোম্পানীর লাভ লোকসানের কোন সম্পর্ক নাই। শুধু সুদপ্রদান করিলেই যথেষ্ট। পুরাতন কোম্পানীসকল এই ঋণপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

৩। **আমানত গ্রহণ** (Acceptance of Deposit) :—

বড় বড় কোম্পানী তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ এই আমানত গ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করে। এই আমানত তাহারা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রভৃতির নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। বোম্বাই এবং আমেদাবাদের কার্পাস শিল্পগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় মূলধনের অনেকটা এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়া থাকে।

৪। **ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ** (Advance From Bank :—

যৌথ মূলধনী কোম্পানী তাহাদের প্রয়োজনীয় স্বল্পকালীন অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। ব্যাঙ্ক এরূপ ঋণ প্রদান করিলে তাহার উপর সুদ দাবি করে এবং প্রদত্ত মূলধনের গ্যারান্টি হিসাবে ঐ কোম্পানীর নিকট শেয়ার, ঋনপত্র, বা কাঁচা মাল দাবী করিতে পারে। অর্থাৎ জমা রাখিতে বলিতে পারে। এরূপ ঋণপ্রদান ব্যাঙ্কের একটি অন্যতম কার্য। দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা যত উন্নত হইবে উহা তত অধিক পরিমানে কোম্পানীকে ঋণপ্রদান করিতে পারিবে এবং ইহাতে দেশের শিল্প প্রচেষ্টা ততই উন্নতি লাভ করিবে।

৫। **মূলধনী প্রতিষ্ঠান** (Financial Institutions) :—

ব্যাঙ্ক ছাড়াও বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য লগ্নীকারক সমিতি যৌথ মূলধনী কারবারকে যথেষ্ট পরিমান ঋণ দেয়। যে কোন কোম্পানী তাহার প্রয়োজনীয় স্বল্প ও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইনান্স করপোরেশান, ষ্টেট ফাইনান্স করপোরেশান, প্রভৃতি যৌথ মূলধনী কোম্পানী সমূহকে তাহাদের প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে। যে কোন পুরানো প্রতিষ্ঠানও ইহাদের নিকট হইতে স্বল্প এবং দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে আমাদের দেশে ঋণ সংগ্রহ অনেকটা সহজ ও সরল হইয়াছে এবং বাণিজ্য জগতে এক নতুন আলোর সঞ্চার হইয়াছে।

৬। **ম্যানেজিং এজেণ্ট** (Managing Agent) :—

ভারতের যৌথ কোম্পানীর ইতিহাসে ইহাদের নাম অতি পরিচিত। ইহারাই ভারতীয় শিল্পের গোড়া পত্তণ করে। সেই গোড়া পত্তণ হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত এই সংস্থা শিল্পকে বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। ইহারা নতুন এবং পুরাতন সকল প্রকার কোম্পানীর ক্ষেত্রেই মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকে। প্রাচীন কাল অপেক্ষা ইহাদের গুরুত্ব বর্তমানে অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ অনেকে মনে করেন যে, উহারা অতীতে যে রকম কাজ করিত বর্তমানে তাহা আর করিতে পারে না। এবং উহাদের কাজের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। সেজন্য বিভিন্ন সময়ে কোম্পানী আইনে উহাদের উপরও বিভিন্ন প্রকারের বাধা নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।

৭। **সঞ্চিত তহবিল** (Reserve Fund) :—

কোন কোম্পানী তাহার সমস্ত মুনাফা বণ্টন করিয়া দেয় না। উহা হইতে কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য পৃথক করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে। ভবিষ্যতে যখন অর্থের প্রয়োজন হয় তখন ঐ সঞ্চিত তহবিল হইতে লইয়া প্রয়োজন মেটায়। ইহাতে কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং এই সঞ্চিত তহবিল হইতেও কোম্পানী তাহার প্রয়োজনীয় মূলধনের কিছু অংশ সহজেই পাইতে পারে। অন্যকথায় ইহাকেই আবার মুনাফা বিনিয়োগও বলা হয় (Plaughing back of Past Profits)।

সুতরাং কোন যৌথ মূলধনী কোম্পানী তাহার প্রয়োজনীয় অর্থ উপরোক্ত উৎস সমূহ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে।

কিন্তু এই মূলধন সংগ্রহে বিভিন্ন প্রকারের সমস্যা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্যাগুলিকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

কোন যৌথ কোম্পানী স্থাপন ও উহার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার মূলধনের প্রয়োজন হয়। যেমন, স্থায়ী মূলধন, চল্‌তি মূলধন, দীর্ঘমেয়াদী, স্বল্পমেয়াদী প্রভৃতি। এই সকল মূলধন সংগৃহীত হইলেই তবে কোম্পানী চলিতে পারে। আর সংগৃহীত না হইলে উহা ভাল ভাবে চলিতে পারে না। সেজন্য ঐ সকল বিভিন্ন প্রকার মূলধন সংগ্রহকেই যৌথ মূলধনী কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ বলে।

অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে কোন বড ব্যবসা ছিল না বলিলেই হয়। তখন যে সকল ব্যবসা ছিল তাহা আয়তনে অতি ছোট। এবং এই সকল ছোট ছোট কারবার মালিকই পরিচালনা করিত। তখন শ্রমবিভাগ, বিশেষীকরণ প্রভৃতির কোন প্রয়োজন ছিল না এবং দেখা যাইত না। মালিক প্রয়োজন বোধে একজন কর্মচারীর সাহায্যেই সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনা করিত। তখনকার মালিকের ঐ ব্যবসাকে একমালিকী কারবার বলা হইত। তখন একমালিকী কারবারের টাকার দরকারও ছিল সীমিত এবং উহা মালিকই প্রদান করিত। সুতরাং মূলধনের কোন সমস্যা ছিল না।' কিন্তু পরবর্তী কালে মানুষের আশাবাদী মন আর সামান্য ক্ষুদ্র একটু কারবার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। তখন তাহারা প্রতিষ্ঠা করিল অংশীদারী কারবার। এই অংশীদারী কারবার একমালিকী কারবার অপেক্ষা অনেক বড ও উন্নত রূপ। ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। সেজন্য এই অপেক্ষা কৃত বড় ব্যবসায়ের জন্যও একটু বেশী মূলধন প্রয়োজন হইল। তখন ঐ মূলধন ইহার অংশীদারগনই প্রদান করিত আর যদি কিছু বেশী দরকার হইত তবে তাহা বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন অথবা পরিচিত লোকের নিকট হইতে ধার হিসাবে পাওয়া যাইত। এই ক্ষেত্রেও মূলধনের সমস্যা বিশেষভাবে দেখা যায় নাই। কিন্তু মানুষ যখনই আর একটু অগ্রসর হইয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিল তখনই দেখা দিল এই মূলধনের সমস্যা। কারণ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা একটি ব্যয় বহুল ব্যাপার। কারণ ইহার শুরু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যান্ত প্রচুর অর্থের দরকার হয়। এই অর্থ বা মূলধন কোথা হইতে আসিবে। কোম্পানীর এই মূলধন দুই প্রকারের হইতে পারে। যেমন সম্পত্তি, গৃহ, যন্ত্রপাতির জন্য টাকার দরকার হইতে পারে আবার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্যও অর্থের দরকার হয়। সেজন্য প্রথম শ্রেণীর অর্থকে স্থায়ী মূলধন বলে এবং শেষোক্ত শ্রেণীর মূলধনকে চল্‌তি মূলধন বলে। এই মূলধন কোম্পানীকে অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হইবে অন্যথায় কোম্পানী পরিচালনা সম্ভব হইবে না। শুধু

মাত্র ঐ মূলধন সংগ্রহ একমাত্র কথা নহে। উহার প্রকৃত পরিমান নির্ধারণ এবং তাহার সুষ্ঠ ব্যবহারও অন্যতম সমস্যা। সেজন্য কোন কারবারে কি পরিমান মূলধন দরকার হইবে তাহা দুইটি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। যেমন (ক) প্রকৃত ব্যয়ের পরিমান দ্বারা উহার স্থিরীকরণ এবং (খ) তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি দ্বারা উহার পরিমান স্থিরীকরণ।

কারবার প্রতিষ্ঠা, উহার জন্য সম্পত্তি ক্রয়, বাড়ী ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া মূলধনের পরিমান নির্ধারণকে প্রকৃত ব্যয় পদ্ধিতিতে মূলধন নির্ধারণ বলে। আর একই প্রকার বিভিন্ন কারবারের সহিত তুলনা করিয়া কোন প্রতিষ্ঠানের মূলধন নির্ধারণ নীতিকে তুলনামূলক ব্যয়নীতি বলে। আবার কখনও কখনও কোন কারবারে উক্ত দুইটির সংমিশ্রনের গড়ের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মূলধন নির্ধারণ কবিয়া থাকে। কিন্তু এই কথা সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, যে নীতিই গৃহীত হোক না কেন উহা যেন কারবারের উপযোগী হয়। অন্যথায় নীতটাই বিফল হইয়া যাইবে। সেজন্য কোন কারবারকে স্থায়ী হইতে হইলে উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলি অতি নিপুনভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যথায় স্থায়ী উন্নতি লাভ সম্ভব হইবে না। কোম্পানীর পরিচালকগণকেও ঐ সকল সমস্যা সম্পর্কে অতি সচেতন থাকতে হইবে এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকিবে। যদি ঐ সকল সমস্যা সমাধান তাহাবা করিতে না পারে তবে কারবারটি অতি মূলধন (Over-Capitalisation) অথবা অল্পমূলধন (Under Capitalisation) দোষে দুষ্ট হইবে। এবং ইহা কোম্পানীর পক্ষে ক্ষতি কারক। কারণ কোন কারবারে যদি অধিক মূলধন হয় তবে উহা হইতে বিনিয়োগের হার কম হইবে। ইহাতে শেয়ার বাজারে ঐ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করা একটা সমস্যায় পরিণত হইবে। কারণ কেহ ঐ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে চাহিবে না। ইহার সমাধানের জন্য পরিচালকগণ অলাভজনক কারবার প্রসারিত করিতে পারেন। ইহাতে অতি মূলধন দোষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

অন্যদিকে অল্প মূলধন হইলে কারবারটি সুস্থনীতিতে চলিতে পারিবে না। কারণ উহার প্রয়োজনীয় মূলধন নাই। ঐ কারবারটি বড় করিবার সুবিধা থাকিলেও উহা করা যাইবে না কারণ উপযুক্ত অর্থের অভাবই ঐ কারবার সম্প্রসারণের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে।

সুতরাং উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, কোন কারবার পরিচালনার সময় অতি অথবা অল্প মূলধন কোনটাই কাম্য নহে। কারণ উহাতে কারবার ভাল ভাবে

চলিতে পারে না। সেজন্য যেটুকু মূলধন হইলে একটি কারবার সুস্থ ভাবেই চলিতে পারে সেই পরিমান মূলধনই প্রত্যেক কারবারের থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহাকে স্বাভাবিক মূলধন (Normal Capitalisation) বলে।

যৌথ কোম্পানীর মূলধন নির্ণয়ের বিষয় সমূহ (Factors that determine the Capital requirements of a Joint Stock Company):—

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে কোন একটি কোম্পানীর মূলধন দুই শ্রেণীর হইতে পারে। যেমন, স্থায়ী ও চলতি। স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য যে মূলধন দরকার হয় তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে আর কোম্পানী চালু রাখিতে যে মূলধনের দরকার হয় তাহাকে চলতি মূলধন বলে। স্থায়ী মূলধন কারবারে আবদ্ধ থাকে। এই মূলধন আবদ্ধ থাকে বলিয়া উহাকে আবার আবদ্ধ মূলধন বলে।

কোন কারবারের স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

স্থায় মূলধন নির্ণায়ক বিষয়সমূহ :—

১। **ব্যবসায়ের প্রকৃতি** (Nature of the Business) ঃ

ইহার উপর নির্ভর করিয়া স্থায়ী মূলধন স্থীর করিতে হয়। কারবার যদি বড় হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয়, যেমন গ্যাস কোম্পানী, রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি, তাহা হইলে প্রচুর স্থায়ী মূলধন দরকার হয়। অপরদিকে কারবার ছোট হইলে তাহার স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ কম হইবে। ইহা ছাড়া সংযোজন (Assembly) শিল্পের জন্য কম মূলধন দরকার হয় এবং বিযোজন (Analytical) শিল্পের জন্য প্রচুর মূলধন দরকার হয়। সুতরাং কোন কারবারের স্থায়ী মূলধন কত প্রযোজন হইবে তাহা অনেকাংশে ইহার প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াও নির্ধারণ করিতে হয় অথবা নির্ধারণ করিতে পারা যায়।

২। **উৎপাদন ব্যবস্থা** (Production Method ঃ –

সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যবস্থা একপ্রকার নহে। কোথাও অতি সহজ, সরল আবার কোথাও অতি জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই উৎপাদনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়াও কোন কোম্পানীর স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ স্থির করা যায়। উৎপাদন ব্যবস্থা সহজ ও সরল হইলে যেখানে উন্নত যন্ত্রপাতির কোন প্রয়োজন হয় না।

সেজন্য ঐ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অল্প স্থায়ী মূলধন হইলেই চলিয়া যায়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা রহিয়াছে সেখানে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির দরকার হয়। সেজন্য ঐ সকল জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পন্ন কারবারের ক্ষেত্রে অধিক স্থায়ী মূলধন প্রয়োজন হয়।

৩। **বাণিজ্যিক ব্যবসা** (Commercial Undertaking) :—

এই প্রকার প্রতিষ্ঠানে অল্প পরিমাণ স্থায়ী মূলধন হইলেই চলিয়া যায়। কারণ এই সকল ক্ষেত্রে বৃহৎ ও মূল্যবান যন্ত্রপাতির কোন প্রয়োজন হয় না।

ইহা ছাড়াও কারবারের আয়তনের উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময় কারবারের স্থায়ী মূলধন নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

চল্‌তি মূলধন নির্ণায়ক বিষয় সমূহ :—

১। **উৎপাদনের সময়** (Time Consumption in Production):—

যে পণ্য উৎপাদনে অনেক সময় লাগে তাহাতে অনেক বেশী চল্‌তি মূলধন দরকার হয়। কারণ পণ্য উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে প্রচুর সময় প্রয়োজন হয়। যেজন্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যে অনেক সময় লাগিয়া যায়। ঐ সময় বিভিন্ন প্রকারের খরচ হইতে পারে। ঐ সকল খরচ পরিশোধ করিতে প্রচুর মূলধন দরকার হয়। অন্যদিকে যে সকল কারবারে দ্রুত পণ্য উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয় করা যায় এবং উহা হইতে দ্রুত অর্থ পাওয়া যায় সে সকল স্থানে চল্‌তি মূলধনের দরকার অপেক্ষাকৃত কম হয়। সুতরাং চল্‌তি মূলধনের পরিমাণ অনেকাংশে উৎপাদনের সময়ের উপর নির্ভর করে।

২। **বিক্রয়ের দ্রুততা** (Rapidity of Sales) :—

যে সকল পণ্য বিক্রয় খুব দ্রুত সম্ভব হয় সে সমস্ত পণ্যর ক্ষেত্রে চল্‌তি মূলধনের পরিমাণ কম প্রয়োজন হয়। কারণ একদিকে পণ্য উৎপাদন এবং অন্যদিকে উহা বিক্রয় করিয়া অর্থ আসিলে আর বিশেষ কোন অসুবিধা থাকে না। সেজন্য চল্‌তি মূলধনের পরিমাণ অনেকাংশে বিক্রয়ের দ্রুততার উপর নির্ভর করে।

৩। **বিক্রয়ের সর্ত** (Terms of Sales) :—

পণ্য নগদ ও ধার এই দুই প্রকারে বিক্রয় হইতে পারে। যখন পণ্য নগদ মূল্যে বিক্রয় হয় তখন আর চল্‌তি মূলধনের দরকার হয় না। কারণ ঐ বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতেই উহার দৈনন্দিন খরচ চলিয়া যায়। পক্ষান্তরে পণ্য যদি ধারে বিক্রয় হয়

তবে উহার টাকা পাইতে অনেক সময় লাগে। কারণ ক্রেতাগণ টাকা প্রদান করিলেই তবে উহা পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে চল্‌তি মূলধনের পরিমাণ অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। সুতরাং চলতি মূলধন কত হইবে তাহা বিক্রয়ের সর্তের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

৪। **কাঁচামালের দামের তারতম্য** (Variation of Price of Raw-Material) :—

যে সকল পণ্যের কাঁচামালের দাম হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহার ক্ষেত্রে চল্‌তি মূলধনের পরিমাণও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। দাম হ্রাসের সাথে সাথে মূলধনের পরিমাণ হ্রাস পায়। সুতরাং চল্‌তি মূলধন কত হইবে তাহা ঐ কোম্পানীর প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দামের তারতম্যের উপরও বহুলাংশে নির্ভর করে।

৫। **চলতি সম্পত্তি নগদে রূপান্তর** (Conversion of Current Assets into Cash) :—

চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে ইহার উপরও নির্ভর করে। কারণ ঐরূপ রূপান্তর করণের সুবিধা থাকলে প্রয়োজনে কোম্পানী যে কোন সময়ে উহার চল্‌তি সম্পত্তি চল্‌তি মূলধনে পরিণত করিতে পারে। ইহাতে চল্‌তি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

স্বীয় মুনাফার পুনর্নিয়োগ, ইহার সুবিধা ও অসুবিধা (Meaning, Advantages and Dis-advantages of Ploughing back of Profit) :—

নতুন কোম্পানী ছাড়া প্রায় সকল পুরাতন কোম্পানী তাহার মুনাফার সবটুকু লভ্যাংশ হিসাবে বন্টন না করিয়া কিছু অংশ সঞ্চয় করিয়া রাখে। প্রয়োজনে ঐরূপ সঞ্চিত অর্থ বা মুনাফা ঐ কোম্পানী তাহার মূলধন হিসাবে কাজে লাগাইতে পারে। সেইজন্য যদি কোন কোম্পানী প্রয়োজনে তাহার সঞ্চিত মুনাফা কারবারের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে তবে তাহাকে **স্বীয় মুনাফার পুনর্নিয়োগ** বলে। এই প্রকার পদ্ধতির **সুবিধাগুলি** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

১। এই পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল। কারণ কোম্পানীর নিজের খাতায় ঐ সঞ্চিত তহবিল হইতে টাকা লওয়া হইল এ সম্পর্কে একটা দাখিলা করিলেই হইয়া যায়। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে টাকা লইতে হইলে তাহার জন্য সুদ দিতে হয়।

এবং সর্বোপরি ঐ অর্থ আদৌ পাওয়া যাইবে কিনা তাহা সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কোন সুদ দিতে হয় না এবং কোন অনিশ্চয়তা থাকে না।

২। এই পদ্ধতির দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্টের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা না থাকিলে কোম্পানীকে ম্যানেজিং এজেন্টের উপর এই টাকার জন্য নির্ভর করিতে হয়। এবং তাহাদের নিয়ম মাফিক কোম্পানীকে কাজ করিতে হয়। অন্যথায় তাহাদের সাহায্য পাওয়া যায় না।

৩। এই প্রকার ঋণে কোন ব্যক্তিবের দায় থাকে না। কারণ এই ঋণ কোম্পানীর সঞ্চিত তহবিল। অতীতের মুনাফা হইতে কোম্পানী ইহা সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং এই প্রকার ঋণ দিনের পর দিন কোম্পানীর উন্নতিতে সাহায্য করে। ফলে কোম্পানী অধিক লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারে। ইহার ফলে বাজারে ঐ কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এই সময় প্রয়োজন বোধ করিলে শেয়ার ক্রেতাগণ বাজারে তাহাদের ক্রুত শেয়ার বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারে।

৪। ক্রেতাগণ এই পদ্ধতিতে কম মূল্যে দ্রব্য পাইতে পারে। ঐ সঞ্চিত মুনাফা কোম্পানী নিজে ব্যবহার করিলে তাহার জন্য কোন সুদ দিতে হয় না। ফলে একটা বড় রকমের খরচ বাঁচিয়া যায়। এবং ঐ খরচ বাঁচিয়া যাওয়ার ফলে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ও কমিয়া কমিয়া যায়। অপরদিকে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পায়, এবং জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়।

৫। দরিদ্র দেশে এই প্রকার সঞ্চিত মুনাফা অনেক কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহা ছাড়া বৃটেন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এই মুনাফার ভিত্তিতে অনেক কোম্পানী সহজেই উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। দরিদ্র দেশ, বিশেষ করিয়া ভারতের মত দেশের পক্ষে এই প্রকার সঞ্চিত মূলধন পদ্ধতি একান্ত প্রয়োজন।

৬। এই প্রকার সঞ্চিত মুনাফা ব্যবহার করিলে মন্দার সময়ও কোম্পানীর কোন অসুবিধা হয় না। উপরন্তু ঐ সময়ে ঐ টাকা দিয়া প্রচুর কাঁচা মাল ক্রয় করিতে পারে এবং কম মূল্যে শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারে। ইহাতে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়।

কিন্তু এই প্রকার সঞ্চিত মুনাফার বিভিন্নপ্রকার সুবিধা সত্ত্বেও উহা দোষমুক্ত নহে। এই দোষ বা **অসুবিধাগুলি** নিম্নরূপ :—

১। একপ্রকার অর্থের প্রকৃত ব্যবহার নাও হইতে পারে। কারণ যাহারা

কোম্পানীর পরিচালনায় থাকে তাহারা ঐ অর্থ কোম্পানীর উন্নতিতে ব্যবহার না করিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করিতে পারে। ইহাতে কোম্পানীর কোন সুবিধা হয় না। পক্ষান্তরে ঐ স্বার্থপর পরিচালকগণ উপকৃত হয়। ইহা দ্বারা শিল্প সম্রাজ্যের সৃষ্টি হয় সত্য কিন্তু তাহা মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হস্তে সীমাবদ্ধ থাকে।

২। অধিক লাভের আশায় শেয়ার গ্রহীতারা শেয়ার ক্রয় করিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। কারণ তহবিলে আর সঞ্চিত মুনাফা এই পদ্ধতির ফলে থাকে না। এমত অবস্থায় হতাশ হওয়াই স্বাভাবিক।

৩। এই প্রকার পদ্ধতির দ্বারা অনেক শিল্পের পতন ঘটিয়াছে। কারণ স্বার্থপর পরিচালকগণ অনেক ক্ষেত্রে ঐ সঞ্চিত মুনাফা নিজেদের কাজে ব্যবহার করিয়া কোম্পানীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

৪। এই প্রকারে ক্রমাগত লাভের টাকা অবণ্টিত রাখিয়া এবং কারবারে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ দ্বারা পরিচালকগণ কোম্পানীর দুরাবস্থা ডাকিয়া আনিতে সাহায্য করে।

৫। এই পদ্ধতিতে শেয়ার ক্রেতাগণ তাহাদের প্রকৃত মুনাফা পায় না। কারণ প্রতি বৎসর প্রকৃত মুনাফা কোম্পানী লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করে না। উহা হইতে কিছু অংশ সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই রকম অবস্থায় যদি কোন শেয়ার ক্রেতা তাহার শেয়ার বাজারে বিক্রয় করে তবে ঐ কোম্পানীতে সঞ্চিত মূলধনের তাহার প্রাপ্য প্রকৃত লভ্যাংশ পায় না। সেজন্য অনেকে এই পদ্ধতি পছন্দ করেন না।

যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ও ইহার সুবিধা ও অসুবিধা (Marketing of shares of a joint Stock Company and its merits and De-merits) :—

যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে কোন একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানী ইহার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। **বিজ্ঞাপন দ্বারা** (Advertisement or Prospectus Method) :—

এই প্রকার পদ্ধতিতে কোম্পানী তাহার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে। এই পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ বিক্রয় বলে। এই প্রকার বিজ্ঞাপনের দ্বারা কোম্পানী তাহার শেয়ার ক্রয়ের জন্য জনগণের নিকট আবেদন জানায়। ইহার উত্তরে জনগণ ঐ কোম্পানীর নিকট হইতে শেয়ার ক্রয় করে। এই প্রকার পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয় করিলে তাহার কতকগুলি সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। এই

সুবিধা হইল এই যে, শেয়ার বিক্রয় ব্যয় এই পদ্ধতিতে খুব কম পড়ে। কারণ ইহাতে শেয়ার সরাসরি বিক্রয় হয়। কাহাকেও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কমিশন বা দস্তুরি দিতে হয় না। এবং এই ব্যবস্থার অসুবিধা হইতেছে এই যে, এই পদ্ধতিতে সমস্ত শেয়ার বিক্রয় নাও হইতে পারে। সুতরাং কত শেয়ার বিক্রয় হইবে তাহা এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

২। **দালাল নিয়োগ করিয়া** (Through Brokers) :—

দালাল নিয়োগ করিয়াও কোম্পানী ইহার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয়ের অনিশ্চয়তা অনেক কমিয়া যায়। এই পদ্ধতিতে দালালকে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য দস্তুরি দিতে হয়। কিন্তু এই দস্তুরির পরিমাণ অন্যান্য পদ্ধতির খরচ অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সমস্ত শেয়ার কতদিনে বিক্রয় হইবে তাহা সঠিক করিয়া বলা যায় না। যে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা অন্য প্রতিষ্ঠান এই দালালের কাজ করিতে পারে। এই দালালেরা শেয়ার বিক্রয়ের ব্যাপারে কোম্পানীকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে।

৩। **ম্যানেজিং এজেন্ট মারফৎ** (Through Managing Agents) :—

ম্যানেজিং এজেন্ট সাধারণতঃ কোম্পানীর প্রবর্তকের কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় পেশাদারী ম্যানেজিং এজেন্ট নিজেদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া থাকে। এবং প্রয়োজনে তাহারা নিজেরাও কিছু শেয়ার ক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা উভয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুবিধার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই উল্লেখযোগ্য :—

(ক) এই পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয়ের কোন ঝুঁকি লইতে হয় না। কারণ প্রবর্তকেরা নিজেরাই শেয়ার বিক্রয়ে উদ্যোগী হয়।

(খ) কোম্পানী পরিচালনার জন্য এই পদ্ধতিতে কোন অর্থের অভাব হয় না। কারণ ম্যানেজিং এজেন্টগণ ঐ শেয়ার বিক্রয় করিয়া উহা হইতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়া কোম্পানী পরিচালনা করে। যখন উহারা শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে না তখন নিজেরাই ঐ শেয়ার ক্রয় করিয়া লয়। সুতরাং অর্থের অভাব আর হয় না।

কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হইল :—

(ক) ঐ ম্যানেজিং এজেন্টগণ উচ্চ হারে কমিশন গ্রহণ করেন। সুতরাং এই পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয় একটি ব্যয় বহুল পদ্ধতি। অনেক কোম্পানী অতবেশী দস্তুরি দিতে নাও পারে। এবং

(খ) অনেক সময় উহারা কোম্পানীর শেয়ার লইয়া ফাট্‌কাবাজীও করিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহা অত্যন্ত খারাপ পদ্ধতি।

৪। **দায়গ্রহক মারফৎ** (Through Uuderwriters) :—

এই পদ্ধতির মারফৎ কোম্পানী ইহার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে কোম্পানী দায়গ্রাহকের সহিত শেয়ার বিক্রয়ের একটি চুক্তি সম্পাদনা করে এবং তাহাদের মারফৎ শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এই দায়গ্রাহকগণ শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয়ের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) এই পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয়ের কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইবেই। যদি কোন কারণে উহার সমস্ত শেয়ার বিক্রয় না হয় তবে ঐ দায়গ্রাহকগণ ঐ অবশিষ্ট শেয়ার ক্রয় করিয়া লয়। ফলে কোম্পানীর কার্য আরম্ভ করিতে কোনপ্রকার দেরী হয় না।

(খ) কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য ওঠা-নামার অনিশ্চয়তা অনেক ইহাতে কমিয়া যায়। সুতরাং কোম্পানী নিশ্চিন্তে কাজ করিয়া যাইতে পারে।

(গ) দায়গ্রাহকগণের সুনামের উপর কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় অনেকাংশে নির্ভর করে। যে সকল দায়গ্রাহকগণের সুনাম বাজারে অধিক তাহাদের শেয়ার জনগণ দ্রুত ক্রয় করিয়া লয়। সুতরাং উহা দ্বারা কোম্পানীর মর্যাদাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) এই দায়গ্রাহকগণ অনেক সময় অত্যন্ত অভিজ্ঞ হয়। এবং প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রয় প্রভৃতির জন্য ইহারা কোম্পানীকে পরামর্শ দিয়া থাকে। এই প্রকার পরামর্শ হইতে কোম্পানী প্রচুর লাভবান হয়।

এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম :—

(ক) এই পদ্ধতিতে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় সহজে বৃদ্ধি পায় না। কারণ ঐ দায়গ্রাহকগণ তাহাদের কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে কমিশন দাবী করিয়া থাকে।

(খ) কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীতে ঐ প্রকার দায়গ্রাহকের কথা বলা না থাকিলে কোম্পানী উহাদের নিয়োগ করিতে পারে না।

৫। **কর্মীদ্বারা** (Through Employees) :—

অনেক কোম্পানী কর্মীদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া থাকে। এবং এই কর্মীদের দ্বারাও শেয়ার বিক্রয় অভিযান পরিচালনা করে। ইহার ফলে শ্রমিক-

মালিক সম্পর্ক দৃঢ় ও উন্নত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কোম্পানী তাহার সমস্ত শেয়ারই বিক্রয় করিতে পারে না। সমস্ত শেয়ারের একটা সামান্য অংশ এই পদ্ধতিতে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে বিক্রয় ব্যয় কম হইলেও শেয়ার বিক্রয়ের অনিশ্চয়তা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।

৬। **শেয়ার গ্রহীতাদের দ্বারা** (Through Existing share holders) :—

এই পদ্ধতির মাধ্যমে কোন চালু কোম্পানী তাহার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয় করিতে হইলে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার প্রথমে আনুপাতিক ভিত্তিতে বর্তমান শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। কিন্তু যদি কোন কারণে উহারা এই নতুন শেয়ার ক্রয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তবে তখন এই নতুন শেয়ার বাজারে জনগণের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে এই নতুন শেয়ার বিক্রয় করিতে পারিলে ইহাতে বিক্রয় খরচ কম পড়ে। এবং টাকা প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা থাকে না। কিন্তু উহা সম্ভব না হইলে অর্থাৎ বাজারে বিক্রয় করিতে হইলে খরচ বেশী পড়ে এবং অর্থ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা এবং সমস্ত শেয়ার বিক্রয়ের অনিশ্চয়তাও দেখা দেয়।

এই সকলব্যবস্থা ছাড়াও কোম্পানী ইহার শেয়ার লগ্নীকারী সংস্থা মারফৎ বিক্রয় করিতে পারে।

পুঁজি বিন্যাস (Capital Gearing) :—

এই পুঁজি বলিতে সাধারণ শেয়ার, সুবিধাভোগীশেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতি হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থকে বা পুঁজিকেই বোঝায়। যে অনুপাতে এই তিনটি সূত্র হইতে অর্থ বা পুঁজি পাওয়া যায় সেই অনুপাতকেই সাধারণ কথায় পুঁজি বিন্যাস বলে। এই পুঁজির বিন্যাস করার সময় ঐ তিনপ্রকারের অনুপাত নির্ধারণ একটি সত্যই দুরূহ কাজ। ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই অনুপাত ঠিকভাবে নির্ধারণ করিতে না পারিলে পরিচালনায় বিভিন্ন প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। এই পুঁজি যদি উচ্চ বিন্যস্ত হয় তবে সাধারণ শেয়ার ক্রেতাগণের লভ্যাংশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রেণীর মূলধনের তুলনায় সাধারাণ শেয়ারের অনুপাত কম হয়। এই সময় বাজারে এই শেয়ারের দাম খুব বেশী হয় এবং চাহিদাও বেশী হয়। কারণ সকলে ঐ শেয়ার ক্রয় করিতে চেষ্টা করে। এই সময় ঐ শ্রেণীর শেয়ার লইয়া ফট্‌কাবাজারও দেখা দিতে পারে। অপরদিকে যখন অন্যান্য

শেয়ারের তুলনায় সাধারণ শেয়ারের অনুপাত বেশী হয় তখন তাহাকে নিম্ন-বিন্যস্ত মূলধন বলে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ প্রকারের শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা হ্রাস পায়। ফলে বাজারে ইহার চাহিদা কমিয়া যায় এবং বাট্টায় বিক্রয় হইতেও দেখা যায়। কারণ এই শেয়ার আর কেহ ক্রয় করিতে চাহে না। কারণ উহা হইতে প্রকৃত লভ্যাংশ পাওয়ার সম্ভাবনা আর থাকে না। সেজন্য পুঁজির আদর্শ বিন্যাস সকল প্রকার দৃষ্টিকোন হইতে কাম্য। কিন্তু এই কাম্য পুঁজির বিন্যাস কাহাকে বলে তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। সকল কোম্পানীই এই পুজির আদর্শ বিন্যাস অবস্থায় পৌছনোর চেষ্টা করে। এই প্রকার অবস্থায় পৌছনোর জন্য যে সকল ব্যবস্থাগুলির কথা চিন্তা করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই অধিক উল্লেখযোগ্য :—

(ক) কারবারের প্রকৃতি, (খ) কারবারের আয়তন, (গ) মূলধনের পরিমাণ, (ঘ) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, (ঙ) সুদের হার, (চ) ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, প্রভৃতি। এই পুঁজিবিন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে কোম্পানী পরিচালনার খরচ যতসম্ভব কম করিয়া সুষ্ঠভাবে কোম্পানী পরিচালনা করা।

এই পুঁজিবিন্যাসের জন্য যখন কোম্পানীর মুনাফার পরিমাণ প্রাথমিক অবস্থায় অনিশ্চিত থাকে কিন্তু ভবিষ্যতে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা থাকে তখন সাধারণ শেয়ার বিলিকরাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। কারণ প্রকৃত মুনাফার অবস্থা না জানিয়া সুবিধাভোগী শেয়ার বিলি করা উচিত নহে। ইহা করিলে কোম্পানী বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকির মধ্যে পড়িবে। ইহাছাড়া কোম্পানীকে আর্থিক বাজার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকিতে হইবে। এই বাজারের অবস্থায় উন্নতি দেখা দিলে লগ্নীকারীগণ লগ্নী করিতে উৎসাহী হয়। এবং সাধারণ শেয়ার বেশী বিক্রয় হয়।

অপরদিকে কোম্পানী যদি আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে অথবা কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ যদি স্থির থাকে তবে ঐ কোম্পানী ঋণ পত্র এবং সুবিধাভোগী শেয়ার বাজারে ছাড়িতে পারে। কিন্তু সকল কোম্পানীর উচিত হচ্ছে সুদের হার আর মুনাফার মধ্যে সমতা রাখিয়াই মূলধন সংগ্রহ করা।

শেয়ার বাজারের লগ্নি পত্রের তালিকাভুক্ত করণ (Listing of Securities in the Stock Exchange) :—

কোন কোম্পানী যদি ইহার শেয়ার কোন অনুমোদিত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিতে চাহে তাহা হইলে ঐ বাজার কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হয়। অন্যথায় বিক্রয় করিতে পারে না। এই প্রকার অনুমতির জন্য ঐ কোম্পানী উহার সিকিউরিটী-

গুলি ঐ বাজারের তালিকাভুক্ত করাইয়া লইবে। এই তালিকাভুক্ত করাইতে হইলে কিছু নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যেমন ঐ সিকিউরিটী তালিকাভুক্ত করাইতে ঐ বাজারের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে। এবং এই আবেদনপত্র বিজ্ঞাপনী প্রকাশের দিন হইতে দশদিনের মধ্যে করিতে হইবে। এবং ঐ অনুমতি প্রথম চারি সপ্তাহ অথবা সাত সপ্তাহের মধ্যে কোম্পানীকে গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ বাজার কর্তৃপক্ষ এই প্রকার লগ্নি তালিকাভুক্ত করার আবেদন পাইয়াই অনুমতি প্রদান করে না। উহারা ঐ কোম্পানীর বিজ্ঞাপনী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে। ইহার পরে ঐ কোম্পানী সম্পর্কে নানা বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখে। ইহাতে সন্তুষ্ট হইলে তবেই ঐ প্রকার অনুমতি প্রদান করে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা কোম্পানীর হাত হইতে শেয়ার বাজারকে রক্ষা করিবার জন্যই ঐ পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রত্যেক অনুমোদিত শেয়ার বাজারের পরিচালকমণ্ডলীতে একজন করিয়া সরকারী প্রতিনিধি থাকে। এবং সিকিউরিটি তালিকাভুক্ত করিতে হইলে কম পক্ষে শতকরা ৪৯টী জনসাধারণের নিকট বিলি করিতে হয়। এই সকল নিয়ম কানুন থাকার জন্যই দেশে অবাঞ্ছিত কোম্পানী খুব বেশীহারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী প্রবর্তনের জন্য কি কি পর্যায় প্রয়োজন ?

(What are the Steps Necessary for the Promotion of a Public Ltd. Company ?)

অথবা

সার্বজনিক সীমিত কোম্পানী প্রবর্তকের কাজ কি ?

(What are the Functions of Promoters of a Public Limited Company ?)

2. যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার মূলধন ও শেয়ারের বর্ণনা দাও।

(Discuss the various types of Capitals and Shares of a Joint Stock Company.)

৩. ঋণপত্র বলিতে কি বুঝ ? বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র আলোচনা কর।

(What is meant by Debenture ? Discuss its main classification.)

4. পার্থক্য নির্ণয় কর :—

a) ষ্টক ও শেয়ার।

b) শেয়ারহোল্ডার ও ডিবেঞ্চারহোল্ডার।

(Distinguish between :—

a) Stocks and Shares.

b) Shareholders and Debenture holders.)

5. কি কি বিভিন্ন পদ্ধতিতে যৌথ-কোম্পানী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে? এই প্রসঙ্গে উহার অসুবিধা আলোচনা কর।

(What are the various ways in which a Public Limited Company may raise Fund ? Discuss also in this Connection the Problems of corporate Finance.)

6. যৌথ-কোম্পানীর প্রয়োজনীয় মূলধন কি প্রকারে স্থির করা হয় তাহা আলোচনা কর।

(Discuss the factors that determine the necessary Capital requirement of a Joint Stock Company.)

7. স্বীয় মুনাফার পুনর্নিয়োগ বলিতে কি বুঝ? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What do you mean by Plaughing back of Profit ? Discuss its Advantages and Dis-advantages.)

8. যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং তাহাদের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Discuss the various methods of Marketing of Shares of a Joint Stock Company. And discuss their Advantages and Dis-advantages.)

৯. পুঁজি-বিন্যাস বলিতে কি বুঝ তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(Discuss briefly, what do you mean by Capital Gearing.)

10. শেয়ার বাজারে লগ্নী তালিকাভুক্ত করার উপর টীকা লিখ।

(Write notes on the Listing of Securities in the Stock Exchange).

যৌথ মূলধনী কোম্পানী পরিচালনা

(Management of Joint Stock Company)

ভূমিকা (Introduction):—

শেয়ার হোল্ডাররাই কোম্পানীর মালিক। কিন্তু তাহারা বিভিন্ন অঞ্চলে থাকার জন্য ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না। সে জন্য এই পরিচালনার ভার তাহারা তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করে। এই পরিচালক পর্ষৎই কোম্পানী পরিচালনার সব চাইতে ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান এবং তাহারাই কোম্পানীর মালিকানা হইতে পরিচালনাকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ পর্ষদের প্রত্যেক সভ্যকেই পরিচালক বলে।

কোম্পানী আকার ছোট হইলে ঐ পরিচালক পর্ষৎই উহা ভালভাবে পরিচালনা করিতে পারে কিন্তু উহা বড় হইলে ও সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করিবার প্রয়োজন হইলে ঐ পরিষদের অধীনে একজন প্রধান কার্য্য নির্বাহক নিযোগ করিতে হয়। যদি এই প্রধান কার্য্য নিবাহক সমস্ত কাজ করিতে অক্ষম হন তখন তিনি তাহার কাজের কিছু অংশ বিভাগীয় প্রধানদের উপর অর্পণ করেন। ভারতীয় কোম্পানী আইনে **চারপ্রকার** কার্য-নির্বাহক দেখা যায় :—

(ক) ম্যানেজার (Manager)

(খ) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (Managing Director)

(গ) সেক্রেটারিজ ও ট্রেজারার্স (Secretary and Treasurers) এবং

(ঘ) ম্যানেজিং এজেন্ট (Managing Agent)

পরিচালক পর্ষদ (Board of Directors):—

কোম্পানীর মালিকেরা অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডারেরা সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া কোম্পানী পরিচালনার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে যে কয়েকজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাহাদের পরিচালক বলা হয়। আর একযোগে উহাদিগকে পরিচালক পর্ষৎ বলে। কোম্পানী আইন অনুযায়ী পাবলিক কোম্পানী কমপক্ষে তিনজন এবং প্রাইভেট কোম্পানী কমপক্ষে দুইজন পরিচালক নিয়োগ করিতে পারে।

কোম্পানী পরিচালকের কার্য্যাবলী (Function of Directors) :—

১। কোম্পানী আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাতা-পত্র রক্ষা করিতে হইবে।

২। শেয়ার হোল্ডারগণের সভা আহ্বান করিতে হয়।

৩। শেয়ার হোল্ডারগণের সভায় বিভিন্ন বিবরণী পেশ করিতে হয়।

৪। মুনাফা বণ্টন ও কোম্পানীর নীতি ও পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ।

৫। প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ এবং

৬। পরিচালকের পদ শুন্য হইলে উহা পূরণ করিতে হইবে।

পরিচালকের কার্য্যের উপর বাধা নিষেধ (Restriction on the Function of Directors)

১। কোন পরিচালক একই সময় ২০ টার বেশী কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে কাজ করিতে পারে না।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের বিনানুমতিতে তাহারা ঋণ গ্রহণ অথবা ঋণের জন্য জামিনদার হইতে পারে না।

৩। তাহার কার্যভার অন্য কাহাকেও আইনত অর্পণ করিতে পারে না।

৪। শেয়ার হোল্ডারদের বিনানুমতিতে কোন পরিচালক ঐ কোম্পানীতে কোন লাভজনক পদ গ্রহণ করিতে পারে না।

(৫) কোম্পানীর কোন চুক্তিতে কোন পরিচালকের স্বার্থ জড়িত থাকিলে উহা সভায় আলোচনা কালে ঐ পরিচালক ঐ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারে না।

পরিচালক নিয়োগ ও অবসর গ্রহণ (Appoinment and Removal of Director)

একমাত্র কোন ব্যক্তিই পরিচালক নিয়োজিত হইতে পারে।

প্রবর্ত্তকগণই কোম্পানীর প্রথম পরিচালক নিয়োগ করে। কেহ পরিচালক হইতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলে তাহাকে লিখিত ভাবে ইহা নিবন্ধকের নিকট পেশ করিতে হয়।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ আইনে সকল পরিচালকগণের অবসর গ্রহণের কথা বলা না থাকিলে, আইনমত অন্তত দুই তৃতীয়াংশের অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাতন পরিচালকের পদ শুন্য হইলে তাহা বাৎসরিক সাধারণ সভায় উহা নির্বাচনের দ্বারা পূরণ করিতে হয়।

পরিচালক হইবার অযোগ্য ব্যক্তি (Person Uufit for the Post of Director)

পাগল ব্যক্তি, দেউলিয়া, নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি, যাহারা তলবী অর্থ প্রদান করে নাই, যাহারা আদালত দ্বারা অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, বিনানুমতিতে তিন বা ততোধিক সভায় অনুপস্থিত ব্যক্তি, কোম্পানীর সহিত জড়িত এবং তাহার গোপণ স্বার্থ প্রকাশ পাইয়াছে প্রভৃতি ব্যক্তি পরিচালক নির্বাচিত হইতে পারে না।

পরিচালকগণের পারিশ্রমিক (Remuneration of the Directors) :—

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশমত একটা অর্থ প্রতিমাসে পারিশ্রম হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে।

(২) কোন ক্রমেই তাহাদের প্রাপ্য অর্থ কোম্পানীর নীট লাভের শতকরা তিন ভাগের বেশী হইতে পারিবে না।

(৩) প্রতি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য প্রত্যেকে ২৫০ টাকা পর্য্যন্ত পাইবে।

(৪) ম্যানেজিং ডিরেকটর কোন ক্রমেই কোম্পানীর নীট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী পাইবে না। একাধিক থাকিলে একত্রে শতকরা দশভাগ পাইবে।

(৫) কোন কোম্পানীতে ম্যানেজিং এজেণ্ট, অথবা সেক্রেটারী ও ট্রেজারার্স অথবা ম্যানেজিং ডিরেকটর বা ম্যানেজার থাকিলে তাহারা মোট নীট লাভের শতকরা একভাগের বেশী পাইবে না।

ম্যানেজিং ডাইরেকটর (Managing Director) :—

১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২ (২৬) ধারাতে ম্যানেজিং ডাইরেকটর বলিতে বলা হইয়াছে যে, "কোম্পানীর সহিত চুক্তির বলে অথবা কোম্পানীর সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বলে কিংবা ডিরেকটরদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বলে কিংবা স্মারকলিপি বা আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীর বলে যে ডিরেকটরের উপরে কোম্পানী পরিচালনার অধিকাংশ ক্ষমতা অর্পিত হয় যাহা তিনি সাধারণভাবে ব্যবহারের অধিকারী নন তাহাকে পরিচালক-নির্দেশক বলা হয়।"

ম্যানেজিং ডাইরেকটরের প্রধান কার্য্যাবলী (Main Functions of Managing Director)

(১) গৃহীত-নীতি ও সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করিতে হয়।

(২) সর্ব্বত্র নেতৃত্ব দিতে হয় আর কর্মীগণকে উৎসাহ প্রদান করিতে হয়।

(৩) প্রত্যেক উচ্চ ও নীচু কর্মীর কাজ নির্ধারণ ও পরিচালনা করিতে হয়।

(৪) প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন কর্মীকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৫) কোম্পানীর দৈনন্দিন কাজ স্থির করিতে হয় এবং উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে।

(৬) উন্নয়ণ মূলক কার্য্য বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা বাস্তবায়িত করিতে হইবে।

(৭) প্রয়োজনীয় নীতির রদবদল করিতে হইলে তাহা করিতে হইবে এবং অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) বিশ্বাস ভঙ্গ, দায়িত্বে অবহেলা প্রভৃতি খারাপ নাম যাহাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

(৯) সরকারী ও বে-সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সুন্দর ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(১০) নিয়মিত প্রয়োজনীয় পণ্য কম মূল্যে ভোগকারীদের সরবরাহ করিতে হইবে।

নির্বাহী নিযুক্তক (Managing Agent) :—

কোন যৌথ মূলধনী কারবার পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তি, অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা যৌথ মূলধনী কারবার চুক্তিবদ্ধ হইলে তাহাকে নির্বাহী নিযুক্তক বলে।

উহাদের কার্যাবলী (Functions)

(১) নতুন কারবার পত্তনের উদ্যোগ ইহারা গ্রহণ করে।

(২) উহারা উহাদের অধীনস্থ কোম্পানীকে আর্থিক সাহায্য দিয়া থাকে। নিজেরা ঋণ দিয়া অপরের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া অথবা কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিয়া তাহারা অধীনস্থ কোম্পানীকে সাহায্য করে।

(৩) কোম্পানী পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্বও গ্রহণ করে। তাহারা খুব দক্ষ। সেজন্য ক্রমে ক্রমে ব্যবসার উন্নতি হয়।

ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসে ইহাদের দান অসামান্য। পাটশিল্প, বস্ত্র শিল্প, চা-শিল্প প্রভৃতির উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিলে উহাদের গুরুত্ব বোঝা যায়।

ব্যবস্থাপক (Manager) :—

ম্যানেজিং এজেন্ট নহে এরূপ ব্যক্তি পরিচালকমণ্ডলীর তদারকে ও নিয়ন্ত্রনে থাকিয়া পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলে তাহাকে ব্যবস্থাপক বলে।

একাধিকক্রমে কোন ব্যবস্থাপক ৫ বৎসরের বেশী কোন কোম্পানীর ব্যবস্থাপক থাকিতে পারে না অথবা একই সাথে একাধিক কোম্পানীর ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হইতে পারে না।

পরিচালক সমিতির নির্দেশমত ব্যবস্থাপকের কার্য্য নির্ধারিত ও সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সেক্রেটারীজ এবং ট্রেজারার্স (Secretaries and Treasurers) :—

ম্যানেজিং এজেন্টের পরিবর্ত্ত হিসাবে ইহাদের কথা সর্ব্ব-প্রথম ১৯৫৬ সালের কোম্পানীর আইনে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালের কোম্পানীর আইনের ২ (৪৪) ধারাতে ইহাদের সংজ্ঞা নিম্নরূপে দেওয়া হইয়াছে :—

"যে কোন অংশীদারী কারবার অথবা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান যাহা পরিচালক সমিতি তদারক, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনার অধীন থাকিয়া কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সমগ্র অথবা সবিশেষ ভার বহন করে, এবং চুক্তিবদ্ধ হইয়া হউক বা না হইয়া হউক, অথবা যে নামেই পরিচিত হউক না কেন, সেক্রেটারীজ এবং ট্রেজারার্স এর-পদে আসীন — এরূপ যে কোন অংশীদারী কারবার অথবা যৌথ মূলধনী কারবারকেই সেক্রেটারীজ এবং ট্রেজারার্স বলা যায়।"

উহার বৈশিষ্ট্য (Features) :—

১। কোন ব্যক্তি সেক্রেটারীজ বা ট্রেজারার্স নিয়োজিত হইতে পারে না।

২। কোন কোম্পানীতে একই সাথে সেক্রেটারীজ ও ট্রেজারার্স এবং ম্যানেজিং এজেন্ট থাকিতে পারে না। এবং

৩। তাহারা পরিচালক পরিষদে তাহাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারে না।

উহাদের পারিশ্রমিক (Remunerations) :—

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে বলা হইয়াছে যে, উহারা কোম্পানীর মুনাফার ৭½ শতাংশ পাইবে আর মুনাফা যথেষ্ঠ না হইলে অথবা লোকসান হইলে তাহারা প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করিবে।

ম্যানেজিং এজেন্ট ও সেক্রেটারীজ ও ট্রেজারার্সের মধ্যে পার্থক্য (**Distinction between Managing Agent and Secretaries and Treasurers**):—

ম্যানেজিং এজেন্ট	সেক্রেটারীজ ও ট্রেজারার্স
১। যে কোন ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার, ও কোম্পানী ইহা নিযুক্ত হইতে পারে।	১। কোন ব্যক্তি ইহা হইতে পারে না। একমাত্র অংশীদারী কারবার এবং কোম্পানীই হইতে পারে।
২। পরিচালক সমিতির ম্যানেজিং এজেন্ট কমপক্ষে একজন ও উর্ধ্বে দুইজন পরিচালক নিয়োগ করিতে পারে।	২। ইহাতে পরিচালক সমিতির সেক্রেটারীজ ও ট্রেজারার্স কোন পরিচালক নিয়োগ করিতে পারে না।
৩। কোম্পনীর নীট লাভের শতকরা ১০ ভাগ ইহারা পারিশ্রমিক লয়।	৩। ইহারা নীট লাভের শতকরা ৭½ ভাগ পারিশ্রমিক লয়।
৪। একসাথে ইহারা ১০টির বেশী কোম্পানী পরিচালনা কবিতে পারে না।	৪। যে কোন সংখ্যক কোম্পানী ইহারা পরিচালনা করিতে পারে।
৫। প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের নিয়োগ বন্ধ করিয়া দিতে পারে।	৫। ইহাদের প্রতি এরূপ কোন বাঁধা নিষেধ নাই।
৬। ইহারা অফিস খরচ বাবদ কমপক্ষে ৫০,০০০ টাকা পাইতে পারে।	৬। ইহারা অফিস খরচ বাবদ কোন টাকা পায় না।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ম্যানেজারের পার্থক্য (**Distinction between Managing Director and Manager**) :—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর	ম্যানেজার
১। চুক্তি দ্বারা ইহারা নিযুক্ত হয়।	১। ইহা চুক্তি দ্বারা হইতে পারে আবার নাও পারে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর	ম্যানেজার
২। পরিচালক সমিতির সদস্য ভিন্ন অন্য কেহ ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইতে পারে না।	২। যে কোন পরিচালক অথবা ব্যক্তি ম্যানেজার হইতে পারে।
৩। কোম্পানীর ছকে বাঁধা নিয়মে তাঁহাকে কাজ করিতে হয় না।	৩। ম্যানেজার কোম্পানী ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব বহণ করে।

ম্যানেজিং এজেণ্ট ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মধ্য পার্থক্য (Distinction between Managing Agent and Managing Director) :—

ম্যানেজিং এজেণ্ট	ম্যানেজিং ডিরেক্টর
১। যে কোন ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার ও কোম্পানী ইহা নিযুক্ত হইতে পারে।	১। একমাত্র ব্যক্তিবিশেষই ইহা নিযুক্ত হইতে পারে।
২। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের নিয়োগ রদ করিতে পারে।	২। ঐ প্রকার কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বাধা নিষেধ ইহাতে নাই।
৩। কোম্পানী আইন অনুযায়ী প্রথমে ১৫ বৎসরের জন্য এবং পরে ১০ বৎসরের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্ট নিয়োগ করা যায়।	৩। একসাথে ৫ বৎসরের বেশী ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগ করা যায় না।
৪। একই সাথে ১০টি কোম্পানীর অধিক ম্যানেজিং এজেণ্ট কোন প্রতিষ্ঠান হইতে পারে না।	৪। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কেহ দুইটি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইতে পারে না।
৫। পারিশ্রমিকের জন্য নীট মুনাফার ১০ শতাংশ পায়।	৫। পারিশ্রমিকের জন্য নীট মুনাফার ৫ শতাংশ পায়।
৬। ইহাদিগকে পরিচালক সমিতির সদস্য হইবার কোন প্রয়োজন নাই।	৬। ইহারা অবশ্যই পরিচালক-সমিতির সদস্য হইবে।

ভারতীয় শিল্পের উন্নতিতে ম্যানেজিং-এজেণ্টের ভূমিকা (**Role of Managing Agent in the industrial development of India**) :—

ভারতীয় শিল্পের উন্নতিতে ম্যানেজিং এজেণ্টের দান অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সময় উপযোগী। ইহাদের প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিল্পের উন্নতির দ্বার খুলিয়া যায়। যখন শিল্পক্ষেত্রে কেহ অর্থ বিনিয়োগ করিতে উৎসাহী ছিল না ঠিক সেই সময় ম্যানেজিং এজেণ্ট এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহাদের প্রচেষ্টায় ভারতে নতুন নতুন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, মূলধন সরবরাহ করিয়াছে এবং পরিচালনার ভারও গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের প্রচেষ্টায় ভারতে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি হইলেও নিম্নোক্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

চা, পাট, বস্ত্র লৌহ, কাগজ, ইস্পাত প্রভৃতি অন্যতম। ইহাদের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমে ইহারা কোম্পানীকে সাহায্য করে নাই, পক্ষান্তরে আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া কোম্পানীর উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ইহার ফলে পূর্বে যাহারা শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিত না তাহারাও বিনিয়োগ শুরু করিল। এইভাবে শিল্পের উন্নতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইহাদের দান অসামান্য। ইহাদের অবদান না পাইলে হয়তো আজ ভারতীয় শিল্প বর্তমান স্থানে পৌছাইতে পারিত না। এমনকি হয়তো কল্পনাও করিতে পারিত না।

ম্যানেজিং এজেন্সীর ত্রুটি (**Defects of Managing Agency System**) :—

এককালে ইহারা অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করিলেও আজ ইহা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ; যেমন।

ইহারা বংশানুক্রমে মালিকানা পায় বলিয়া ইহা দুর্বল হইয়া পড়ে। কারণ অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পরিচালনা গেলে কোম্পানী নষ্ট হইয়া যায়।

২। বিভিন্ন খারাপ উপায়ে ইহারা অনেক সময় কোম্পানীর মুনাফা আত্মসাৎ করে। ফলে মালিকের প্রকৃত প্রাপ্য অর্থ পায় না।

৩। অনেক সময় ইহারা গোপনে কোম্পানীর ক্রয়ের ও বিক্রয়ের উপর কমিশন গ্রহণ করে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

৪। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ইহারা কোম্পানীর শেয়ার লইয়া ফাটকা কারবার করে।

৫। অনেক সময় কোম্পানী পরিচালনায় নিজেদের লোক ঢুকাইয়া দেয়।

৬। নিজেদের কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য ইহারা অতি প্রয়োজনেও ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইতে অস্বীকার করে।

৭। অনেক সময় অনেক প্রতিযোগিতামূলক কারবার ইহারা নিজেদের হাতে গোপনে রাখিয়া দেয়।

এই সকল কারণে ইহারা ইহাদের গুরুত্ব অনেকাংশে বর্তমানে হারাইয়াছে। এমনকি অনেকে মনে করেন, এই ব্যবস্থার বর্তমানে আর প্রয়োজন নাই।

ইহাদের বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি যদি আইনদ্বারা নিষেধ করা যায় তবেই মঙ্গল নতুবা ইহার বিলোপ সাধন সর্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়।

ম্যানেজিং-এজেন্সি প্রথার ভবিষ্যৎ (Future of Managing Agency System) :—

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে ম্যানেজিং এজেন্সী পদ্ধতি একটি উজ্জ্বল নাম। কিন্তু কালক্রমে ইহাদের দুর্নীতির জন্য ইহারা সকলের মন হইতে প্রায় মুছিয়া যাইতে বসিয়াছে। এই অবস্থায় ইহাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কোনপ্রকার মন্তব্য করা সত্যিই কঠিন কাজ। ইহারা আদৌ ভবিষ্যতে থাকিবে কিনা তাহা নিম্নলিখিত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা তুলিয়া ধরিতে পারি :—

১। **প্রবর্তকের ভূমিকা :—**

ইহাই ম্যানেজিং এজেন্সীর প্রথম ভূমিকা। পূর্বে অনেক নতুন কোম্পানী তাহারা প্রবর্তন করিলেও বর্তমানে আর করিতে পারিতেছে না। কারণ প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রচেষ্টায় দারুণ দারুণ নতুন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা হইয়া চলিয়াছে সুতরাং প্রবর্তক হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব প্রাচীনকালে থাকিলেও বর্তমানে আর নাই।

২। **অর্থের যোগানদাতা :—**

প্রাচীনকালে ইহা ছিল তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। নিজেদের অর্থ, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের অর্থ সংগ্রহ করিয়া শিল্পের উন্নতিতে তাহারা বিনিয়োগ করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে শিল্পের প্রয়োজনীয় অর্থের অতি নগণ্য অংশে ইহারা যোগান দিয়া থাকে। বর্তমানে শিল্পপতিগণ সরকারী প্রচেষ্টায় গঠিত প্রতিষ্ঠানের উপর অর্থের জন্য বেশী নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে বৈদেশিক ঋণ প্রদানের প্রতিষ্ঠানও আছে। সুতরাং অর্থের যোগানদাতা হিসাবেও ইহার প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছে।

৩। নিজস্ব শিল্পের সম্পদ অন্তশিল্পে প্রদান :—

ইহা তাহাদের তৃতীয় কাজ। বর্তমানে অনেকে মনে করেন এই ভূমিকার কোন গুরুত্ব নাই। কারণ কারবার করিতে হইলে নিজেদের সম্পদও বিনিযোগ করিতে হয়। উহা সিন্দুকে লুকাইয়া রাখা যায় না।

৪। ব্যবস্থাপকের ভূমিকা :—

ব্যবস্থাপক হিসাবে ইহারা সর্বত্র কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ ব্যাঙ্কিং, বীমা প্রভৃতি কোম্পানী তাহাদের ব্যবস্থাপন ব্যতীত সুন্দরভাবে চলিয়াছে। বর্তমানে দেশে অনেক যুবক এই সম্পর্কে যথেষ্ট ট্রেনিং লইয়াছে। সুতরাং তাহাদের বাদ দিয়া ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ব্যবস্থাপক হিসাবেও তাহাদের গুরুত্ব বর্তমান কালে যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে বোঝা যায় যে অতীতে ইহার গুরুত্ব থাকিলেও বর্তমানে উহা হ্রাস পাইয়াছে। এমনকি প্রয়োজন নাই বলিলেও মনে হয় ভুল হয় না। সরকারও '১৯৭০ সালের এপ্রিল হইতে ইহাদের বিলুপ্তি ঘোষণা করিয়াছে। তবে একথাও বলা যায় যে, জনগণের তিরস্কার ও সরকারী চাপে পড়িয়া ইহার দুর্নীতি অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। সুতবাং এই অবস্থায় ইহাদের স্থায়িত্ব ইহাদের উপরই নির্ভরশীল অর্থাৎ নিজেদের দোষ-ত্রুটি যদি সংশোধন করিয়া বর্তমান পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে তবে টিকিয়া থাকিতে পারিবে অন্যথায় ইহাদের ভবিষ্যতের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিবে।

১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনে ম্যানেজিং এজেন্টের উপর আরোপিত বাধানিষেধ সমূহ (Main Restrictions Imposed on the Managing Agent System Under Companies Act 1956):—

১৯৩৬ সালে প্রথম ম্যানেজিং এজেন্টের কার্য্যাবলীর উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। কিন্তু ঐগুলি যথেষ্ট না হওয়ায় আবার ১৯৫৬ সালের আইনে কঠোর বাঁধা-নিষেধ আরোপিত হয়। এই সকল বাঁধা-নিষেধের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি বন্ধ করা। এই নতুন কোম্পানী আইনে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের আইনে ম্যানেজিং এজেন্টের উপর যে সকল বাঁধা-নিষেধ আরোপিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপে আলোচনা করা যায়।

১। **নিয়োগ ও কার্য্যকাল ঃ—**

কোম্পানীর সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব সরকারী অনুমোদন (স্বীকৃতি) দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে হইবে। প্রথমে ১৫ বৎসর ও পরে ১০ বৎসরের জন্য তাহাদিগকে নিয়োগ করা যাইবে।

২। **পরিচালনাধীন কোম্পানীর সংখ্যা ঃ—**

১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্টের পর হইতে তাহারা একত্রে ১০টির অধিক কোম্পানীর পরিচালনা করিতে পারিবে না।

৩। **পারিশ্রমিক ঃ—**

নীট মুনাফার শতকরা ১০ ভাগের বেশী তাহারা পারিশ্রমিক পাইবে না। মুনাফা কোন বৎসর না হইলে তাহারা পারিশ্রমিক হিসাবে কমপক্ষে ৫০,০০০ টাকা পাইবে। কোম্পানীর স্বার্থে কোন অর্থ খরচ করিলে তাহা তাহারা পাইবে।

৪। **আর্থিক লেনদেন ঃ—**

ইহাদের অধীনের কোন কোম্পানীর অর্থ তাহারা অন্য কোম্পানীতে খাটাইতে পারিবে না। অধীনস্থ কোন কোম্পানী হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না। অধীনস্থ কোম্পানীর ২০,০০০ টাকা বেশী তাহারা জমা রাখিতে পারিবে না।

৫। **তাহাদের পদ শুন্য হইলে, অথবা বরখাস্ত হইলে ঃ—**

কোন ম্যানেজিং এজেন্ট দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইলে তাহার ম্যানেজিং এজেন্সীর পদ চলিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে ঐ পদটি শুন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সম্পত্তির দেখাশুনা করিবার জন্য আদালত দ্বারা রিসিভার নিযুক্ত হইলে সাময়িক ভাবে ম্যানেজিং এজেন্সীর পদ শূন্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

কাজে অবহেলা, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণ সাধারণ সভায় প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে তাহাদের অপসারণ করিতে পারেন।

৬। **কার্য্যাবলী ঃ—**

কোন ম্যানেজিং এজেন্সীপ্রতিষ্ঠান অন্য কোন ম্যানেজিং এজেন্টের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিবে না।

কর্মচারী নিয়োগ, সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে ইহারা সর্বদা কোম্পানীর পরিচালক-অধীনে থাকিবে।

শুধুমাত্র উত্তরাধিকারী সূত্রে মালিকানা পাইলে চলিবে না। এ ব্যাপারে সরকারী অনুমতি লইতে হইবে।

১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে অনুমোদন ভিন্ন কোন কোম্পানীর পরিচালনভার তাহারা অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

বিনা অনুমতিতে তাহারা তাহাদের অধীনস্থ কোম্পানীর সমজাতীয় ব্যবসা করিতে পারিবে না।

ইহারা ইহাদের অধীনস্থ কোম্পানীতে ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইলে ১ জন ও উহার বেশী হইলে ২ জন পর্য্যন্ত পরিচালক মনোনয়ন করিতে পারে।

৭। **অন্যান্য :—**

কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে এই প্রথা তুলিয়া দিতে পারিবে।

তাহারা বরখাস্ত হইলে বা অন্য কোন কারণে অপসারিত হইলে কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না।

ভারতের ভিতরে ইহারা কোম্পানীর ক্রয়-বিক্রয় প্রতিনিধি হইতে পারিবে না।

প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলীও ইহাদের বরখাস্ত করিতে পারে।

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থরক্ষার পদ্ধতি। (Provision of the Companies Act 1956 to Safeguard the interest of the Minority Share-holders)

কোম্পানী পরিচালনার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার গ্রহীতাদের মতামত প্রায় সবসময় সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ারগ্রহীতাদের উপর চাপিয়া বসিত। ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের পরিপন্থী হইলেও তাহারা উহা মানিয়া লইত। সেইজন্য তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। আর এই ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়।

১। সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর অত্যাচার বা অন্যায় করা হইতেছে মনে হইলে যে কোন শেয়ারগ্রহীতা কোম্পানী ভঙ্গ করিয়া দেওয়ার জন্য ট্রাইবুনালের নিকট আবেদন করিতে পারে।

২। যদি কোন শেয়ারগ্রহীতা মনে করে যে, কোম্পানী ঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছে না, তাহা হইলেও উহা বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য ট্রাইবুনালকে জানাইতে পারে।

৩। কোম্পানী পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিলেও কোম্পানী পরিচালনা ক্ষতিকারক হইতে পারে।

উপরোক্ত ব্যাপারে খোঁজ খবর লইয়া যে কোন ব্যাপারে ট্রাইবুন্যাল নিশ্চিত হইলে উহা দূর করিবার জন্য কোম্পানীকে নির্দেশ দিতে পারে এবং শেয়ার গ্রহীতাদের স্বার্থ রক্ষার্থে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

(ক) দুইজন ডাইরেক্টরকে তিন বৎসরের জন্য নিযোগ করিতে পারে।

(খ) দুইজন ডাইরেক্টরকে পরে সামানুপতিক ভোটের ভিত্তিতে নিযুক্ত করিতে পারে। এইপ্রকার ডাইরেক্টরকে কোন শেয়ার ক্রয় করিতে হয় না।

উক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও সংখ্যালঘিষ্ঠ শেযার গ্রহীতাদের স্বার্থ রক্ষার্থে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। কোর্টের অনুমতি ভিন্ন পুঁজির পরিবর্তন, উদ্দেশ্যর পরিবর্তন প্রভৃতি করা যাইবে না।

২। ন্যায়ের দাবীতে এমনকি একজন শেযারগ্রহীতাও কোর্টে কোম্পানী ভঙ্গের দাবী জানাইতে পারে।

৩। কোম্পানীর পরিবর্তন বা একত্রীকরণে কোন শেয়ার গ্রহীতার অংশ ক্রীত না হওয়া পর্য্যন্ত বাঁধা দেওয়া যায় না।

৪। একজন শেয়ারগ্রহীতাও কার্য্যনির্বাহকদের পদচ্যুতির জন্য আবেদন করিতে পারেন।

৫। কোম্পানী সম্পর্কে-জানিবার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার গ্রহীতাগণ কোম্পানী সংক্রান্ত বিভাগের নিকট আবেদন করিতে পারেন।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. কোম্পানী পরিচালনার প্রকৃতি ও কাঠামো সম্পর্কে একটা ধারণা দাও।

(Give an Idea of the Nature and Pattern of Company Management).

2. নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

কোম্পানী পরিচালকের কার্য্যাবলী, উহাদের কাজের উপর বাঁধা-নিষেধ, নিয়োগ ও অবসরগ্রহণ পদ্ধতি, পরিচালক হইবার অযোগ্য ব্যক্তি, ও উহাদের পারিশ্রমিক।

(**Write Notes on :—**

Function of Company Director, Restriction imposed on their function, their appointment and retirement, person unfit for the Post of Director and the is Remuneration).

3. ম্যানেজিং ডাইরেকটর বলিতে কি বুঝ? উহাদের প্রধান প্রধান কার্য্যাবলী কি কি?

(**What is meant by Managing Directors ? What are their mean Functions).**

4. নির্বাহী নিযুক্তক ও ব্যবস্থাপক সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

(**Write notes on Managing Agent and Manager).**

5. সেক্রেটারী ও ট্রেজারার্স বলিতে কি বুঝ? উহাদের বৈশিষ্ট্য ও পারিশ্রমিক সম্পর্কে আলোচনা কর।

(**What is meant by Secretary and Treasurers ? Discuss their Features and Remunerations.)**

6. পার্থক্য নির্ণয় কর :—

a) ম্যানেজিং এজেন্ট এবং সেক্রেটারী ও ট্রেজারার্স।

b) ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ম্যানেজার।

c) ম্যানেজিং এজেন্ট ও ম্যানেজিং ডিরেকটর।

(**Distinguish beetween : –**

a) **Managing Agent and Secretary and Treasurer.**

b) **Managing Director and Manager.**

c) **Managing Agent and Managing Director).**

7. ম্যানেজিং এজেন্ট বলিতে কি বুঝ? উহাদের কি ত্রুটী আছে?

(**What do you mean by Managing Agent ? What are their defects) ?**

8. ভারতবর্ষে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে। ইহাতে তোমার মতামত কি?

(**The Managing Agency System has outlived its utility in India. What is your openion about the view) ?**

9. ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষা কি ভাবে হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

(Discuss, how the companies act 1956 has Safeguarded the interest of the Minority Share-holders).

10. ১৯৫৬ সালে কোম্পানী আইনে ম্যানেজিং এজেন্টদের উপর কি কি বাঁধা-নিষেধ আরোপিত হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

(Discuss the various restrictions that have been imposed upon the Managing Agency System according to the companies Act 1956).

11. ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্ট ও সেক্রেটারী ও ট্রেজারার্সের কাজের সমালোচনা কর।

(Comment on the Respective Functions of Managing Director, Managing Agent and Secretary and Treasurers).

12. অনেক সার্বজনিক সীমিত কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ডিরেক্টর থাকেন। উহাদের কাজ ও দায়িত্ব কি ?

(The Board of Directors of Many Public Limited Company Consists of Managing Directors and Directors. What are their Respective Functions and Responsibilitis) ?

কোম্পানীর কর্মসচিবের কার্য্য-পদ্ধতি

(Company Secretaries Practice.)

কোম্পানী কর্মসচিবের সংজ্ঞা, অধিকার, কর্তব্য এবং কার্য্যাবলী (Defination of Company Secretary, his Rights, duties and functions) :—

কোম্পানী পরিচালনার জন্য পরিচালক মণ্ডলীর কতৃত্বাধীন থাকিয়া কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত বেতনভুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কর্ম-সচিব বলে। আইনত কর্ম-সচিব একজন বেতনভুক কর্মচারী মাত্র। এই জন্য তাহাকে কর্মচারী আখ্যা দেওয়া হয়।

এই কর্মসচিবের অধিকার, কর্তব্য এবং কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপে আমরা আলোচনা করিতে পারি।

১। কোম্পানীর সকল প্রকার কারণিক কাজ তিনি নিয়ন্ত্রন করেন এবং তিনি ঐ কারণিক বিভাগের মুখ্য ব্যক্তি। কোম্পানী সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার নোটিশ জারি, চিঠিপত্র লেখা সবই তাহাকে করিতে হয়।

২। কোম্পানী পত্তনের সময় প্রবর্তকদের যে সভা হয়, সেই সভার সমস্ত আলোচ্য বিষয় তিনি মিনিট বইতে লিখিয়া রাখেন।

৩। কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশানের পরে সভা আহ্বান করা, কোম্পানীর ব্যবস্থাপক, কর্মচারী, হিসাবরক্ষক প্রভৃতি নিয়োগ সকল কাজই তাহাকে করিতে হয়।

৪। তিনি কোম্পানীর সকল প্রকার দলিল-পত্র রক্ষা করেন এবং প্রয়োজনে পেশ করেন।

৫। বিভিন্ন দলিলের খসড়া তিনি প্রস্তুত করেন এবং যথাসময়েই তাহাকে ঐ দলিল নিবন্ধকের নিকট পেশ করিতে হয়।

৬। তিনি কোম্পানীর বিভিন্ন সভা ডাকার ব্যবস্থা করেন এবং ঐ ব্যাপারে নোটীশ প্রস্তুত করেন।

৭। বিভিন্ন সভায় যে সকল আলোচনা হয় তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।

৮। তিনি কোম্পানীর সহিত বিভিন্ন পক্ষের চুক্তি সম্পাদন করেন এবং উহাতে সীলমোহরাঙ্কিত করেন।

৯। কোম্পানীর সকল প্রকার খাতা-পত্র ও সীল মোহর তিনি নিজের দায়িত্বে রাখিয়া দেন।

১০। কোন শেয়ার হস্তান্তরিত হইলে তিনি উহা কোম্পানীর দলিলে বা খাতা-পত্রে লিখিয়া রাখেন।

১১। তিনি একাধারে কোম্পানী, শেয়ারহোল্ডার, ডিবেঞ্চার হোল্ডার ও পাওনাদারগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন।

সেক্রেটারীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী (Qualifications of Sacretary) :—

কোন সেক্রেটারীর কি কি গুণাবলী থাকা একান্ত দরকার তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। কারণ ইহা বহুলাংশে নির্ভর করে তাঁহার কর্মপ্রকৃতির উপর। সেইজন্য বলা যায় সকলপ্রকার সেক্রেটারীর গুণাবলী একপ্রকার হইতে পারে না এবং হওয়া উচিত নহে। কিন্তু মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, একজন প্রাইভেট সেক্রেটারীর শিক্ষাগত যোগত্যাছাড়াও তাহার নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

(ক) কোন কলেজ হইতে ঐ সম্পর্কে অর্থাৎ সেক্রেটারীর কাজ সম্পর্কে তাহাকে হাতে-কলমে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।

(খ) অফিস ও ব্যবসায়ের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান থাকা দরকার।

(গ) ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট দখল থাকা দরকার। কারণ তাহাকে চিঠিপত্র লিখিতে হয়।

(ঘ) হিসাব রক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি সম্যক জ্ঞাত থাকিবেন।

(ঙ) যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান তাহার থাকা বাঞ্ছনীয়। সম্ভব হইলে বিদেশী ভাষায় জ্ঞান থাকাও দরকার। এবং—

(চ) উপস্থিত বুদ্ধি, দায়িত্বজ্ঞান, নীতিবোধ, বিশ্বস্ততা, তীক্ষ্ণ অনুভূতি প্রভৃতিকেও সেক্রেটারীর গুণাবলীর অংশ বলিয়া বিচার করা হয়।

বিভিন্নপ্রকারের সেক্রেটারী (Different Types of Secretaries) :—

বর্তমানে বিভিন্নপ্রকার সেক্রেটারী বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই তাহাদের প্রধান শ্রেণীবিভাগ।

(ক) **একান্ত সচিব** (Private Secretary) :—

কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ব্যক্তি সব সময় তাঁহার সকল নির্দ্ধারিত কাজ সময় অভাবে সমান গুরুত্ব দিতে পারেন না। নিজের কাজের বোঝা কমানোর জন্য তিনি যদি কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন তবে তাহাকে ঐ ব্যক্তির একান্ত সচিব বলে। এই

প্রকার একান্ত সচিবের কাজ খুব শ্রমসাধ্য কিন্তু চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্রময়। এই একান্ত সচিবের কাজ একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় প্রকৃতির। নিয়োগ কর্তার রুচি, ব্যবহার, ইচ্ছা, অনিচ্ছার উপর তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এবং ইহা করিতে পারিলেই তাহার চাকুরীতে সফলতা আসে।

এই শ্রেণীর সচিবের **দায়িত্ব বা কর্ত্তব্যগুলি** সংক্ষেপে নিম্নরূপে আলোচনা করা যায় :—

১। তিনি বিভিন্ন সময় নিয়োগ কর্ত্তার নিকট হইতে শ্রুতিলিখন গ্রহণ করেন। উহা টাইপ করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন এবং একপ্রস্থ অফিসের জন্য রাখিয়া দেন। বহিরাগত ও বহির্গামী ডাক তিনি গ্রহণ করেন এবং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই আবার সমস্ত নথিবদ্ধকরণ, তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্যও সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

(২) তিনি নিয়োগকর্ত্তার আদেশানুসারেই বিভিন্ন পত্র রচনা করেন। নিয়োগ-কর্ত্তার বক্তৃতা, পুস্তক প্রভৃতি মুদ্রণের সময় উহাদের প্রুফও সংশোধন করিয়া থাকেন।

৩। নিয়োগকর্ত্তার নিকট কোন লোক কাজে আসিলে, সচিব তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইবেন। তাহাদের জিজ্ঞাসার জবাব ও প্রয়োজনে তিনি ঐ সকল ব্যক্তিকে নিয়োগ কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করাইয়া দিবেন। ইহা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন ব্যাপার তাহার ডায়েরীতে নোট করিয়া রাখিবেন এবং প্রয়োজনীয় সময়ে উহা নিয়োগ কর্ত্তাকে স্মরণ করাইয়া দেবেন।

৪। নিয়োগ কর্ত্তার ব্যাঙ্কের হিসাবও তিনি রাখিবেন। প্রয়োজনে ঐ ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ তুলিবেন এবং প্রাপ্ত অর্থ বা চেক সময়মত ব্যাঙ্কে জমা পাঠাইবেন। ইহা ছাড়াও-নিয়োগ কর্ত্তার জীবনবীমার প্রিমিয়াম, কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতিও তিনি সময়মত পরিশোধ করিয়া দিবেন।

৫। আবাসিক-সচিব হইলে তাহাকে নিয়োগ কর্ত্তার অনেক বাড়ীর কাজও সম্পাদন করিতে হয়। যেমন নিয়োগ কর্ত্তার বাড়ীতে কোন উৎসব হইলে সেখানে সচিবকে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। প্রভৃতি।

(খ) সমিতি সচিব (Club Secretary)

কোন সংঘ, বণিক সভা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি উহাদের কাজকর্ম ভালভাবে পরিচালনার জন্য যদি উহাদের সভ্যগণের মধ্য হইতে কাহাকেও নির্বাচিত করে

তবে তাহাকে সমিতি সেক্রেটারী বলে। এই প্রকার সচিব বেতনভূক অথবা অবৈতনিক হইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার সমিতির প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া উহাদের কাজও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। তথাপি প্রায় সমস্ত সচিবকে এই ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। যেমন (১) কার্য্য-নির্বাহকের (২) প্রতিনিধির এবং (৩) পরামর্শদাতার।

কার্য্যনির্বাহক বলিতে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীর কাজ দেখাশুনা, নিয়ন্ত্রণ করা, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান আহ্বান, হিসাবপত্র রক্ষা, ব্যাঙ্কের হিসাব পত্র রক্ষা প্রভৃতিকে বোঝায়।

প্রতিনিধিরূপে তিনি সমস্ত-ব্যাপারে মুখপাত্র হিসাবে সমস্ত কাজ করেন, সমিতির সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন, এবং বিভিন্ন সময়ে সমিতির বিবৃতি প্রচার করেন।

পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি সংবিধান প্রণয়ণ করেন ও সংশোধন করেন, কোন সভ্য নিয়মভঙ্গ করিলে তাহার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে সমিতিকে পরামর্শ প্রদান করেন এবং বিভিন্ন আইনগত ব্যাপারেও সমিতিকে তিনি পরামর্শ দেন।

(গ) **সমবায় সমিতি সচিব** (Secretary of Co-operative Society):—

সমবায় সমিতির আইনে বলা হইয়াছে, "ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সমেত ম্যানেজিং কমিটির নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ যে ব্যক্তি সমবায় সমিতির কার্য্যের ব্যবস্থাপনা করেন অথবা সেক্রেটারীর কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এরূপ যে কোন ব্যক্তি, তাহাকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন এবং তাঁহার কাজ কোন চাকরির চুক্তির অন্তর্গত হোক বা না হোক" তাহাকে সেক্রেটারী বা সচিব বলে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, বাহিরের কোন ব্যক্তি বা ম্যানেজিং কমিটির কোন সদস্য বেতনভুক কর্মীরূপে ঐ সম্পাদক বা সচিব হইতে পারেন।

সচিবের কাজ হইতেছে বিভিন্ন প্রকার যেমন ;

১। সমবায় নিয়ম অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করা। যেমন, হিসাব রক্ষা, চিঠি পত্র লেখা ইত্যাদি।

২। নির্দিষ্ট সময়ে সভা-আহ্বান করা এবং ঐ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র তৈয়ার রাখা।

৩। বিভিন্ন আইনগত ও অন্যান্ন ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান।

৪। সমিতির মুখপাত্র হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠাণের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা এবং

৫। তাহার উপর কোন নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব পাড়লে উহা সম্পাদন করা এবং ঐ সংক্রান্ত রিপোর্ট বা বিবৃতি পেশ করা।

(ঘ) **সাধারণ সংস্থার সচিব** (Public Secretary) :—

বিভিন্ন প্রকার পঞ্চায়েত, পৌরনিগম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাণের সচিবগণ ইহার অন্তগত। এই প্রকার সচিবের পদ আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাণ যেমন, পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্থানে এই প্রকার সচিব নিয়োগ বাধ্যতামূলক। এই প্রকার সচিবের বিভিন্ন প্রকার কাজ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য :—

১। তিনি নিজেই মুখ্য কর্ত্তা হিসাবে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন। তাহা না হইলে তিনি কার্য্য সম্পাদনে বিমুখ হইবেন।

২। তিনিই বাজেট পেশ করিবেন। এই বাজেট পেশ প্রতিষ্ঠাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩। সময় সময় তিনি বিভিন্ন ব্যাপারে আইনগত পরামর্শ প্রদান করিবেন।

৪। তিনি সমিতির মুখপাত্র হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠাণের সহিত প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপন করিবেন।

৫। বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় ও কার্য্য তিনি তদারকি করিবেন এবং

৬। সংস্থার সভা আহ্বান করা এবং ঐ সভার সব রকম বন্দোবস্ত করা তাহার অন্যতম কার্য্য।

যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার মিটিং (Joint Stock Company and its different Kinds of Meeting)

১। **বাধ্যতামূলক মিটিং** (Statutory Meeting):—

প্রতিটি সীমিত দায়যুক্ত সার্বজনিক কোম্পানী ইহার কারবার আরম্ভ করার একমাস পরে ও ছয়মাসের মধ্যে একটা শেয়ার গ্রহীতা গণের সাধারণ সভা ডাকে। এই সভাকে বাধ্যতামূলক সভা বলে। এই সভাতে প্রারম্ভিক কার্য্যাবলী আলোচিত হয় এবং উহার জন্য একটা বিবরণীও পেশ করিতে হয়। এই বিবরণীতে বিলিকৃত শেয়ারের বর্ণনা, হিসাব পরীক্ষকের নাম, পরিচালক বর্গের নাম প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়। এই বিবরণী সভা হইবার অন্ততঃ ২১ দিন পূর্বে বিভিন্ন শেয়ার গ্রহীতাদের

নিকট পাঠাইতে হয়। ইহা না করিলে নির্দিষ্ট দিনের ১৪ দিন পরে শেয়ার গ্রহীতা আদালতে ঐ কোম্পানী গুটাইবার জন্য আবেদন করিতে পারে।

২। **বার্ষিক সভা** (Annual Meeting) :—

প্রত্যেক কোম্পানী বৎসরের শেষে যে সভা আহ্বান করে তাহাকে বার্ষিক সভা বলে।

নতুন কোম্পানীর ক্ষেত্রে কারবার শুরু হইবার পর হইতে ১৮ মাসের মধ্যে এই সভা করিতে হয়। আর পুরাতন কোম্পানীকে একটা সভা শেষ হইবার দিন হইতে ১৫ মাসের মধ্যে আর একটা পরীক্ষক নিয়োগ, লভ্যাংশ ঘোষণা প্রভৃতি হইয়া থাকে। প্রত্যেক শেয়ার গ্রহীতাকে উক্ত বিবরণীর একটা কাপ সভার নির্দিষ্ট তারিখের ২১ দিন পূর্বে পাঠাইয়া দিতে হয়।

৩। **বিশেষ সাধারণ সভা** (Extra-ordinary General Meeting)

কোম্পানীর কোন জরুরী আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এরূপ সভা ডাকা হয়। এই ব্যাপারটা আগত বার্ষিক সভা পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখা যায় না। শেয়ার গ্রহীতাদের নির্দেশ ক্রমে যদি পরিচালকগণ ২১ দিনের মধ্যে সভা আহ্বান না করেন তবে ঐ শেয়ার গ্রহীতারাই এরূপ সভা আহ্বান করিতে পারেন।

সংকল্প ও ইহার শ্রেণী বিভাগ (Resolution and its Classification)

কোন প্রস্তাব সভায় উপস্থিত হইলে এবং উহা সকল সভ্য অথবা সংখ্যাধিক্য দ্বারা গৃহীত হইলে তাহাকে **সংকল্প** বলে।

এই সংকল্প **তিন শ্রেণীর** হইতে পারে যেমন ;

(ক) **সাধারণ ভোটাধিক্যে গৃহীত সংকল্প** (Resolution Passed by Simple Majority)

কোম্পানীর যে কোন সাধারণ কার্য্যাবলী সাধারণতঃ এই প্রকার সংকল্প দ্বারা গৃহীত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দেয় না।

(খ) **বিশেষ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা গৃহীত সংকল্প** (Resolution Passed by Special Notice)

কেহ এই প্রকার সংকল্পে উৎসাহী হইলে তাহাকে কোম্পানীকে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হইবে। অন্যদিকে কোম্পানীও তাহার বিভিন্ন সভ্যকে ৭ দিনের নোটিশ দিয়া ইহা জানাইয়া দিবে। এই প্রকার সংকল্প সাধারণতঃ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে লওয়া হয়।

১। কোন হিসাব পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে।

২। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে কোন ডিরেকটরকে পদচ্যুত করিতে হইলে।

৩। কোন বিশেষ শ্রেণীর ডিরেকট্র নিয়োগে বাঁধা দেওয়ার জন্য ও

৪। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পদচ্যুত ডাইরেকটরের স্থলে অন্য ডাইরেকটর নিয়োগের ক্ষেত্রে।

(গ) **বিশেষ সংকল্প** (Special Resolution)

কোন বিশেষ কারণ বা বিষয় কোম্পানীর সভায় পাশ করাইতে এই বিশেষ সংকল্পের দরকার হয়। এরূপ সংকল্পের জন্য কমপক্ষে ২১ দিনের নোটীশ দিতে হয়। এবং তিন-চতুর্থাংশ সভার ভোটের প্রয়োজন হয়। যদি শতকরা ৯৫ হইতে ১০০ জন সভ্য রাজী থাকে তবে ২১ দিনের কম সময়ে নোটিশ দিয়াও এই সংকল্প গ্রহণ করা যায়। এই সংকল্প গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে উহার লিপি নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিতে হয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য বিশেষ সংকল্প দরকার হয়।

১। কোম্পানীর, নাম, উদ্দেশ্য, রেজিষ্ট্রী অফিসের স্থানান্তরকরণ, মূলধনের হ্রাস প্রভৃতি পরিবর্তনের জন্য বিশেষ সংকল্প দরকার হয়।

২। ডিরেকটরদের দায়িত্ব অসীমিত করা ও সংরক্ষিত মূলধন রাখার জন্য ইহা দরকার হয়।

৩। কোম্পানীর স্থায়ী সম্পত্তি নির্ম্মাণের সময় মূলধনের উপর সুদ প্রদান ও আদালত দ্বারা কোম্পানীর গুটাইবার জন্য ইহা দরকার হয়।

৪। কোম্পানীর কার্য্য-পরিচালনা অনুসন্ধান, অন্য কোম্পানীকে ঋণ প্রদান, প্রভৃতি কারণেও এই বিশেষ সংকল্পের প্রয়োজন হয়।

একটি কোম্পানী সভার সভাপতির কার্য্য এবং ঐ সভা পরিচালনার পদ্ধতি (Functions of the chairman of a Company meeting and the Procedure for the same Meeting).

যে কোন কোম্পানীর আর্টিকেল্‌সে একজন স্থায়ী সভাপতির কথা উল্লেখ থাকে। তাহা না থাকিলে অথবা কোন কারণে তিনি সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে ঐ সভা পরিচালনার জন্য উপস্থিত সভ্যদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়।

এইরূপ সভাপতির কাজ ও ক্ষমতা সংক্ষেপে নিম্নরূপে আলোচনা করা যায় :—

(ক) তিনি সুন্দরভাবে কর্মসূচী অনুযায়ী সভা পরিচালনা করিবেন। প্রয়োজনবোধে কর্মসূচীর ক্রমিক সংখ্যার রদবদল করিতে পারেন।

(খ) সভায় উত্থাপিত সকল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইল কিনা সেটা তিনি দেখিবেন এবং সংখ্যালঘুদের মতামত ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিনা সেটাও দেখিবেন।

(গ) উপযুক্ত সময়ে ও পদ্ধতিতে সভার নোটীশ দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবেন এবং সভায় নূন্যতম সদস্যর উপস্থিতিও দেখিবেন।

(ঘ) তিনি সবশেষে সভার ফলাফল ঘোষণা করিবেন। কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট পড়িলে তিনি 'নির্ণয়' ভোট প্রদান করিবেন।

(ঙ) প্রয়োজন বোধে সভায় তিনি নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিতে পারেন।

সভা পরিচালনার পদ্ধতি :—

১। উপযুক্ত নোটিশসহ ঠিক সময়ে সভা আরম্ভ করিতে হইবে।

২। উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা লইতে হইবে।

৩। গণপূর্তি নির্ধারণ করিতে হইবে।

৪। ভোটদান পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে ও গণনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। গৃহীত প্রস্তাবে সভাপতির স্বাক্ষর গ্রহণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সভার সমাপ্তি ঘোষণা করিতে হইবে।

ভোটদান প্রতিনিধি (Proxy) :—

যদি কোন সভ্য সভায় উপস্থিত থাকিতে না পারেন তবে তিনি লিখিতভাবে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া ভোট দেওয়াইতে পারেন। যে লোককে ভোট প্রদানের জন্য এইরূপ লিখিত ক্ষমতা প্রদান করা হয় তাহাকে ভোটদান প্রতিনিধি বলে। এরূপ ক্ষেত্রে কোম্পানীর নিবন্ধককে অন্ততঃ তিনদিন পূর্বে জানাইতে হয়।

গণপূর্তি (Quorum) :—

যে কোন সভার কাজ আইন সম্মতভাবে করিতে হইলে ঐ সভায় ন্যূনতম সদস্যর উপস্থিতি দরকার হয়। এই সর্বনিম্ন বা ন্যূনতম সদস্য সংখ্যাকে 'গণপূর্তি' বলা হয়। আর্টিকেল্‌সে উল্লেখ না থাকিলে ঘরোয়া কোম্পানীর জন্য ২জন এবং সার্বজনিক কোম্পানীর জন্য পাচ জন সদস্যর উপস্থিতি দরকার হয়।

শেয়ার বাজেয়াপ্ত (Forfeiture) :—

অপরিশোধ্য বিলিকৃত শেয়ারের কোন কিস্তির টাকা ঐ শেয়ার গ্রহীতা দিতে না পারিলে ঐ শেয়ারের মালিক কোম্পানী পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

শেয়ার বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। বাজেয়াপ্ত করার পর ঐ শেয়ার গ্রহীতা তাহার অংশ-প্রদত্ত অর্থের জন্য দাবী করিতে পারে না অর্থাৎ ফেরৎ পায় না।

- **বার্ষিক বিবরণী** (Annual Returns) :—

সাধারণ বার্ষিক সভার ৬০ দিনের মধ্যে ঐ সভার একটি বিবরণী কোম্পানীকে নিবন্ধকের নিকট পেশ করিতে হয়। উহাতে একজন পরিচালকের ও মুখ্য কার্য্য নির্বাহকের সহি থাকে।

এই বিবরণীতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকে :—

কোম্পানীর অফিসের ঠিকানা, শেয়ার ও ঋণপত্রের মূলধনের পরিমাণ, শেয়ার-গ্রহীতা ও ঋণপত্রধারকদের তালিকা, প্রাক্তন ও বর্তমান সভ্যদের নাম, ঠিকানা, পরিচালক ও মুখ্যসচিবের নাম, ঠিকানা, প্রভৃতি।

সভার বিবরণ লিপি বহি (Minutes Book) :—

কোম্পানীর সভায় গৃহীত ও আলোচিত সিদ্ধান্ত বা বিষয় সমূহ যে বহিতে প্রাথমিকভাবে লিখিয়া রাখা হয় তাহাকে সভার বিবরণ লিপি বহি বলে।

কোন একটি কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice of the Annual General Meeting of a Company) :—

এসীয়ান ট্রেডার্স লিমিটেড।

১০, সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

[বার্ষিক সভার বিজ্ঞপ্তি]

এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১৯৭৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কোম্পানীর উপরোক্ত ঠিকানায় শেয়ার গ্রহীতাগণের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ ঐ সভায় আলোচিত হইবে। এবং ১০ই ডিসেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 'ট্রান্সফার বহি' বন্ধ থাকিবে।

১। পরিচালকগণের রিপোর্ট, লাভ-লোকসানের হিসাব, উদ্বৃত্ত পত্র ও নিরীক্ষকের মতামত বিবেচনা।

২। ডিরেক্টর নিয়োগ, হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ ও তাহার পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

৩। অন্যান্য বিষয়।

কলিকাতা	পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশানুসারে
২৬শে নভেম্বর, ১৯৭৪	এ রায়
	সেক্রেটারী।

কোম্পানীর সভায় ডিরেকটরদের আমন্ত্রণ করিয়া উহার কর্মসূচী, সহ সভার একটি বিজ্ঞপ্তি (**Notice with Agenda inviting the Directors to Meeting**) :—

অল ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড।
৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅধীরকুমার রায়
ডিরেক্টর মহোদয় সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন ;

আগামী ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ তারিখে বেলা ৩ ঘটিকার সময় কোম্পানীর উপরোক্ত অফিসে পরিচালকমণ্ডলীর একটা সভা অনুষ্ঠিত হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঐ সভায় আলোচিত হইবে। আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি ইতি—

নিবেদক
এস, কে, দত্ত
সেক্রেটারী

কর্মসূচী :—

১। গত অধিবেশনের সংকল্প সমর্থন।
২। শেয়ারের বিলিকরণ।
৩। বিবিধ।

কোম্পানী ডিরেকটরদের সভার কার্য্য-বিবরণী (**Minutes of Meeting of Directors Board of a Company**) :—

কোন সভার গৃহীত **প্রস্তাব প্রথমে** সংক্ষেপে যে বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তাহাকে বিবরণী বহি বলে। আর ঐ প্রস্তাবকে বিবরণী বলে।

ইহার গুরুত্ব অশেষ। কারণ উহা হইতে পরে সংকল্প প্রস্তুত করা হয় এবং কোম্পানী পরিচালিত হয়। ইহা লিখিয়া না রাখিলে সভার সিদ্ধান্ত কি তাহা যায় না। নীচে এই বিবরণীর একটা উদাহরণ দেওয়া হইল।

গত ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানীর অফিসে **৩ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত পরিচালকমণ্ডলীর সভার কার্য্য-বিবরণী।**

১। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ :—

(ক) এন, এম, রায়

(খ) অজিতকুমার দত্ত

(গ) কমলেশ ত্রিপাঠী

(ঘ) হরিপদ সাহা

(ঙ) বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

(চ) গণেশচন্দ্র রক্ষিত

২। গত ১১।৬।৭৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সংকল্প সমর্থিত।

৩। বিলিকৃত শেয়ারের মূল্য প্রদান ব্যবস্থা।

৪। এরূপ পরবর্তী সভা ১০।১১।৭৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

৫। সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সভার কাজের সমাপ্তি ঘোষণা।

শ্রীনিতাই চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান।

কোম্পানী বিলুপ্তি (Winding up of the Company) :—

যখন কোন কোম্পানী সুস্থভাবে চলিতে না পারে তখন তাহার বিলুপ্তি বাঞ্ছনীয়। এই সময় কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় এবং ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া পাওনাদারকে প্রথম তাহাদের দেনা পরিশোধ করা হয়। অবশিষ্ট অর্থ শেয়ার-গ্রহীতাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এখন এই বিলুপ্তি নিম্নলিখিত **চারটি পদ্ধতির** মাধ্যমে সম্ভব হইতে পারে।

১। **বাধ্যতামূলকভাবে আদালত দ্বারা কোম্পানী বিলুপ্তি (Company winding up by the Court)**

আদালতের নির্দেশে নিম্নলিখিত অবস্থাতে কোম্পানীর বিলুপ্তি ঘটে।

(ক) ঐ বিলুপ্তি ব্যাপারে কোম্পানী কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে।

(খ) কোম্পানী বিধিবদ্ধ সভা করিতে অসমর্থ হইলে অথবা বিধিবদ্ধ বিবরণী পেশ করিতে অক্ষম হইলে।

(গ) কোম্পানী গঠনের দিন হইতে এক বৎসরের মধ্যে কারবার আরম্ভ না করিলে।

(ঘ) সদস্য সংখ্যা সার্বজনিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে পাঁচজনের কম ও ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে দুইজনের কম হইলে।

(ঙ) পাওনাদারের প্রকৃত দেনা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে, অথবা

(চ) অন্য কোন কারণে আদালত উপযুক্ত কারণ মনে করিলে ঐ কোম্পানীর বিলুপ্তি ঘটে।

২। **স্বেচ্ছামূলক বিলুপ্তি** (Voluntry winding up)

ইহা নিম্নলিখিত অবস্থায় হইতে পারে।

(ক) নির্দিষ্ট সময় বা উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানী ঐ সময় ও উদ্দেশ্য শেষ হইলে বন্ধ হইয়া যায়।

(খ) সাধারণ সভায় এই বিলুপ্তির প্রস্তাব গৃহীত হইলে অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিলুপ্তির ব্যাপারে বিশেষ সংকল্প গৃহীত হইলেও এই কোম্পানীর বিলুপ্তি ঘটে।

এই স্বেচ্ছামূলক বিলুপ্তি সদস্যগণও করিতে পারে আবার পাওনাদারগণও করিতে পারে।

৩। **নিবন্ধক দ্বারা বিলুপ্তি** (Winding up by the Registrar)

কোম্পানী যদি তাহার প্রকৃত কারবার না করে তবে নিবন্ধক ঐ কোম্পানীর বিলুপ্তি ঘটাইতে পারে।

৪। **আদালতের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্তি** (Winding up **under the Supervision of the** Court)

স্বেচ্ছাকৃত বিলুপ্তির ক্ষেত্রে পাওনাদার, শেয়ারহোল্ডার প্রভৃতির আবেদনক্রমে আদালত ঐ কোম্পানীর বিলুপ্তির ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করিতে পারে। এবং এরূপ ক্ষেত্রে সমস্ত কাজ আদালতের নির্দেশমত হইয়া থাকে।

যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার বহিপত্র (Various types of **books maintained by a joint stock Company**) :—

কোন একটি যৌথ কোম্পানীর সমস্ত বহি বা খাতা পত্রকে **দুই শ্রেণীতে** ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে বিধিবদ্ধ বহি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বহি বলে। প্রত্যেক যৌথ কোম্পানীকে আইনতঃ প্রথম শ্রেণীর বহি অর্থাৎ **বিধিবদ্ধ বহি** রাখিতেই হইবে। এই সকল বিধিবদ্ধ বহির মধ্যে নিম্নলিখিত বহিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—(১) বিভিন্ন প্রকার সদস্যদের তালিকা বহি, (২) ঋণপত্র

ধারকদের তালিকা বহি, (৩) কোম্পানীর পরিচালক ও কার্য্যনির্বাহকদের তালিকা বহি, (৪) বিভিন্ন প্রকার বন্ধক বহি, (৫) পরিচালকদের শেয়ার তালিকা বহি, (৬) ম্যানেজিং এজেন্টদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বহি, (৭) বিনিয়োগ বহি, (৮) বিভিন্ন প্রকার চুক্তি বহি, (৯) সভার কার্য্যবিবরণী বহি, (১০) হিসাব বহি, প্রভৃতি।

ইহা ছাড়া কোম্পানী যে **পরিসংখ্যান বহি** রাখে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—(১) বিভিন্ন প্রকার শেয়ার আবেদন, বণ্টন ও তলব বহি, (২) শেয়ারের হস্তান্তর বহি, (৩) এই শেয়ার সার্টিফিকেট বহি (৪) শেয়ার ওয়ারেণ্ট এবং বাজেয়াপ্ত করণ বহি (৫) ঋণপত্রের সুদ বহি, (৬) কোম্পানীর সীলমোহর বহি (৭) সভার বিষয়সূচী এবং (৮) পরিচালকদের সভায় উপস্থিতি বহি।

যৌথ মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতি (Method of selling shares of a joint stock company) :—

যৌথ মূলধনী কোম্পানী শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে পারে। এই প্রকার শেয়ার ঐ কোম্পানী বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রয় করিতে পারে। যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে ঐ প্রকার শেয়ার বিক্রয় হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

১। যখন কোন কোম্পানী তাহার শেয়ার বাজারে বিক্রয় করে তখন ঐ শেয়ারের সমস্ত মূল্য একত্রে ক্রেতাদের নিকট হইতে একসাথে আদায় করিয়া লইতে পারে। আবার সমস্ত মূল্য একসাথে আদায় না করিয়া বিভিন্ন কিস্তীর মাধ্যমেও আদায় করিতে পারে। এই বিভিন্ন প্রকার কিস্তির নাম বিভিন্ন প্রকার হয় যেমন আবেদন, আবণ্টন, তলব ইত্যাদি।

২। বিজ্ঞাপনীর মাধ্যমেও কোম্পানী তাহার শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতাগণ কি প্রকারে ঐ শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিবে তাহাও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে শেয়ার ক্রেতাগণ বিজ্ঞাপনীর নিয়ম অনুসারে ঐ শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকে।

৩। কোন কোম্পানী তাহার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। যেমন সমমূল্যে, অধিহারে অথবা অবহারে। যে দামের শেয়ার উহা যদি ঐ দামেই বাজারে বিক্রয় হয় তবে তাহাকে সমমূল্যে শেয়ার বিক্রয় বলে। যদি শেয়ারের মূল্য অপেক্ষা উহা অধিক দামে বাজারে বিক্রয় হয় তবে তাহাকে অধিহারে শেয়ার বিক্রয় বলে আর যে দাম তাহা অপেক্ষা বাজারে কম দামে বিক্রয় হইলে উহাকে অবহারে বিক্রয় বলে। সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠিতে পার যে, এরূপ অবস্থা

হইলে প্রত্যেকটি কোম্পানী তাহার শেয়ার বাজারে অধিহারে বিক্রয় করিতে চাহিবে। কারণ ইহাতে লাভ হয়। কিন্তু ইহা হয় না। ঐরূপ শেয়ার অধিহারে বিক্রয় সম্পূর্ণ কোম্পানীর সুনামের উপর নির্ভর করে। বাজারে কোম্পানীর কোন সুনাম না থাকিলে শেয়ার অধিহারে বিক্রয় হয় না। অপরদিকে কোন কোম্পানী আরম্ভ হওয়ার এক বৎসর পূর্বে তাহার শেয়ার অবহারে বিক্রয় করিতে পারে না। আর এই অবহারে বিক্রয় করিতে হইলে কোম্পানীর সাধারণ সভার অনুমতি এবং আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়।

৪। বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে শেয়ার ক্রয়ের আবেদন আসিলে কোম্পানীর পরিচালকগণ উহা ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া ঐ সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবণ্টন করেন। এই আবণ্টনের ব্যাপারে কোম্পানী আইনে একটা নিম্নতম সময়ের কথা উল্লেখ আছে। বিজ্ঞাপনী প্রচারের পঞ্চম দিনের আগে কোন কোম্পানী তাহার শেয়ার আবণ্টন করিতে পারে না। ইহা মান্য না করিলে ঐরূপ আবণ্টন আইনতঃ গ্রাহ্য হয় না এবং কোম্পানীর মুখ্য কার্য্য নির্বাহক পাঁচহাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানায় দণ্ডিত হইতে পারেন।

৫। বিজ্ঞাপনীতে কোন নূন্যতম মূলধনের কথার উল্লেখ থাকিলে উহা আবেদনের অর্থ হইতে সংগ্রহ করিতে হয় এবং আবেদনকালীন দেয় অর্থের শেয়ারের অভিহিত মূল্যের কম পক্ষে ৫ শতাংশ আদায় করিয়া লইতে হয়।

৬। কোন কোম্পানী তাহার কারবার আরম্ভের অনুমতি পত্র পাওয়ার আগে যদি শেয়ার বিক্রয় করে তবে উহা হইতে প্রাপ্ত অর্থ কোন একটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়।

৭। কোন সার্বজনিক কোম্পানীর নূন্যতম চাঁদা আদায় না হইলে শেয়ার আবণ্টন করিতে পারে না। বিজ্ঞাপনীর দিন হইতে ১২০ দিনের মধ্যে ঐ নূন্যতম চাঁদা আদায় হইতে হইবে অন্যথায় উহা হইতে প্রাপ্ত অর্থ পরবর্তী দশদিনের মধ্যে বিনা সুদে ফেরৎ দিতে হইবে। উহা না করিলে ঐ অর্থের উপর শতকরা ৬ টাকা সুদ দিতে হয়।

৮। কোন কোম্পানী তাহার শেয়ার 'শেয়ার-বাজার' মারফৎ বিক্রয় করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনী প্রচারের ১০ দিনের মধ্যে ঐ শেয়ার বিক্রয় ব্যাপারে শেয়ার বাজার কতৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হয়।

৯। যদি কেহ মিথ্যা নামে শেয়ার ক্রয় করিতে যায় অথবা অপরকে প্ররোচিত করে তবে কোম্পানী আইন অনুযায়ী ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

এই নিয়মটি ১৯৫৬ সালের কোম্পানীর সংশোধনী আইনে বলা হইয়াছে। এ কথাটিও বিজ্ঞাপনীতে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। এবং

১০। শেয়ারের মূল্য সম্পূর্ণ আদায় হইয়া গেলে কোম্পানী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া এবং আভ্যন্তরীণ নিয়ম অনুযায়ী শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার ওয়ারেণ্ট বিলি করিতে পারে। ইহা সম্প্রদেয় দলিল এবং বাহকমাত্রই এই প্রকার দলিলের মালিক হইতে পারে।

শেয়ার হস্তান্তর ও মালিকানার পরিবর্তন (**Transfer and Transmission of Shares**) :—

যে কোন শেয়ার এক হাত হইতে অন্য হাতে হস্তান্তরিত হইতে এবং বিক্রয় দ্বারা ঐ শেয়ারের মালিকানাও পরিবর্তন হইতে পারে। এইরূপ বিক্রয় দ্বারা শেয়ারের মালিকানা পরিবর্তন হইলে তাহাকে শেয়ার হস্তান্তর বলে। কিন্তু উহা ছাড়া যদি অন্যভাবে শেয়ার অপরের কাছে চলিয়া যায় অর্থাৎ মালিকানা পরিবর্তন হয় তবে তাহাকে ঐ শেয়ারের মালিকানার পরিবর্তন বলে। যেমন কোন একজন শেয়ার ক্রেতার দেউলিয়ার ফলে অথবা তাহার মৃত্যুর ফলে উহার মালিকানা ঐসকল ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা পাইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ মালিকানাকে শেয়ারের মালিকানার পরিবর্তন বলে।

কোন শেয়ার বিক্রয় দ্বারা দুইভাবে হস্তান্তরিত হইতে পারে যেমন, (ক) নথিবদ্ধ হস্তান্তর এবং (খ) ফাঁকা হস্তান্তর। নথিবদ্ধ হস্তান্তর করণে ষ্টাম্প প্রয়োজন হয়, শেয়ার সার্টিফিকেট কোম্পানীতে জমা দিতে হয়। ঐ প্রকার হস্তান্তর নামায় ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম থাকে, তাহাদের ঠিকানা এবং বিক্রয়ের দিন থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অর্থাৎ ফাঁকা হস্তান্তর নামায় ক্রেতার নাম, ঠিকানা, তারিখ কিছুই লেখা থাকে না। ইহাতে শুধুমাত্র বিক্রেতার স্বাক্ষর থাকে। ঐরূপ হস্তান্তর নামায় ক্রেতার নাম না থাকায় কোম্পানীর সদস্য তালিকায় ঐ প্রকার ক্রেতার নাম থাকে না এইরূপ হস্তান্তর করণের ঝুঁকি অনেক বেশী। কারণ ঐ দলিল যদি কোন কারণে হারাইয়া যায় তবে কে উহার প্রকৃত মালিক তাহা নিরূপণ করা একটি কঠিন কাজ। সেইজন্য ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে এরূপ ফাঁকা হস্তান্তরকরণের উপর কিছুটা বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। ইহা অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তর হওয়ার ছয়মাসের মধ্যে কোম্পানীর ঘরে ক্রেতার নাম লিখাইয়া লইতে হয়। এবং ঐরূপ হস্তান্তরের সময় ঐ দলিলে শেয়ার বাজার কর্তৃপক্ষের তারিখ থাকিতে হইবে অন্যথায় ঐ প্রকার হস্তান্তর আইনের চক্ষে গ্রাহ্য হইবে না।

শেয়ার ওয়ারেন্ট এবং সার্টিফিকেটের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Share warrant and Share Cerficate) :—

শেয়ার ওয়ারেন্ট এবং সার্টিফিকেটর মধ্যে যে সকল পার্থক্য রহিয়াছে তাহা নিম্নরূপে আলোচনা করা যায় :—

শেয়ার ওয়ারেন্ট	শেয়ার সার্টিফিকেট
১। শেয়ারের মূল্য সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই শেয়ার ওয়ারেন্ট বিলি করা যায় না। সুতরাং শেয়ার ওয়ারেন্ট বলিলেই বোঝায় যে, শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় হইয়াছে।	১। ইহাতে শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। শেয়ারের মূল্য আংশিক আদায় হইলেই এই সার্টিফিকেট আদায় করা যায়। সুতরাং ইহা দ্বারা শেয়ারের সমস্ত মূল্য আদায় বোঝায় না।
২। এই শেয়ার ওয়ারেন্টের মালিকের নাম কোম্পানীর বহি অর্থাৎ সদস্য তালিকায় থাকে না।	২। এই শেয়ার সার্টিফিকেটের মালিকের নাম কোম্পানীর সদস্য তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকে।
৩। ইহা হস্তান্তর করিতে কোন প্রকার ঝামেলা নাই। অর্থাৎ শুধুমাত্র অর্পণ দ্বারা হস্তান্তর করা যায়।	৩। এই সার্টিফিকেট শুধুমাত্র অর্পণ দ্বারা হস্তান্তর করা যায় না। ইহার জন্য বিক্রয় নামা অথবা হস্তান্তর নামার মাধ্যমে করিতে হয়।
৪। এই প্রকার ওয়ারেন্টের মালিকের কোন ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না।	৪। এই প্রকার সার্টিফিকেটের মালিকের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকে।
৫। কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ আইনে বলা না থাকিলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিনা অনুমতিতে এই প্রকার ওয়ারেন্ট বিলি করা যায় না।	৫। শেয়ার সার্টিফিকেট প্রত্যেক শেয়ার গ্রহীতাকে দিতে হয়। উহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অথবা আভ্যন্তরীণ আইনের অনুমতির দরকার হয় না।
৬। কখন কোম্পানী ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য কোন ওয়ারেন্টের মালিকগণ দাবী জানাইতে পারে না।	৬। কোন কারণে প্রয়োজন হইলে এই সার্টিফিকেটের মালিকগণ কোম্পানী ভাঙ্গিয়া দেওয়ার দাবী জানাইতে পারে।

প্রদায়ক (Contributory)

কোম্পানীর বিলুপ্তির সময় যাহারা ঐ কোম্পানীর তহবিলে কিছু অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন তাহাদিগকে প্রদায়ক বলে।

কর্মে-বিরত কোম্পানী (Defunct Company):—

যদি কখনো কোন কোম্পানীর কারবার কোন কারণে বন্ধ হইয়া যায় এবং শেয়ার গ্রহীতাগণ উহা চালু করিতে আগ্রহ প্রকাশ না করে তখন ঐ কোম্পানী কর্মে-বিরত কোম্পানী বলে। কোন কোম্পানী প্রকৃত পক্ষে বন্ধ হইয়াছে কিনা তাহা নিবন্ধিত অফিস হইতে জানা যায় অথবা পরিচালকদের নিকট হইতেও জানিতে পারা যায়।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. কোম্পানী সচিব কাহাকে বলে? তাহার অধিকার, কর্ত্তব্য ও কার্য্যাবলী আলোচনা কর।

(Define Company Secretary. Describe his Rights, duties and Function).

2. কোম্পানী সচিবের প্রয়োজনীয় গুণাবলী আলোচনা কর।

(Describe the necessary Qualification of the Company Secretary).

3. বিভিন্ন প্রকার সচিবের বর্ণনা দাও।

(Discuss different Types of Secretary).

4 যৌথ কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার সভার বিবরণ দাও। সংকল্প কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার সংকল্প আলোচনা কর।

(Give an account of the different Kinds of meeting of a Joint Stock Company. What is a Resolutions ? Discuss different kinds of Resolution).

5. (a) কোন কোম্পানীর সভার সভাপতির কার্য্য ও সভা পরিচালনা পদ্ধতি আলোচনা কর।

(b) কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর।

(a) (Describe the Function of the chairman of a Company and the Procedure for conducting the meeting).

(b) (Draft a notice of the Annual General Meeting of a Company).

6. (a) কোম্পানীর কোন একটি সভায় পরিচালকদের আমন্ত্রণ করিয়া উহার কর্ম্মসূচী সহ সভার একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর।

(b) কোম্পানী ডিরেক্টরদের সভার একটি কার্য্য-বিবরণী প্রস্তুত কর।

(a) Draft a notice with agenda inviting the Directors to a meeting of a Company.

(b) Draft the Minutes of the Meeting of the Board of Director of a Company.

7. কি প্রকারে একটি কোম্পানীর বিলুপ্তি হইতে পারে তাহা লিখ।

(Describe the ways by which a Company may be windup).

8. যৌথ কোম্পানী যে সকল বহি রাখে তাহা আলোচনা কর এবং ঐ প্রকার কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতির বিবরণ দাও।

(Discuss the different Kinds of books maintained by a Joint Stock Company and also discuss the various procedures of Selling Shares by a Joint Stock Company).

9. টীকা লিখ :—

(ক) শেয়ার হস্তান্তর ও মালিকানার পরিবর্তন। এবং

(খ) শেয়ার সার্টিফিকেট ও ওয়ারেন্টের মধ্যে পার্থক্য।

Write notes on :—

(a) Transfer and Transmission of Shares and

(b) Distinction between Share certificate and Share warrant.

10. সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

(a) ভোটদান প্রতিনিধি, (b) গণপূর্তি, (c) শেয়ার বাজেয়াপ্ত, (d) বার্ষিক-বিবরণী, (e) সভার বিবরণী বহি, (f) প্রদায়ক ও (g) কর্ম্মে-বিরত কোম্পানী।

Write notes on :—

(a) Proxy, (b) Quorum, (c) Forfeiture of Shares, (d) Annual Returns, (e) Minutes Book, (f) Contributory, and (g) Defunct Company.

কারবারী জোট

(Business Combination)

কারবারী জোটের অর্থ ও কারণ (Meaning and Causes of Business Combination) :—

একই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যখন একাধিক সমস্বার্থবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান একত্রিত বা মিলিত হইয়া ব্যবসা পরিচালনা করে তখন তাহাকে **কারবারী জোট** বলে।

একই স্বার্থবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে একত্রীভূত অথবা জোটবদ্ধ হইয়া থাকে :—

১। **প্রতিযোগিতা** (Competition) :—

প্রতিযোগিতা কারবারের মূলমন্ত্র। এই প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে না পারার জন্য অনেক ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়। আবার প্রতিযোগিতার দ্বারা অনেক প্রতিষ্ঠান প্রচুর মুনাফা অর্জন করিতে সক্ষম হয়। ছোট কারবারী প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সেজন্য তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অন্যান্য ছোট ছোট কারবারীর সহিত হাত মেলায়। ইহার দ্বারা একত্রে তাহারা প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করিতে পারে। সেজন্য প্রতিযোগিতাকে কারবারী জোটের অন্যতম কারণ বলে।

২। **চাহিদা ও উৎপাদনের সমতা** (Demand and Supply Equilibrium) :—

বাজারে প্রতিযোগিতা থাকিলে উৎপাদকগণ নিজ নিজ বুদ্ধিতে পণ্য উৎপন্ন করে। এমন কি উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রচুর পণ্য বাজারে আসে। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হওয়ায় বাজারে দাম কমিয়া আসে। ইহাতে মুনাফা হ্রাস পায়। এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবসায়ী একত্র হইয়া অর্থাৎ জোট সৃষ্টি করিয়া বাজারের চাহিদা ও যোগানের সমতা রক্ষা করে। ফলে মুনাফাও বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য ইহাকেও কারবারী জোটের অন্যতম কারণ বলা হয়।

৩। **অধিক উৎপাদনের সুবিধা** (Advantages of Large-Scale Production) :—

কারবার বৃহদায়তনে হইলে বিভিন্ন প্রকার সুবিধা উহা হইতে পাওয়া যায়। পণ্যক্রয়, কারিগরী, পরিচালনা, পরিবহণ প্রভৃতিতে খরচ অনেক কম হয়। ইহার সুবিধা পাওয়ার জন্য অনেক উৎপাদন সংস্থা জোটবদ্ধ হইয়া থাকে।

৪। **বাণিজ্য চক্র** (Business Cycle) :—

ব্যবসায়ের উন্নতি ও মন্দা দেখা যায়। উন্নতির সময় প্রচুর নতুন অংশীদার গ্রহণ করা হয়। ব্যবসা বিস্তৃতি লাভ করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মন্দার সময় দ্রুত উহা হ্রাস করা যায় না। মন্দার সময় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তখন বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সহিত মিলিত ভাবে কাজ করে। ইহার ফলে কারবারী জোটের সৃষ্টি হয়।

৫। **সরকারী নীতি** (Government Policy) :—

অনেক সময় জনগণকে অধিক সেবা করার জন্য সরকার ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দিয়া থাকেন। যেমন ছোট ছোট প্রতিযোগিতা না করিয়া সংঘবদ্ধ হইতে পারে। ইহাতে খরচ কম হয়। ভালভাবে ব্যবসা চলিতে পারে এবং কমমূল্যে ভাল পণ্য জনগণকে সরবরাহ করিতে পারে। ইহার ফলেও জোটের সৃষ্টি হয়।

৬। **বিদেশী পণ্যর সহিত প্রতিযোগিতা** (Foreign Competition) :—

অনেক সময় বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বাজার নিজেদের হাতে রাখিবার জন্যও দেশীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ সংঘবদ্ধ হয়। ইহার ফলেও কারবারী জোটের সৃষ্টি হয়।

৭। **শুল্কনীতি** (Tariff Policy) :—

সরকার শিশুশিল্পকে রক্ষার জন্য সরকার শুল্কনীতি গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে যখন উহা তুলিয়া দেয় তখন শুল্কাশ্রিত শিল্পগুলি আর ঐ সঙ্ঘের বাহিরে যায় না। একত্রে কাজ করে ফলে জোটের সৃষ্টি হয়।

৮। **সরকারী অর্থনীতি** (Govt. Economic Policy) :—

সরকারী অর্থনীতি অনেক সময় শিল্পের স্বার্থের বিপক্ষে চলিয়া যায়। ইহার প্রতিবাদ জানাতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সংঘবদ্ধ হইয়া কারবার পরিচালনা করে। ফলে কারবারী জোটের সৃষ্টি হয়।

৯। **পরিবহণের উন্নতি** (Improvement of Transport) :—

বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে আমাদের দেশের পরিবহণ ব্যবস্থাও উন্নত হইয়াছে। ফলে বিভিন্ন কারবার বিশ্বব্যাপী হইয়াছে। এক্ষেত্রেও বাজারে নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরিবহণ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে আর এই পরিবহণের সহায়তার ফলেই বিভিন্ন কারবারী জোটের সৃষ্টি হইয়াছে।

উক্ত কারণসমূহ ছাড়া অন্যান্য কারণ সমূহ যাহা জোট সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে **নিম্নোক্তগুলিই** প্রধান :—

প্রতিযোগিতায় ক্ষমতাবৃদ্ধি, পেটেণ্ট আইন, লগ্নির চাপ, বিক্রয়ের আধিপত্য, ক্ষমতার লোভ, সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি অন্যতম।

কারবারী জোটের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and demerits of Combination) :—

সুবিধা (Merits) :—

১। এই প্রকার জোটের দ্বারা ছোট ছোট কারবারী একত্রীভূত হইয়া অধিক পুঁজিতে কাজ করিতে পারে।

২। অধিক মূলধন থাকায় তাহারা উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে। ইহাতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কম হয়।

৩। একত্রে কাজ করিলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পরিবহণে, কাঁচাপণ্য ক্রয়ে, বিক্রয়ে প্রভৃতিতে অনেক সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

৪। জোটের দ্বারা পরিচালনা উন্নত হয়, দক্ষ পরিচালক সৃষ্টি হয়, এবং ব্যবসায়ের স্থির খরচ হ্রাস পায়।

৫। জোটভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রে বাজারের চাহিদানুযায়ী পণ্য সরবরাহ করিতে পারে। ফলে ক্রেতাগণ উপকৃত হয়।

৬। জোটভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রে প্রচুর পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিতে পারে ফলে দেশের বেকার সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

৭। অর্থনৈতিক চিন্তা না থাকায় জোটভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কারবারের উন্নতি সাধনে বিভিন্ন প্রকার গবেষণা করিতে পারে।

৮। দেশী-বিদেশী জোটগঠনের দ্বারা কারিগরি জ্ঞান ও পেটেণ্ট প্রভৃতি বিনিময় হইতে পারে।

অসুবিধা (Demerits) :—

১। অধিক মুনাফা লাভের জন্য কারবারী জোট পণ্যের জন্য অধিক মূল্য দাবী করে।

২। বাজার দখল ও প্রতিযোগীকে বিনষ্ট করার জন্য অনেক সময় কারবারী জোট অসদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকে।

৩। শ্রমিককে কম মজুরী দিয়া এই জোট শ্রমিক শোষণ করিয়া থাকে।

৪। শাসকদলকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া জোটভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রচুর মুনাফা লাভ করে। ইহাতে দেশের রাজনীতি কলুষিত হয়।

৫। প্রচুর পুঁজি থাকার জন্য এই জোট ফট্‌কা কারবারকে সাহায্য করে।

৬। কারবার জোটভুক্ত হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয় না। কারণ ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিযোগী থাকে না।

৭। জোটের ফলে কারবার বড় হয়। ফলে পরিচালনা অনেক সময় সুষ্ঠু নীতিতে হইতে পারে না।

৮। জোটভুক্ত কারবারী বিভিন্ন বাজার নিজেদের ভিতরে ভাগ করিয়া লইয়া অনেক সময় পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে।

৯। দেশী বিদেশী জোটের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে, জোটভুক্ত প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এমনকি জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার জোট (Different Kinds of Combination) :—

পূর্বাপর জোট (Vertical Combination) :—

কোন পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি অথবা বিভিন্ন স্তরগুলি একত্রিত হইয়া কোন জোট সৃষ্টি করিলে তাহাকে **পূর্বাপর জোট বলে**। যদি একটি ইস্পাত কারখানা লৌহ ও কয়লার সহিত যুক্ত হয় আর রেল-পরিবহণ সংস্থা আসিয়া উহাদের সহিত মিলিত হয় তবে উহা পূর্বাপর জোট সৃষ্টি করে। ভারতে **টাটা কোম্পানী** এই প্রকার জোটের একটি উদাহরণ। আবার কোন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উহার বিক্রয় নিজ হস্তে গ্রহণ করিলে অথবা কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উহা হইতে পণ্য উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাহাকে **সম্মুখগামী** পূর্বাপর জোট বলে। **বাটা** জুতা কোম্পানী ইহার উদাহরণ।

অন্যদিকে কোন পণ্য-উৎপাদন কারী প্রতিষ্ঠান যদি কাঁচা মাল উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয় অথবা পণ্য-উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

যুক্ত হয় তখন তাহাকে **পশ্চাৎগামী** পূর্বাপর জোট বলে। **ট্রাষ্ট** এই প্রকার জোটের উদাহরণ।

পূর্বাপর জোটের উদ্দেশ্য, সুবিধা ও অসুবিধা (Object, Advantages and Dis-advantages of Vertical Combination)

উদ্দেশ্য (Object) :—

সাধারণত কাঁচামালের সুবিধা, কারিগরি সুবিধা, ও কারবারের ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার জন্য এই জোটের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

সুবিধা (Advantages) :—

১। কাঁচামাল, পণ্য-উৎপাদন, বিক্রয় প্রভৃতি এই জোটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই প্রকার জোট আত্মনির্ভর হইতে পারে।

২। উৎপাদন ও বিক্রয় ইহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া প্রতিটি স্তরে ব্যয় সংকোচ হইয়া থাকে।

৩। ইহাতে কাঁচামালের কোন অসুবিধা বা অভাব দেখা যায় না।

৪। এই পদ্ধতিতে মধ্যবর্তী লোক অর্থাৎ দালাল শ্রেণীর লোক থাকে না। ইহাতে বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তাহাদের রুচিমত পণ্য উৎপাদন করা যায়।

৫। ইহাতে ব্যবসার মন্দার বেগ থাকে না। কারণ প্রতিটি কারবার এই প্রকার জোটে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে।

৬। পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ইহাতে অনিশ্চিয়তা অনেক কম।

অসুবিধা (Dis-advantages) :—

১। এই প্রকার কারবারে প্রচুর মূলধনের দরকার হয়। ইহা ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে একটা সমস্যা।

২। কোন একটি স্তরে কোন গণ্ডগোল দেখা দিলে সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

৩। বাস্তবে ইহাতে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়া যায় না। কারণ ইহার বিভিন্ন কারবারগুলির উৎপাদনের প্রকৃতি বিভিন্ন।

৪। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংযোজন ও ভারসাম্য রক্ষা করা যায় না।

সমান্তরাল জোট (Horizontal Combination) :—

একই পণ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্রীভূত হইলে তাহাকে **সমান্তরাল জোট বলে**। ইহাকে আবার সমশিল্প জোটও বলে। এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানী, দুর্গাপুর, রুরকেল্লা ও ভিলায়ের ইস্পাত কারখানাগুলি এই প্রকার জোটের উদাহরণ।

সমান্তরাল জোটের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, সুবিধা ও অসুবিধা (Nature, Object, Advantages and Dis-Advantages of Horizontal Combination)

প্রকৃতি (Nature) :—

এই প্রকার জোটের প্রকৃতি ইহতেছে সমগোষ্ঠী সম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ।

উদ্দেশ্য (Object) :—

প্রতিযোগিতা হ্রাস, বিক্রয় ব্যয় হ্রাস, বাজার বিভাজন, পণ্যর মূল্যের ও পরিমাণের স্থিরতা রক্ষাই এই প্রকার জোটের উদ্দেশ্য।

সুবিধা (Advantage) :—

১। ইহাদ্বারা বাজারের সমস্ত পণ্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২। ইহতে পণ্যর উৎপাদন খরচ অনেক হ্রাস পায়।

৩। ইহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একটি মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

৪। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস করিতে পারে।

৫। গবেষণা চালাইয়া এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান লাভবান হইতে পারে।

৬। ইহার গঠন পূর্বাপর জোট অপেক্ষা অনেক সহজ।

অসুবিধা (Dis-Advantages) :—

১। কাঁচামালের উপর ইহার কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় উৎপাদন ক্ষেত্রে ভীষণ অসুবিধা দেখা যায়।

২। এই পদ্ধতিতে বিক্রয় সংস্থার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

৩। এই পদ্ধতিতে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয়।

৪। এই প্রকার জোটের মাধ্যমে দেশের রাজনীতি ও সরকারের উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তৃত হয়।

পার্শ্বিক জোট (Lateral Combination) :—

যদি কোন প্রতিষ্ঠান তাহার কাজের সহিত লিপ্ত একই কার্যে নিযুক্ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হয় তবে তাহাকে **পার্শ্বিক জোট** বলে। একটি বাস ও ট্রাম কোম্পানী অথবা স্টীমার ও রেল কোম্পানী যদি একত্রীভূত হয় তবে তাহাকে পার্শ্বিক জোট বলে। ইহাকে আবার কেহ কেহ কোনাকুনি জোট বলে।

আঞ্চলিক জোট (Territorial Combination) :—

কাঁচাপণ্যের দাম কমানো, পরিবহণের সুবিধা, বাজার সুসংগঠিত করণ প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন দেশের পণ্য-উৎপাদনকারী সংস্থা সমূহ একত্রীভূত হইলে তাহাকে **আঞ্চলিক জোট** বলে। বিভিন্ন বাজারে আধিপত্য বিস্তার ও পরিবহণ ব্যয় হ্রাসই এই প্রকার জোটের প্রধান উদ্দেশ্য।

বৃত্তাকার জোট (Circular Combination):—

গৌণ সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন জোট গঠিত হইলে তাহাকে বৃত্তকার জোট বলে। যেমন, ম্যানেজিং এজেন্সীর দ্বারা চা-বাগান ও পাট শিল্পের মধ্যে সংযুক্তিকরণ অন্যতম উদাহরণ।

অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি (Simple or Informal Agreement) :—

বাজার বণ্টন, বিক্রয়, মুনাফা, পণ্যমূল্য লইয়া যদি নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়ীগণ চুক্তিবদ্ধ হয় তবে তাহাকে অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি বলে। সাধারণত মৌখিক অঙ্গীকারের দ্বারাই ইহা হয়। বিশ্বাসই এই চুক্তির মূলমন্ত্র। কেহ চুক্তিভঙ্গ করিলে আইনত কিছু করার নাই। সেজন্য ইহা অতি ক্ষণস্থায়ী হয়।

সুবিধা (**Advantages**) :—

১। ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম হয়।

২। ইহাতে আইনের কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

৩। নির্দিষ্ট বাজারে সদস্যরা নিজ নিজ পণ্য বিক্রয় করিতে পারে।

৪। মূল্য ও উৎপাদন সম্পর্কে সভ্যরা একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারে।

৫। পৃথক পৃথক স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি পণ্য উৎপাদন করিতে পারে।

৬। ক্রেতারা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পণ্য পাইয়া থাকে।

অসুবিধা (Dis-Advantages) ঃ—

১। ইহা অতি ক্ষণস্থায়ী। কারণ ইহাতে আইনগত কোন চুক্তি থাকে না।

২। ইহাতে একচেটীয়া কারবারের উৎপত্তি হয়।

৩। চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দক্ষ ও অদক্ষ প্রতিষ্ঠান থাকা সত্বেও তাহা বাহির অথবা নির্ণয় করা যায় না।

৪। অনেক সময় অধিক মুনাফা লাভের আশায় কোন প্রতিষ্ঠান বেশী দামে পণ্য বিক্রয় করিলে অথবা চুক্তিভঙ্গ করিলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা লইতে পারে না। কারণ আইনগত কোন চুক্তি ইহাতে থাকে না। ফলে ইহাতে গোপণভাবে অন্যায় দেখা দেয়।

উৎপাদক সংঘ (Pool) ঃ—

উৎপাদন, মুনাফা, বাজারদর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যখন প্রতিষ্ঠানগুলি সংঘবদ্ধ হয় তখন তাহাকে **উৎপাদক সংঘ** বলে।

উদ্দেশ্য ভিত্তিতে গঠিত এই উৎপাদক সংঘকে **নিম্নলিখিত শ্রেণীতে** বিভক্ত করা যায় :—

(ক) **বাজার সংঘ** (Market Pool) ঃ—

এই পদ্ধতিতে সমগ্র বাজারকে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া সংঘ হইতে পারে। ইহাতে সদস্যরা নিজ নিজ বাজারে তাহাদের পণ্য নিশ্চিন্তায় বিক্রয় করিতে পারে।

(খ) **উৎপাদন সংঘ** (Output Pool) ঃ—

অতি উৎপাদন দূর করিয়া বাজারে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করিয়া মুনাফা অর্জ্জনের জন্য যদি ব্যবসায়ীরা জোট বদ্ধ হয় তবে তাহাকে **উৎপাদন সংঘ** বলে। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণই এই সংঘের মূল উদ্দেশ্য।

(গ) **মুনাফা সংঘ** (Profit Pool) ঃ—

নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া ঐ বিক্রীত অর্থ সংঘের তহবিলে জমা দিতে হয়। পরে ঐ মুনাফার অংক উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন উৎপাদককে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

(ঘ) **আয় সংঘ** (Income Pool) ঃ—

ইহাতেও সদস্যগণ তাহাদের বিক্রয় লব্ধ অর্থ সংঘের নিকট অর্পণ করে। পরে উৎপাদন খরচ বাদ দিয়া ঐ অর্থ সকলের মধ্যে উৎপাদন ভিত্তিতে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

(ঙ) **অর্থ সংঘ** (Money Pool) :—

ইহাদ্বারা একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করা হয়। এই কেন্দ্রীয় সংস্থা সমস্ত পণ্যের অর্ডার গ্রহণ করিয়া সভ্যদের মধ্যে নিম্নতম মূল্যে পণ্যের সরবরাহ করার আদেশ দেয়। পরে উহা হইতে উপার্জিত অর্থ সভ্যদের বণ্টন করিয়া দেয়।

(চ) **পেটেণ্ট সংঘ** (Patent Pool) : —

এই সংঘের সদস্যগণ চুক্তিদ্বারা নিজেদের পেটেণ্টের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে আর প্রচুর বিক্রয় বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

(ছ) **মিশ্র সংঘ** (Mixed Pool) :—

একাধিক উদ্দেশ্যে কোন সংঘ গঠিত হইলে তাহাকে মিশ্র সংঘ বলে।

উৎপাদক সংঘের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা (Features, Advantages and Dis-advantages) :—

বৈশিষ্ট্য (Features) :—

১। ইহাতে আইনের বাধা-বাধকতা নাই।

২। ইহা ইচ্ছাধীন ও ক্ষণস্থায়ী

৩। ইহাতে সভ্যদের পৃথক সত্তা নষ্ট হয় না।

৪। কেহ সর্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে কিছু জরিমানা দিতে হতে পারে।

সুবিধা (Advantages) :—

১। ইহা খুব সহজে গঠন করা যায়।

২। সদস্যগণ নিজ নিজ সত্তা বজায় রাখিয়া উৎপাদন করিতে পারে।

৩। ইহাতে বৃহদায়তন শিল্পের অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

৪। ইহাতে প্রতিযোগিতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

৫। প্রচুর মূলধন লইয়া কারবার করা যায়।

৬। উৎপাদন ও পরিবহণ খরচ ইহাতে অনেক কম।

অসুবিধা (Dis-Advantages) :—

১। কম মূল্যে পণ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে গঠিত হইলেও পরবর্ত্তীকালে ইহা একচেটীয়া কারবারে পরিণত হয়। কারণ মুনাফা অর্জ্জনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে।

২। আইনগত কোন বাঁধা না থাকায় ইহা ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং জনগণের আস্থা হারাইয়া ফেলে।

৩। ইহাতে অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না।

৪। গোপনে সদস্যগণ এই প্রকার প্রতিষ্ঠানে অনেক চুক্তিভঙ্গ করে।

ট্রাস্ট (Trust) ঃ—

ইহার অর্থ ও বৈশিষ্ট্য (Meaning and Feature) ঃ—

যৌথ কোম্পানীর শেয়ার-গ্রহীতাগণ যদি উহা পরিচালনার জন্য তাহাদের শেয়ার কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পণ করে তবে তাহার দ্বারা যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তাহাকে **ট্রাস্ট** বলে।

এই ট্রাস্টের **বৈশিষ্ট্যগুলি** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

১। শেয়ার হস্তান্তর দ্বারা কোম্পানীর সত্তা নষ্ট হয় না।

২। ইহাদ্বারা ভোটিং ট্রাস্ট, শেয়ার ট্রাস্ট, কারবারী ট্রাস্ট সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৩। ট্রাস্টের পরিচালকগণ একাধিক ট্রাস্টের মালিক হয়।

ট্রাস্টের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Dis-Advantages) ঃ—

সুবিধা (Advantages) ঃ—

১। সুসংহত হওয়ার জন্য ইহা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া উঠে।

২। বৃহদায়তনের সুবিধা ইহাতে পাওয়া যায় এবং উৎপাদনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।

৩। কেন্দ্রীয় পরিচালনায় পণ্যের মান রক্ষা অনেক সহজ হয়।

৪। ইহাতে পুঁজির কোন অভাব হয় না। সুতরাং কাজেও কোন অসুবিধা হয় না।

৫। ইহাতে প্রতিযোগিতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

অসুবিধা (Dis-Advantages) :—

১। ইহা সহজে পরিবর্তনশীল নহে।

২। ইহার গঠন পদ্ধতি জটিল ও ব্যয়বহুল।

৩। প্রচুর মূলধন থাকায় ইহাতে বিনিয়োগ সমস্যা দেখা যায়।

৪। উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকায় ইহা পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।

কার্টেল (Cartel) :—

ইহার অর্থ, প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য (Meaning, Types and Features) :—

পণ্য সরবরাহ, বিক্রয়, বাজার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে যখন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তখন তাহাকে **কার্টেল** বলা হয়। পুল ও কার্টেলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই। আমেরিকায় যাহা 'পুল' বলিয়া পরিচিত, জার্মানীতে তাহাকেই কার্টেল বলে।

পুলের ন্যায় কার্টেলও **বিভিন্নপ্রকার** হইতে পারে যেমন ;

(ক) শর্ত কার্টেল, (খ) উৎপাদন কার্টেল, (গ) গুণগত কার্টেল, (ঘ) বাজার কার্টেল, (ঙ) ট্রাফিক কার্টেল প্রভৃতি।

কার্টেলের **বৈশিষ্ট্যগুলি** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

১। প্রত্যেক সদস্যদের পৃথক ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে।

২। উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

৩। সদস্যদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহা হস্তক্ষেপ করে না।

কার্টেলের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Dis-Advantages) :—

সুবিধা (Advantages) :—

১। অল্পব্যয়ে, সহজে ও দ্রুত ইহা গঠন করা যায়।

২। বাজারের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সমতা রাখিয়া পণ্য উৎপাদন করা যায়।

৩। ইহাতে বিভিন্ন সদস্য প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র বজায় থাকে।

৪। ইহাতে মূলধন আধিক্যের সম্ভবনা থাকে না।

৫। ইহার সদস্যগণ নিশ্চিন্তায় পণ্য উৎপাদন করিতে পারে।

৬। কাঁচামাল ক্রয়ে ও পরিবহণের ব্যাপারে এরূপ প্রতিষ্ঠাণ অনেক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে।

অসুবিধা (Dis-Advantages) :—

১। স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া কাহাকেও জোর করা যায়। যে কোন সময় কোন সভ্য চলিয়া গেলে ব্যবসায়ের বুনিয়াদ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

২। ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত কারণ ইহা স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান।

৩। ইহারা অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া অধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। ইহা সমাজের পক্ষে ক্ষতি কর।

৪। অনেক ক্ষেত্রে সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে গিয়া কার্টেল পণ্য উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে পারে না।

৫। এইরূপ কার্টেল হইতেই একচেটীয়া কারবারের সৃষ্টি হয়।

হোল্ডিং কোম্পানী (Holding Company) :—

ইহার অর্থ, শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য (**Meaning, Types, and Feautures**) :—

কোন একটি কোম্পানী অন্য একাধিক কোম্পানীর "অধিকাংশ" শেয়ারের মালিক হইয়া ঐ সকল কোম্পানীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিলে তাহাকে **হোল্ডিং কোম্পানী** বলে।

এই হোল্ডিং কোম্পানী **বিভিন্ন শ্রেণীর** হইতে পারে যেমন ;

(১) মূল হোল্ডিং কোম্পানী, (২) মধ্যবর্তী হোল্ডিং কোম্পানী, (৩) মিশ্র হোল্ডিং কোম্পানী, (৪) বিশুদ্ধ হোল্ডিং কোম্পানী, (৫) আদি হোল্ডিং কোম্পানী ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য সমূহ (Features) :—

১। অন্য কোম্পানীর কমপক্ষে শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ারের মালিক হইতে হইবে।

২। মোট ভোটের শতকরা ৫১ ভাগ ইহাকে অর্জণ করিতে হইবে।

৩। ইহার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কোম্পানীর পৃথক সত্তা থাকে।

৪। যে সকল কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডিং কোম্পানীর ক্রয় করে তাহাদিগকে অধীন কোম্পানী বলে।

৫। শেয়ার বিনিময় অথবা ক্রয় পদ্ধতিতে হোল্ডিং কোম্পানী সৃষ্টি হয়।

সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Dis-Advantages) :—

সুবিধা (Advantages) :—

১। সহজেই ইহা গঠিত হইতে পারে।

২। অল্প অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা অন্য কোম্পানীর উপর কর্তৃত্ব করা যায়।

৩। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়।

৪। কেন্দ্রীয় পরিচালনার দ্বারা পরিচালন ব্যয় হ্রাস পায়।

৫। অধীনস্থ কোম্পানীর স্বাতন্ত্র নষ্ট না হওয়ায় উহার পুনর্গঠন সহজ হয়।

৬। ইহা বৃহদায়তনের সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

৭। প্রয়োজনে অধীনস্থ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিয়া লোকসান হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

৮। আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে কেহ একচেটীয়া কারবার বলিয়া মনে করে না। ফলে সমালোচনার সম্মুখীনও হইতে হয় না।

অসুবিধা (Dis-Advantages) :—

১। অধীনস্থ কোম্পানী এই পদ্ধতিতে নানারকম অসাধু পদ্ধতির সাহায্য লয়।

২। অনেক সময় পুঁজির অভাবে বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৩। অধীনস্থ কোম্পানীর সুবিধার কথা চিন্তা না করিয়া অনেক সময় হোল্ডিং কোম্পানী নিজের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে।

৪। অনেক সময় এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন অধীনস্থ কোম্পানীর আর্থিক লেনদেনে হিসাবের গরমিল সৃষ্টি করে।

৫। ইহাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে এবং একচেটিয়া কারবারের গোড়া পত্তণ করে।

৬। অনেক সময় ইহারা অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করে ফলে কারবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ট্রাস্ট ও হোল্ডিং কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Trust and Holding Company) :—

ট্রাস্ট	হোল্ডিং কোম্পানী
১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে জন্মস্থানেই ইহা বে-আইনী ঘোষিত হয়।	১। ট্রাস্ট বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পরে ইহার উৎপত্তি হয়। ইহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নি।
২। ইহার গঠন জটিল।	২। ইহার গঠন সহজ।
৩। অছিরা ইহা পরিচালিত হয়।	৩। পরিচালক দ্বারা ইহা পরিচালিত হয়।

ট্রাস্ট	হোল্ডিং কোম্পানী
৪। ইহা কোন কোম্পানী নহে।	৪। ইহা একটি যৌথ কোম্পানী।
৫। শেয়ার সমর্পণ দ্বারা ইহাতে মালিকানা পরিবর্তিত হয় না।	৫। শেয়ার দ্বারাই ইহাতে মালিকানা পরিবর্তীত হয়।
৬। ইহা চুক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয়।	৬। ইহা আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়।
৭। নিজস্ব লাভের আশায় ইহা গঠিত হয় না।	৭। নিজস্ব লাভের আশায় হোল্ডিং কোম্পানী গঠিত হয়।
৮। চুক্তির মেযাদ শেষ হওয়ার আগে ট্রাস্টের বিলোপ হয় না।	৮। যে কোন সময় শেয়ার বিক্রয় দ্বারা হোল্ডিং কোম্পানীর বিলোপ সাধন হইতে পারে।

ট্রাস্ট ও কার্টেলের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Trust and Cartel)

ট্রাস্ট	কার্টেল
১। ইহার গঠন জটিল ও আইন সাপেক্ষ।	১। ইহার গঠন সহজ এবং আইনগত কোন বাধা নাই।
২। ট্রাস্ট কেবলমাত্র যৌথকারবার হইতে সৃষ্টি হইতে পারে।	২। যে কোন মালিকানা ও প্রতিষ্ঠান হইতে কার্টেল সৃষ্টি হইতে পারে।
৩। অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থার স্বাধীনতা ইহাতে ক্ষুন্ন হয়।	৩। ইহাতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় না।
৪। ইহার স্থায়িত্ব অনেকদিনের হয়।	৪। ইহার স্থায়িত্ব অল্পদিনের।
৫। বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা ইহাতে দেখা যায়।	৫। কেবলমাত্র বিক্রয় ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা ইহাতে পাওয়া যায়। অন্য ক্ষেত্রে নহে।

ট্রাস্ট	কার্টেল
৬। ইহাতে যোগদানকারী কোন প্রতিষ্ঠান সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে না।	৬। ইহাতে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠান সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে।
৭। ইহার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপণা কেন্দ্রীভুত হয়।	৭। ইহাতে কেন্দ্রীভূত পরিচালনা অথবা ব্যবস্থাপনা দেখিতে পাওয়া যায় না।
৮। দেশের মধ্যে সাধারণত ইহা সীমাবদ্ধ থাকে।	৮। ইহা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়া থাকে।
৯। যুক্তরাষ্ট্রে ইহার উৎপত্তি হয়।	৯। জার্মানীতে ইহার উৎপত্তি হয়।
১০। এই ট্রাস্ট যুক্তরাষ্ট্রে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।	১০। জার্মানীতে ইহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই।

ম্যানেজিং এজেণ্ট ও হোল্ডিং কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Managing Agent and Holding Company) :—

ম্যানেজিং এজেণ্ট।	হোল্ডিং কোম্পানী
১। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইহা হইতে পারে।	১। শুধুমাত্র যৌথ কোম্পানীর দ্বারা ইহা সম্ভব।
২। ইহাতে শেয়ার ক্রয়ের প্রশ্ন না থাকিতেও পারে।	২। ইহাতে শেয়ার ক্রয় একান্ত প্রয়োজন।
৩। কাজের জন্য লভ্যাংশের একটা অংশ ইহারা লইয়া থাকে—পারিশ্রমিক হিসাবে।	৩। পারিশ্রমিক হিসাবে ক্রীত শেয়ারের উপর লভ্যাংশ পাইয়া থাকে।
৪। বিভিন্ন প্রকারের বাধা নিষেধ ইহার উপর কোম্পানী আইন দ্বারা আরোপিত হইয়াছে।	৪। ম্যানেজিং এজেণ্টের মত ইহার উপর বেশী বাধা নিষেধ কোম্পানী আইন দ্বারা আরোপিত হয়নি।

ম্যানেজিং এজেন্ট	হোল্ডিং কোম্পানী
৫। চুক্তির বলে কোম্পানীর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ভার ইহার উপর অর্পিত হয়।	৫। শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন ভার গ্রহন করিতে হয়।
৬। অর্থসংস্থান ও কোম্পানীর প্রবর্তনই ইহার প্রধান কাজ।	৬। শেয়ার ক্রয়দ্বারা অধীনস্থ কোম্পানীর উপর কর্তৃত্ব প্রকাশই ইহার প্রধান কাজ।
৭। ভারত ছাড়া এরূপ ব্যবস্থা কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।	৭। শুধু ভাবতে নয়, বিভিন্ন দেশেও এরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক জোটের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা (Comparative Merits and De-merits of Voluntary and Compulsory Combination) :—

কোন প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় কোন জোটভুক্ত হইলে তাহাকে স্বেচ্ছামূলক জোট বলে। আর যখন সরকারী নির্দেশে জোটবদ্ধ হয় তখন তাহাকে বাধ্যতামূলক জোট বলে। স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক জোটের **সুবিধা** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

১। ইহাতে বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা ভোগ করা যায়।

২। অদক্ষ কারবার ইহাদ্বারা বন্ধ হইয়া যায়।

৩। ইহা দ্বারা ব্যবসাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাপ্তি ঘটে।

৪। জনহিতকর প্রকল্পের মাধ্যমে ইহা অপচয় বন্ধ করে।

৫। উপযুক্ত মূল্যে শেয়ার বিক্রয় ইহাতে সম্ভব হয়।

৬। ইহাতে কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি পায় আর গবেষণার সুযোগ দেয়।

৭। কমমূল্যে পণ্য বিক্র সম্ভব হয়।

অসুবিধা (Dis-Advantages) :—

১। এই পদ্ধতিতে জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠ বণ্টন হয় না।

২। প্রকৃত পক্ষে এই পদ্ধতিতে পণ্য মূল্য হ্রাস পায় না।

৩। ইহাতে শ্রমিক অশান্তি দেখা দেয় কারণ শোষণের মনোভাব ইহাতে দেখা যায়।

৪। ইহা একচেটীয়া কারবারকে স্বাগত জানায়।

৫। সরকারকে বিভিন্ন প্রকার উৎকোচ দ্বারা ইহা নিজেদের স্বার্থে অনেক সময় আইন পাশ করাইয়া লয়।

৬। কারবার বৃহদায়তন হইলে দক্ষ পরিচালনা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

৭। ইহা ফটক্া কারবারীদের সাহায্য করে।

সংহৃতি (Consolidation) :—

নিজেদের স্বাতন্ত্র নষ্ট করিয়া একাধিক প্রতিষ্ঠান জোটভুক্ত হইলে তাহাকে সংহৃতি বলে।

সুবিধা (Advantages) :—

১। প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র না থাকায় একই নীতিতে ইহা পরিচালিত হইতে পারে।

২। উৎপাদন ব্যয় কম হয় আর কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ করিতে পারে।

৩। আর্থিক দিক দিয়া ও আইনগত ভাবে ইহা একটি সুন্দর প্রতিষ্ঠান।

৪। ইহাতে ক্ষমতা বিভিন্ন লোকের হাতে ন্যস্ত থাকে। ফলে কোন অসুবিধা দেখা যায় না।

৫। ইহা গণতন্ত্রের পূজারী।

এইরূপ ব্যবস্থা ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া কয়লা খণির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

অসুবিধা (Dis-Advantages) : —

১। যখন কারবার বৃহদায়াতন হয় তখন এই পদ্ধতিতে সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হয় না।

২। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনে কারবার দ্রুত পরিবর্ত্তন করা যায় না। ফলে লোকসান হয়।

৩। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্রীত হওয়ায় অনেক সময় মালিকানায় একমত হয় না।

৪। ইহার পরিচালনায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। মূলধনের অভাবে অনেক সময় কারবার বন্ধ হইয়া যাইতে দেখা যায়।

৫। অনেক সময় সরকারী নীতি এই প্রকার ব্যবসাক্ষেত্রে দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

কার্টেল ও একত্রীকরণের মধ্যে পার্থক্য (**Distinction between Cartel and amalgamation**) :—

কার্টেল।	একত্রীকরণ।
১। মালিকানা ইহাতে পরিবর্তন হয় না।	১। ইহাতে মালিকানা পরিবর্তন হয়।
২। ইহা অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান।	২। ইহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।
৩। সদস্যদের স্বাতন্ত্র ইহাতে রক্ষিত হয়।	৩। সদস্যদের স্বাতন্ত্র ইহাতে রক্ষিত হয় না।
৪। ইহাতে আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় সদস্যদের কোন হাত থাকে না।	৪। আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় সদস্যদের হাত থাকে।
৫। ইহা একটি সমান্তরাল জোটের উদাহরণ।	৫। ইহা পূর্বাপর জোটের উদাহরণ।
৬। ইহার কারবার শুধুমাত্র দেশের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে না।	৬। ইহার কারবার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়।
৭। অনেক ক্ষেত্রে ইহা সমাজ বিরোধী কাজ করে বলিয়া মনে হয়।	৭। কোন সময় ইহা সমাজ বিরোধী কাজ করে না।
৮। ব্যবসা খারাপের সময় এই প্রকার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।	৮। ব্যবসা খারাপ ও ভাল উভয় সময়েই ইহা গড়িয়া উঠে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. কারবারী জোট কাহাকে বলে? ইহার কারণ কি?

(What do you mean by Business Combination? What are the causes of such Combination?)

2. কারবারী জোটের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

(Discuss the advantages and dis-advantages of Business Combination).

3. "প্রতিযোগিতার ফলেই কারবারী জোটের উৎপত্তি হয়।" আলোচনা কর। এই প্রসঙ্গে ভারতে যে বিভিন্ন প্রকার জোট দেখা যায় তাহা আলোচনা কর।

("Competition leads to Combination".—Discuss. In this connection, mention the types of Combinations found in India).

4. পূর্বাপর ও সমান্তরাল জোটের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Discuss the advantages and Dis-advantages of Vertical and Horizontal Combination).

5. উৎপাদক সংঘ ও ট্রাষ্ট কাহাকে বলে? ইহাদের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

(Define Pool and Trust. What are their respective merits and De-merits) ?

6. হোল্ডিং কোম্পানী কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Define Holding Company. Discuss its Features, Advantages and Dis-Advantages).

7. পার্থক্য নির্ণয় কর :—

(a) ট্রাষ্ট ও হোল্ডিং কোম্পানী

(b) ট্রাষ্ট ও কার্টেল

(c) ম্যানেজিং এজেন্ট ও হোল্ডিং কোম্পানী।

(Distinguish beetween :—

(a) Trust and Holding Company

(b) Trust and Cartel

(c) Managing Agent and Holding Company)

8. স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক জোটের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Discuss the Comparative merits and De-merits of Voluntary and Compulsory Combination).

9. সংহতি কাহাকে বলে? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What is Consolidation ? What are its merits and De-merits) ?

10. কার্টেল ও একত্রীকরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

(Distinguish between Cartel and Amalgamation).

কারবারের প্রশাসনিক সংগঠন

(Administrative Organisation in Business)

কারবার সংগঠনের অর্থ ও উহার বৈশিষ্ট্য (Meaning and Features of Business Organisation) :—

কোন কারবার সুস্থ ভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সংগঠন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহাকে কারবার সংগঠন বলে। কারবারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া এই সংগঠনের মাধ্যমে তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে হয়। এই সংগঠন না থাকিলে কোন কারবারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা একটি কঠিন কাজ হইয়া উঠে।

এই কারবার সংগঠনের নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্যগুলি** দেখিতে পাওয়া যায় :—

১। কারবারের সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলী নির্ধারণ করিয়া উহাকে বাস্তবায়িত করিতে হয়।

২। প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের বণ্টন ও বিভিন্ন বিভাগে উহাদের শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

৩। সমস্ত কাজকে মালিক ও তাহার কর্মচারীর মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করিতে পারে।

৪। বৃহৎ কারবারের বিকেন্দ্রীকরণ এই ব্যবস্থায় সম্ভব হইতে পারে।

৫। ভারার্পণ দ্বারা যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয় তাহার সাফল্য বিচারও এই সংগঠনের দ্বারা করা যায়।

রৈখিক সংগঠনের অর্থ, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা (Meaning, Features, Advantages and Dis-Advantages of Line Organisation) :—

পরিচালনার কাজ বিভিন্ন প্রকার কারবারে দেখা যায়। যখন এই পরিচালনা বা সংগঠনের কাজ উচ্চতম স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে নিম্নতম স্তরে আসিয়া পৌছায় অর্থাৎ উচ্চতম কর্মী ও নিম্নতম কর্মীর মধ্যে আদেশ পালনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন তাহাকে **রৈখিক সংগঠন বলে**। ইহাকে সামরিক সংগঠনও বলা হয়।

ইহার **বৈশিষ্ট্যগুলি** নিম্নরূপ :—

(ক) ইহাতে বিভিন্ন পৃথক পৃথক বিভাগ থাকে।

(খ) প্রত্যেক বিভাগের কর্মীরা স্বাধীনভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে।

(গ) প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন সাধারণ ম্যানেজার থাকে।

(ঘ) প্রত্যেক সাধারণ ম্যানেজারের অধীনে একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মী থাকে।

(ঙ) প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে তাহার কাজ করিবার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়।

ইহার সুবিধা :—

১। ইহা অত্যন্ত পুরাতন পদ্ধতি।

২। ইহা অনুসরণ করা খুব সহজ কারণ ইহার প্রকৃতি সরল।

৩। যে কোন সমস্যা এই পদ্ধতিতে অতি সহজে সমাধা হইয়া যায়। কারণ একজন অধস্তন কর্মী মাত্র একজন ঊর্দ্ধতন কর্মীর নিকট দায়ী থাকে।

৪। সাংগঠনিক জটিলতা না থাকায় এই পদ্ধতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

৫। ইহাতে কারবারের শৃঙ্খলা বজায় থাকে। কারণ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অতি পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট হয়।

এই ব্যবস্থার অসুবিধা :—

১। ভাল কাজের পুরস্কার ও খারাপ কাজের শাস্তি বিধান এই পদ্ধতিতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় না।

২। এই ব্যবস্থাতে বিশেষীকরণ সম্ভব নয়। কারণ একই লোকের উপর বিভিন্ন প্রকার কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৩। আত্মীয় পোষণ, স্তুতিবাদ প্রভৃতি এই ব্যবস্থাতে প্রচণ্ড পরিমাণ দেখা যায়।

৪। কর্মীরা কাজ করিতে উৎসাহ পায় না। কারণ তাহারা যন্ত্রের মত আদেশ পালন করিয়াই চলে।

৫। প্রয়োজনে ইহা সহজে পরিবর্তন করা যায় না। কারণ আমলাতান্ত্রিক লাল-ফিতার গলদ দেখা যায়।

৬। বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রকার ব্যবস্থা অতি অল্প প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়। কারণ ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল পদ্ধতি।

কর্মী সংগঠনের অর্থ, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা (Meaning, Features, Advantages and Dis-Advantages of staff-organisation) :—

বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ কর্মীসম্মিলিত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে কর্মী-সংগঠন বলে। প্রত্যেক বিভাগকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এই অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগ করা হয়। ইহাতে কারবারটি সুষ্ঠু নীতিতে চলিতে পারে।

বৈশিষ্ট্য সমূহ :—

(ক) বিশেষজ্ঞগণ কোন প্রকার আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারে না। তাহারা শুধু মাত্র পরামর্শ দিয়া থাকে।

(খ) বিশেষজ্ঞরা কর্তৃত্ব করিতে পারে না তথাপি এই কর্তৃত্ব নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধগামী।

(গ) এই পদ্ধতিতে কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ।

(ঘ) কোন বিভাগের উচ্চ-পদস্থ কর্মী অপর বিভাগের কর্মীকে উপদেশ দিতে পারে কিন্তু তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না।

এই পদ্ধতির **সুবিধা :—**

১। এই পদ্ধতিতে বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। কারণ বিশেষজ্ঞ লোকের পরিচালনায় থাকায় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি করা যায়। এবং প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগের দ্বারা এই বিশেষীকরণ সম্ভব হইয়া উঠে।

২। বিশেষজ্ঞের পরামর্শে পরিচালিত হওয়ায় কারবার সুস্থ পদ্ধতিতে চলিতে পারে।

এই পদ্ধতির **অসুবিধা :—**

১। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিতে পারে কিন্তু কর্তৃত্ব করিতে পারে না। ইহাতে সংগঠন দুর্বল হইয়া পড়ে। কারণ কর্তৃত্ব হীন পরামর্শ কেহ গ্রাহ্য করে না।

২। ইহা অতি ব্যয়বহুল পদ্ধতি। কারণ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থের দরকার হয়।

৩। অনেক সময় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায় না। কারণ কেহ কাহারও কথা মানিয়া লয় না।

রৈখিক ও কর্মী সংগঠনের অর্থ, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা (Meaning, Features, Advantages and Dis-Advantages of Line and Staff Organisation) :—

রৈখিক ও কর্মী-সংগঠনের ভিতর কোনটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। এই জন্য উহাদের ত্রুটি দূর করিয়া শুধুমাত্র সুবিধা ভোগ করিবার জন্য এই পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। রৈখিক ও কর্মী সংগঠনকে একত্রীভূত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা দুইটি পদ্ধতির সংমিশ্রণ মাত্র।

ইহার বৈশিষ্ট্য :—

১। ইহাতে সরলরৈখিক পদ্ধতির ন্যায় উপর হইতে নীচের দিকে আদেশ প্রবাহিত হয়।

২। অপরদিকে কর্মী-সংগঠনের ন্যায় নীচের দিক হইতে উপরের দিকে বিশেষজ্ঞরা আদেশ দিতে পারে না।

৩। কর্মীব্যবস্থা রৈখিক ব্যবস্থার উপর কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পারে না।

৪। বিশেষজ্ঞরা তথ্য-সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান, গবেষণা, প্রভৃতি কাজ করিয়া কর্মী-সংগঠনকে সাহায্য করে। অপরদিকে রৈখিক ব্যবস্থার বিভাগীয় প্রধানরা কর্তৃত্ব করে।

ইহার সুবিধা ঃ—

১। এই পদ্ধতিতে সরল রৈখিক ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধা দেখা যায়। যেমন, সরলতা, সহজবোধ্যতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি।

২। এই পদ্ধতিতে কর্মী ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধা পাওয়া যায় যেমন, বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ, বিকেন্দ্রীকরণ, প্রভৃতি।

৩। ইহা সহজেই পরিবর্তন করা যায়।

ইহার অসুবিধা ঃ—

১। বড় প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ইহা অনুসরণ সম্ভব নহে। কারণ ইহা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। ইহাতে অনেক পদস্থ কর্মী দরকার হয়।

২। এই পদ্ধতিতে যে কোন সময় বিভাগীয় পদস্থ কর্মী ও বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতের বিরোধ দেখা দিতে পারে। ইহাতে কারবারটি সম্পূর্ণ বন্ধ হইযা যাইতে পারে।

কর্মী ও রৈখিক সংগঠন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য (**Distinction between Staff and line Authority**) :—

কর্মী সংগঠন	রৈখিক সংগঠন
১। ইহা অত্যন্ত ব্যয় বহুল পদ্ধতি।	১। এই পদ্ধতিতে সাংগঠনিক ব্যয় বেশী নহে।
২। এই পদ্ধতিতে কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ।	২। কর্তৃত্ব ইহাতে সীমাবদ্ধ নহে।

কর্মী সংগঠন	রৈখিক সংগঠন
৩। বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে সম্ভব হয়।	৩। বিকেন্দ্রীকরণ এই পদ্ধতিতে সম্ভব নহে।
৪। সমান্তরাল কর্তৃত্ব ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।	৪। ইহার কর্তৃত্ব সমান্তরাল নহে। ঊর্ধ্বমুখী।
৫। উচ্চ কর্মী নিম্ন-কর্মীর মধ্যে এই পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য থাকে না।	৫। উচ্চ ও অধস্তন কর্মীর মধ্যে পার্থক্য এই পদ্ধতিতে অতি স্পষ্ট।
৬। এই পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞের মতামত পাওয়া যায়।	৬। এই পদ্ধতিতে বিভাগীয় প্রধানের কার্য পাওয়া যায়।
৭। এই পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞরা নির্দেশ দিতে পারে, কিন্তু কর্তৃত্ব করিতে পারে না।	৭। এই পদ্ধতিতে বিভাগীয় প্রধানরা অধস্তন কর্মীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে।
৮। ইহা একটি 'একক' সংগঠন নহে।	৮। ইহা একটি 'একক' সংগঠন।

কার্যভিত্তিক সংগঠনের অর্থ, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা (**Meaning, Features, Advantages and Dis-Advantages of Functional Organisation**) :—

যে সংগঠনে কার্যের ভিত্তিতে বিভাগ সৃষ্টি হয় এবং বিভাগের কাজের ভার একজন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞের হাতে অর্পণ করা হয় তাহাকে **কার্যভিত্তিক সংগঠন** বলে। রৈখিক ব্যবস্থাপনার ঠিক বিপরীত হইতেছে এই কার্যভিত্তিক সংগঠন। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক **F. W. Taylor** এই ব্যবস্থার সূত্রপাত করেন। এই পদ্ধতিতে কাজের দায়িত্ব একজন বিশেষজ্ঞের উপর অর্পণ করা হয়। এই বিশেষজ্ঞই কার্য সম্পাদনা ও তদারকি করিয়া থাকে।

ইহার **বৈশিষ্ট্য** :—

(ক) কাজের ভিত্তিতে সমস্ত সংগঠনটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন, পরিকল্পনা, উৎপাদন, বিক্রয়, গবেষণা ইত্যাদি।

(খ) প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে সুন্দর যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

(গ) প্রতিটি বিভাগ একজন বিশেষজ্ঞের হাতে থাকে।

(ঘ) পরামর্শ ছাড়াও নিজ নিজ বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

(ঙ) প্রয়োজনে প্রতিটি বিভাগ অন্য বিভাগকে সেবা করিতে পারে।

ইহার সুবিধা :—

১। কাজের ভিত্তিতে বিভাগ সৃষ্টি হওয়ায় সহজেই এই পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পাওয়া যায়।

২। বিশেষীকরণের ভিত্তিতে বিভাগ সৃষ্টি হওয়ায় শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৩। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ থাকায় কর্ম-সম্পাদনায় কোন অসুবিধা হয় না।

৪। প্রতিটি কর্মী হইতে নিজ নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রকাশের সুযোগ পায়।

অসুবিধা :—

১। একাধিক বিশেষজ্ঞ থাকায় সংগঠনের জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

২। বিভাগীয় প্রধান না থাকায় এই পদ্ধতিতে কর্ম-শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

৩। সম-পদমর্য্যাদা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞের ভিতরে মতের পার্থক্য দেখা দিলে সংগঠন অচল হইয়া পড়ে।

৪। অনেক সময় সুষ্ঠুভাবে এই পদ্ধতিতে কাজের বণ্টনও সম্ভব হয় না।

৫। কর্ম-সমন্বয়ও এই প্রকার কাজের একটি জটিল পদ্ধতি।

৬। ইহা একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি। কারণ বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি হইলে ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

ভারার্পণ (Delegation) :—

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি কারবার ক্রমেই বড হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। কারবার যখন বড় হইয়া উঠে তখন উহা পরিচালনা একজনের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। একজনের হস্তে উহা ধরিয়া রাখার অর্থ হইল লোকসান। কেহই তাহা চাহে না। সেজন্য ঐ কাজকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া অধস্তন কর্মচারীর হস্তে উহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য অর্পণ করা হয়। এই রূপ অর্পণকে ভারার্পণ বলে। শুধুমাত্র কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করিলে হইবে না। যাহাকে এই কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হইবে তাহাকে উহা সম্পন্ন করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃত্বও দিতে হয়।

অন্যথায় তাহার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। এবং ঐ অধস্তন কর্মী দুর্বল হইয়া পড়িবে। সেইজন্য বলা হয় কর্তৃত্ব ছাড়া দায়িত্ব কথাটি অবাস্তব। অর্থাৎ হইতেই পারে না।

ভারার্পণের উপাদান (Elements of Delegation) :—

ভারার্পণের উপাদান সমূহকে নিম্নরূপে সহজেই বর্ণনা করা যায় :—

১। **কর্তব্য অর্পণ :—**

ইহাকে ভারার্পণের প্রথম উপাদান বলে। যদি কোন কাজ একজনের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় তবে উহা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। এই কর্তব্য নির্দ্দিষ্ট আকারে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দিতে হইবে।

২। **ক্ষমতা প্রদান :—**

শুধুমাত্র কর্তব্য অর্পণই যথেষ্ট নহে। উহা সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে যাহাকে কর্তব্য অর্পণ করা হইয়াছে তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতাও প্রদান করিতে হইবে।

৩। **দায়িত্ব পালন :—**

অধস্তন কর্মীকে যখন কর্তব্য ও উহার সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয় তখন উহা সম্পন্ন করার দায়িত্ব তাহার উপর আসিয়া পড়ে। সুতরাং অধস্তন কর্মীর কর্তব্য হইতেছে ঐ দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করা।

৪। **হিসাব প্রদান :—**

প্রতিটি অধস্তন কর্মীর পবিত্র কর্তব্য হইতেছে তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মীকে তাহার কাজের হিসাব প্রদান। ইহা ছাড়া কাজের অগ্রগতি পরিমাপ করা যায় না।

বিকেন্দ্রীয়করণ প্রশাসনের অর্থ, সুবিধা ও অসুবিধা (Meaning, Advantages and Dis-Advantages of Decentralised Administrative System) :—

সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থা যখন একটি স্থানে অথবা হস্তে না থাকিয়া যখন বিভিন্ন স্থানে বা হস্তে ছড়াইয়া রাখা হয় তখন তাহাকে বিকেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা বলে।

সুবিধা (Advantages) :—

১। এই পদ্ধতিতে সমস্ত প্রশাসন কাজ একটি হস্তে থাকে না। সুতরাং কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অনেক লাঘব হয়।

২। ইহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কারণ ইহা শ্রমবিভাগের নামান্তর মাত্র।

৩। ইহা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কারণ ইহাতে কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব দেখা যায়।

৪। প্রতিযোগিতার বাজারে এই পদ্ধতি একান্ত দরকার। কারণ ইহা সহজেই পরিবর্তন করা যায় এবং ইহার ফলে ক্রেতারা অসন্তুষ্ট হয় না।

৫। উচ্চ-কর্মচারীরা শুধুমাত্র পণ্য উৎপাদনে ব্যস্ত না থাকিয়া প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক বেশী চিন্তা করিতে পারে।

অসুবিধা (Dis-Advantages) :—

১। ব্যক্তিস্বাধীনতা দেওয়ার ফলে প্রতিটি অধস্তন কর্মী তাহার কাজ এই পদ্ধতিতে ঠিকভাবে করে না।

২। বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টির ফলে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে। সেজন্য কোন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে পারে না।

৩। কাজের পদ্ধতির উপর এই ব্যবস্থায় কাহারও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না; ফলে বাজারে সুনাম নষ্ট হয়।

মন্তব্য :—

বিকেন্দ্রীয় প্রশাসনের ঠিক বিপরীত হইতেছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা। সুতরাং বিকেন্দ্রীয় ব্যবস্থার সুবিধাগুলিই হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অসুবিধা; আর বিকেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার সুবিধা।

ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্য (Significance of Control in Management) :—

পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। এই নির্দিষ্ট নীতিকে সংক্ষেপে নিয়ন্ত্রণ বলে। ব্যবস্থাপনায় এই নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে একটি মানুষ কল্পনা করিলে, তাহার 'মন'কে বলিতে হয় নিয়ন্ত্রণ। মন যেমন দেহটাকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি নিয়ন্ত্রণই সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন কর্মীর হাতে বিভিন্ন কাজ করিবার ভার দেওয়া হয়। তাহারা কতটা করিল অথবা আদৌ করিল কিনা তাহা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিমাপ করা যায়। এই নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোন কারবার পরিচালনা সম্ভব হয় না। গোটা ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

বাজারে সুনাম নষ্ট হয় এমনকি অচিরেই ঐ কারবার বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বা তাৎপর্য অতি অসাধারণ।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. কারবারের প্রশাসনিক সংগঠন বলিতে কি বুঝ? ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(What do you mean by Administrative Organisation in Business ? What are its Features ?)

2. রৈখিক সংগঠন কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What is Line Organisation ? Discuss its Features, Advantages and Dis-Advantages).

3. কর্মী সংগঠন কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What is Staff-Organisation ? Discuss its Features, Advantages and Dis-Advantages).

4. রৈখিক ও কর্মী সংগঠনের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Discuss the Features, Advantages and Dis-Advantages of Line and Staff-Organisation)

5. রৈখিক ও কর্মী সংগঠনের পার্থক্য আলোচনা কর।

(Distinguish between Line and Staff Organisation).

6. কার্য-ভিত্তিক সংগঠন কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Define Functional Organisation. Discuss its Features, advantages and dis-advantages).

7. ভারার্পণ বলিতে কি বুঝ? ইহাকে কিভাবে ফলপ্রদ করিবে?

(What is meant by Delegation ? How would you make Delegation effective ?)

8. "কর্তৃত্ব ছাড়া ভারার্পণ অর্থহীন"—আলোচনা কর।

("Delegation without Authority is Meaningless" – Discuss).

9. বিকেন্দ্রীয়করণ প্রশাসন ব্যবস্থা কাহাকে বলে? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What do you mean by Decentralisation of adminstrative functions ? Discuss its Advantages and Dis-advantages).

10. বিকেন্দ্রীয়করণে কার্যকরী সংযোজনা প্রয়োজন হয় কেন?

Decentralisation demands effective Co-ordination. Why ?

11. ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্য আলোচনা কর।

(Discuss the significance of Control in Management).

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, শিল্প-সংস্কার ও উৎপাদিকা শক্তি

(Scientific Management, Rationalisation and Productivity)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অর্থ ও উদ্দেশ্য (Meaning and Scope of Scientific Management) :—

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যে ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয় তাহাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলে। অন্য ভাবে বলা যায়, বাজারে সর্বদা প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এই প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিলেই তবে জয় আসে। আর এই টিকিয়া থাকার জন্য দরকার হয় অত্যন্ত চিন্তা ভাবনা করিয়া প্রতিটি পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া। সেইজন্য কারবারের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ দ্বারা যে নতুন কাজের পদ্ধতি বাহির করা করা হয় তাহাকে **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা** বলে। ইহাকে একদিকে **বিজ্ঞান** ও অন্যদিকে **কলা-কৌশলও** বলা হয়। বিজ্ঞান বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, ইহা নতুন কোন তথ্য ও গবেষণার দ্বারা নতুন একটি ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। এই সৃজনী ধর্মই হচ্ছে বিজ্ঞান। অপরদিকে ঐ সৃষ্ট পদ্ধতিগুলি সন্নিবেশ হচ্ছে পক্ষান্তরে কলা ও কৌশল। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা একাধারে বিজ্ঞান ও কলা-কৌশল। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এফ, ডব্লিউ, টেলরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনিই এই পদ্ধতির স্রষ্টা। সেজন্য তাহাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়।

এই ব্যবস্থাপনার **মূল উদ্দেশ্য** হচ্ছে কম খরচে বেশী উৎপাদন দ্বারা সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার এবং মুনাফা বৃদ্ধি আর মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে উন্নত সম্পর্ক গড়িয়া তোলা।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল নীতি (Fundamental Principles) :—

এই ব্যবস্থাপনার নীতি বলিতে টেলরের নীতিকেই বোঝায় কারণ তিনিই এই পদ্ধতির স্রষ্টা। টেলরকে অনুসরণ করিয়া এই ব্যবস্থাপনার মূল নীতিগুলি নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

১। সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ।

২। নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ।

৩। সমস্ত কাজের গতি ও সময় পরীক্ষা।

৪। সমস্ত কাজে যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ।

৫। উন্নত শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক।

৬। উন্নত মানের যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

৭। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য নির্ধারণ।

যদি এই ব্যবস্থা ঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে টেলরের মতে ইহা শিল্পের অপচয় বন্ধ করিবে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইবে, দক্ষতা বৃদ্ধি হইবে ও মুনাফা ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত হইবে।

অন্যভাবে বলা যায়, কারবারের দৈনন্দিন কার্যাবলী, উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রমিক-সম্পর্ক, মুনাফা প্রভৃতির ভালভাবে ও সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান ও বিচার দ্বারা উহাদের উন্নতি সাধনই এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল নীতি ও লক্ষ্য।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Main Features) :—

এই ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য **দুই ভাগে** বিভক্ত করা যায়। যেমন,

(ক) **মানবীয়** বৈশিষ্ট্য ও (খ) **অমানবীয়** বৈশিষ্ট্য :—

মানবীয় বৈশিষ্ট্য :–

১। **শ্রমিক :—**

কারবারের উন্নতি বহুলাংশে শ্রমিকের উপর নির্ভর করে। সেজন্য শ্রমিক নিয়োগের সময় যথেষ্ট সতর্ক হইতে হইবে।

২। **সময় পরীক্ষা :—**

ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন কারণ ইহাতে সময়ের অপচয় বন্ধ হয় ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে পণ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হয়।

৩। **শ্রমিকের শিক্ষাদান :—**

উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে শ্রমিকগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না।

৪। **গতি নিরীক্ষণ :—**

সময় ও শ্রমের অপচয় বন্ধের উদ্দেশ্যে ইহা করা দরকার। ইহাতে কর্মশক্তি ও প্রেরণা বৃদ্ধি পায়।

৫। **শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক :—**

পুরাতন সম্পর্কের উচ্ছেদ ও নতুন উন্নত সম্পর্ক স্থাপনই এই ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। ইহাতে মালিকের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এবং শ্রমিকের কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা মালিক চিন্তা করে।

৬। **শ্রান্তি সমীক্ষা :—**

একটানা শ্রমিক কাজ করিতে পারে না। কারণ সে মেশিন নহে। সেজন্য কিছুক্ষণ কাজ করার পরে তাহাকে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। এবং ইহাও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৭। উৎসাহমূলক মজুরি পদ্ধতি :—

ইহা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম অঙ্গ। ইহাতে শ্রমিকেরা কাজ করিতে উৎসাহ পায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইহাকে পার্থক্যমূলক মজুরি হারও বলা হয়।

অমানবীয় বৈশিষ্ট্য :—

১। **যন্ত্রপাতি :—**

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন উন্নত ধরণের যন্ত্রের ব্যবহার। ইহা ভিন্ন অধিক পণ্য উৎপাদন সম্ভব নহে।

২। **কাঁচা পণ্য :—**

শুধুমাত্র যন্ত্রপাতিই যথেষ্ট নহে। সাথে সাথে কাঁচামালের প্রয়োজন। অন্যথায় সুলভ উৎপাদন কখনই সম্ভব নয়।

৩। **পরিবেশ :—**

কারখানায় উৎপাদন পরিবেশ ভাল না হইলে শ্রমিকের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। যথেষ্ট আলোবাতাস, নির্দ্দিষ্ট জায়গা, স্নানাগার প্রভৃতি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৪। **কার্য্যানুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ :—**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্ত কাজ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির উপর দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা এই ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫। **উপযুক্ত পরিকল্পনা :—**

এই ব্যবস্থাপনায় একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগ থাকে। ইহা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। ইহা সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং সময় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফলে উৎপাদন অতি সহজে বৃদ্ধি পায়।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Dis-advantages) :—

সুবিধা (Advantages) :—

১। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে পক্ষান্তরে শ্রমিক ও মালিক উভয়েই লাভবান হয়।

২। উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। কারণ অবিরাম উৎপাদন সংক্রান্ত কার্য, লইয়া এই পদ্ধতি চিন্তা করে।

৩। শ্রমিকের কাজের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। কারণ যে শ্রমিক যে কাজ করিতে ভালবাসে তাহাকে সেই দেওয়া হয়।

৪। গতি, শ্রান্তি, সময় নীরক্ষা যেমন শ্রমিকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে অন্যদিকে ইহা কারবারেও সময়ের অপচয় বন্ধ করে।

৫। ইহাতে উৎপাদকগণ প্রগতিশীল চিন্তাধারায় চলে বলিয়া শ্রমিকের অনেক কল্যাণ সাধিত হয়।

৬। নিরীক্ষা ও প্রতিনিয়ত গবেষণার ফলে এই পদ্ধতিতে উন্নত ধরণের নতুন নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার সম্ভব হয়।

অসুবিধা (Dis-advantages) :—

১। ইহা একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি। সময়, গতি, শ্রান্তি প্রভৃতি নিরীক্ষণ অতি ব্যয়-বহুল পদ্ধতি। ছোট ব্যবসায়ে ইহা সম্ভব হয় না।

২। নতুন নতুন পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়।

৩। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় উচ্চ বেতনভুক কর্মচারী থাকায় কারবারের স্থির ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৪। ইহা শ্রমিকগণকে যন্ত্রে পরিণত করে।

৫। ইহাতে শ্রমিক ঐক্য নষ্ট হয় কারণ বিভেদমূলক মজুরি হার ইহাতে দেখা যায়।

৬। শ্রমিকগণ এই পদ্ধতিতে বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করে।

৭। কর্মচ্যুত শ্রমিক সংখ্যা ইহাতে ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। কারণ অধিকাংশ কাজই ক্রমে ক্রমে শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের দ্বারা করানো হয়।

৮। শ্রমিকগণ ইহাতে কাজের উদ্দীপনা দেখাইতে পারে না। কারণ তাহারা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনানুযায়ী করিতে বাধ্য থাকে।

শিল্প সংস্কার (Rationalisation) :—

শিল্প সংস্কারের অর্থ ও উদ্দেশ্য (Meaning and Object) :—

শিল্প সংস্কার ব্যাপারটি প্রথমে জার্মানে এবং পরে অন্যান্য দেশে অনুভূত হয়। প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগে জার্মানের সমগ্র অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়ে। সমস্ত বৈদেশিক বাজার হাতছাড়া হইয়া যায়। ইহার ফলে হৃত অবস্থা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা দেখা যায় এই শিল্প সংস্কারের মধ্য দিয়া। এই শিল্প সংস্কার কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই শিল্প সংস্কার দ্বারা কোন একটি নির্দিষ্ট শিল্পের সংস্কারকে বোঝায় না। ইহা দ্বারা বিভিন্ন শিল্পের অন্তর্গত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক পরিবর্তনকে বোঝায়।

বিভিন্ন প্রকার শিল্পের ক্ষেত্রে সকলপ্রকার অপচয় এবং অক্ষমতা বন্ধ করিয়া তাহাদের সর্বাধিক ব্যয়সংকোচ করাই হচ্ছে শিল্প সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য।

শিল্প সংস্কারের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Dis-advantages) :—

সুবিধা (Advantages) :—

ইহা দ্বারা একই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখার ভিতরে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়। ইহা শিল্পের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করে।

২। শিল্প সংস্কার দ্বারা বাজারের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য সহজে রক্ষা করা যায়।

৩। উন্নত মানের পণ্য কম খরচে এই পদ্ধতিতে উৎপাদন করা যায়।

৪। বৃহদায়তন শিল্পের ব্যয় সংকোচের সকল প্রকার সুবিধা ইহাতে পাওয়া যায়।

৫। এই পদ্ধতিতে শ্রমিকের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়।

৬। ইহাতে প্রতিযোগিতা না থাকায় বিক্রয় ও মুনাফা দুইই বৃদ্ধি পায়।

৭। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা এই পদ্ধতিতে পরিবহন ব্যয় কম হয়।

৮। ইহা দ্বারা জোট সৃষ্টি হয় এবং অতি সহজে ঐ সবল জোট হইতে স্বল্প সুদে পুঁ[illegible] করা যায়।

৯। এই ব্যবস্থা দ্বারা কাজের পরিবেশ উন্নত হয়, শ্রমিকের কাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা নানাপ্রকার সামাজিক সুখ ভোগ করিতে পারে।

১০। এই ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিক মালিক সম্পর্ক সহজ ও সবল হয়।

১১। প্রচুর উৎপাদনের ফলে ইহাতে বৈদেশিক বাজারে পণ্য বিক্রয় করা যায়। এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন হয়।

১২। ইহা দ্বারা কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইতে পারে এবং শ্রম-সংক্ষেপক আধুনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা যায়।

অসুবিধা : (Dis-advantages) :—

১। এই প্রকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক শিল্প প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

২। উন্নত মানের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হয়।

৩। ঘনঘন নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যয়বহুল পদ্ধতি। ইহা ছোট কারবারের পক্ষে সম্ভব নয়।

৪। ইহাতে যে জোটের সৃষ্টি হয় তাহারা সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফলে একচেটীয়া মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

৫। ক্রেতাদের ব্যক্তিগত রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখা ইহাতে সম্ভব নহে।

৬। অনুন্নত দেশে আজও ইহা দৃঢ় বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

শিল্প-সংস্কারের বিভিন্ন স্তর (Stages of Rationalisation) :—

শিল্প সংস্কারের ক্ষেত্রে **তিনটি** পরিষ্কার স্তর দেখিতে পাওয়া যায় যেমন, (১) **পরিকল্পনা**, (২) **পুনর্বিন্যাস** ও (৩) **উন্নয়ন**।

পরিকল্পনা :—

ইহা অনুযায়ী প্রথমেই ঠিক করিতে হইবে যে বাজারে কোন কোন পণ্য কি কি পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রয় করিতে হইবে। অর্থ-সংগ্রহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া একটি বিক্রয়ের কাজের হিসাব, একটি অর্থ-সংগ্রহের পদ্ধতি ও একটি পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি তৈয়ার করিতে হয়।

পুনর্বিন্যাস :—

ইহাকে সংস্কারের দ্বিতীয় স্তর বলা হয়। ইহাতে উৎপন্ন পণ্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির মান নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। বৃহদায়তনের সুবিধা ইহাতে পাওয়া যায়। এব উৎপাদন হ্রাস পায়।

উন্নয়ন :—

ইহাকে শিল্প-সংস্কারের স্তর বলা হয়। এই স্তরে বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থাতে বিশেষীকরণ ও বিভাগীয় করণ দেখা দেয়। ইহার ফলে কাজের গতি বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে অতি ক্ষুদ্র কাজেও যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হয়।

ভারতে শিল্প সংস্কার ও উহার সমস্যাবলী (Rationalisation and its Problems in India) :—

ভারতে শিল্প-সংস্কারের ইতিহাস অতি অল্প দিনের। বিশ্বমন্দার হাত হইতে ভারতের শিল্পকে রক্ষা করার জন্যেই এই শিল্প-সংস্কারের গুরুত্ব অনুভূত হয়। ইহার ফলে ১৯৩০ সালে ট্যারিফ বোর্ডের নির্দেশানুসারে ভারতীয় সূতীবস্ত্রশিল্পে এই সংস্কার কার্য্যকরী হয়। ইহাই ভারতীয় শিল্পের সংস্কারের প্রথম প্রচেষ্টা।

ইহার পরে এই সংস্কার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে দেখা যায়। Indian Iron and Steel এবং Steel Corporation of Bengal Limited সংযুক্তি এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ভারতীয় চিনি শিল্পেও এই সংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছে। পাটশিল্পেও এই সংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছে।

ভারতীয় কয়লা শিল্পেও ইহার গুরুত্ব আছে। অন্যথায় বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য ও কয়লার প্রকৃত ব্যবহার সম্ভব নহে।

ভারতীয় বিভিন্ন শিল্পে এই সংস্কার কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। এই ধীর অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে, কিছু কিছু সমস্যা। এই সকল সমস্যার জন্য ভারতে শিল্প-সংস্কার দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই সমস্যাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :—

১। উন্নতমানের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিলে শ্রমিক ছাঁটাই হইতে বাধ্য। ইহা দেশের মধ্যে বেকার সমস্যা সৃষ্টি করিবে।

২। শিল্প-সংস্কারের জন্য দরকার হয় বৈদেশিক উন্নতমানের যন্ত্রপাতি। ইহা ক্রয় করা দারিদ্র দেশের পক্ষে সম্ভব নহে।

৩। ভারতীয় শিল্পপতিরা এখনও শিক্ষার অভাবে এই সংস্কারকে উদার মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

৪। ভারতীয় শিল্পে এখনও প্রচুর বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করা আছে ফলে বৈদেশিক মালিকগণ এই সংস্কারের পক্ষপাতী নহে।

৪। শিল্প সংস্কারের সহায়ক অন্যান্য কার্যাগুলি যেমন পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি, ভারতে এখন উন্নত হইতে পারে নাই। সেজন্য ভারতীয় শিল্পে সংস্কার যথোপযুক্ত উন্নতি লাভ করে নাই। উপসংহারে বলা যায়, শত সহস্র অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পে এই সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় বিদেশী তথা আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। এই গুরুত্ব অনুভব করিয়া ভারত সরকার জাতীয় অর্থনীতিতে এই সংস্কার আরোপ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আশার লক্ষণ।

শিল্প সংস্কার ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Rationalisation and Scientific Management):

শিল্প-সংস্কার	বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
১। ইহা দ্বারা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক সংস্কার সাধন বোঝায়।	১। ইহা দ্বারা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক সংস্কার করা যায়।
২। অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।	২। ইহা সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৩। ইহা দ্বারা শ্রমিক উৎপাদন, বিক্রয় প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।	৩। ইহা দ্বারা শ্রমিকের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির উপরই একমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়।
৪। ইহা দ্বারা সামগ্রিক পরিবর্তন বোঝায়।	৪। ইহা দ্বারা একটা অংশের পরিবর্তন বোঝায়।
৫। ইহা বাহ্যিক ব্যাপার।	৫। ইহা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।
৬। ইহা দ্বারা সামগ্রিক শিল্পের প্রতিযোগিতা দূর হয়।	৬। ইহা কারবার বিশেষের প্রতিযোগিতা দূর হয়।
৭। ইহা দ্বারা উৎপাদনের সাহিত ভোগের সমতা রক্ষা করা যায়।	৭। ইহা দ্বারা পরিবারের সহিত ব্যবসায়ের সমতা রক্ষা করা যায়।
৮। নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত।	৮। ইহা দ্বারা পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত কেবল প্রতিষ্ঠানের সংস্কার বোঝায়।

শিল্প-সংস্কার	বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
৯। ইহা দ্বারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়।	৯। ইহা দ্বারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় না।
১০। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে।	১০। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না।

শিল্প-সংস্কার ও জাতীয়করণের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Rationalisation and Nationalisation) :—

শিল্প-সংস্কার	জাতীয়করণ
১। ইহা দ্বারা শিল্পের উন্নতি হয়।	১। ইহা দ্বারা শিল্প সরকারী মালিকানায় যায়।
২। ইহা দ্বারা কোন শিল্পের উন্নতি হয়।	২। ইহা দ্বারা কোন দেশের উন্নতি হয়।
৩। ইহাতে বে-সরকারী মালিকানা থাকে।	৩। ইহাতে বে-সরকারী মালিকানা থাকে না।
৪। শিল্পে প্রতিযোগিতা হ্রাস করার জন্য ইহা অনুসৃত হয়।	৪। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি দূর করার জন্যে ইহা অনুসৃত হয়।
৫। কোন শিল্পের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার জন্যে ইহা অনুসরণ করা হয়।	৫। জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্যে ইহা অনুসরণ করা হয়।
৬। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় কারবারের দুর্বলতা দূর করার জন্যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।	৬। ব্যক্তিগত কারবারের বুনিয়াদ নষ্ট করার জন্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

উৎপাদিকা শক্তি (Productivity) :—

উৎপাদিকা শক্তির অর্থ ও ধারণা (Meaning and Concept of Productivity) :—

উৎপাদিকা শক্তি কথাটি অনেক প্রচলিত হইলেও ইহার অর্থ ও ধারণা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে এই উৎপাদিকা শক্তি বলিতে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকেই বোঝায়। এ ব্যাপারে আবার মত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি আবার শুধুমাত্র শ্রমের উপর নির্ভর করে না। ইহা অনেকাংশে যন্ত্রপাতির উপরও নির্ভরশীল।

অতি সহজ ভাষায় এই উৎপাদিকা শক্তি বলিতে উৎপাদিত পণ্য ও তজ্জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপায় সমূহের সম্পর্ককেই বোঝায়। আবও সুন্দর ভাবে বলিতে হয় যে, "উৎপাদিত সম্পদ ও তজ্জন্য ব্যবহৃত উৎপাদনের উপাদানগুলির সম্পর্ককেই উৎপাদিকা শক্তি বলে।"

এই উৎপাদিকা শক্তি দুইটি পর্য্যায়ে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, যেমন ; (ক) কোন প্রতিষ্ঠানের স্তরে এবং (খ) কোন জাতির ক্ষেত্রে।

প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই উৎপাদিকা শক্তিদ্বারা ঐ প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন বিভাগের দক্ষতা এই শক্তির দ্বারা পরিমাপ করা যায়। ফলে প্রতিষ্ঠানটী একটি সুস্থ্য ও সবল নীতিতে পরিচালিত হইতে পারে।

অপরদিকে জাতির ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তি বলিতে জাতির মোট উৎপাদিত পণ্য ও তাহার জন্য নিয়োজিত উপাদান সমূহের সম্পর্ককে বোঝায়। জাতীয় স্তরে ইহা বিশেষ প্রয়োজন হয় কারণ ইহা দ্বারা কোন শিল্প সুস্থ আর কোন শিল্প দুর্বল তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। এবং সেই অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। এমনকি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও ইহা বিশেষ প্রয়োজন হয়।

সুতরাং এই উৎপাদিকা শক্তির ধারণা প্রতিষ্ঠান ও জাতির ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার (Factors of Increasing Productivity) :—

যে সকল বিষয়গুলির উপর উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি নির্ভর করে তাহা সংক্ষেপে নম্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

১। **আর্থিক অবস্থা** (Finance) ঃ—

উন্নত যন্ত্রপাতি, শিক্ষিত শ্রমিক, উন্নত কাঁচামাল প্রভৃতির উপর উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে। আর এই সকল বিষয় নির্ভর করে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। সুতরাং আমরা বলিতে পারি উৎপাদিকা শক্তি পরোক্ষভাবে আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

২। **ব্যবস্থাপনা** (Management) ঃ—

এই ব্যবস্থাপনার সহিত উৎপাদিকা শক্তির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। ব্যবস্থাপনা যত সূক্ষ্ম হইবে উৎপাদিকা শক্তিও তত বৃদ্ধি পাইবে।

৩। **প্রযুক্তি বিদ্যা** (Technology) ঃ—

ইহার উপরও উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে। যে দেশ অথবা যে কারখানার প্রযুক্তি বিদ্যা যত উন্নত হইবে সেই দেশ অথবা কারখানার উৎপাদিকা শক্তি তত বৃদ্ধি পাইবে।

৪। **সামাজিক অবস্থা** (Society) ঃ—

যে দেশ অত্যন্ত প্রগতিশীল, জাতীয়তাবোধ যাহার বেশী, শিল্পোন্নয়নের প্রবণতা যে দেশের বেশী সেই দেশের উৎপাদিকা শক্তিও বেশী। সুতরাং আমরা বলিতে পারি দেশের সামাজিক অবস্থার উপরও উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে।

৫। **প্রাকৃতিক বিষয়** (Natural Factors) ঃ—

কোন দেশের উৎপাদিকা শক্তি ঐ দেশের প্রাকৃতিক বিষয়ের উপরও যথেষ্ট নির্ভর করে। যে দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, অনুকূল জলবায়ু আছে সে দেশের উৎপাদিকা শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

৬। **সরকারী প্রচেষ্টা** (Government Policy) ঃ—

সরকারী প্রচেষ্টাও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতে পারে। উন্নত বৈদেশিক নীতি গ্রহণের দ্বারা এই উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। সহজ করনীতি, সহজ আমদানী-রপ্তানী নীতি, উন্নত শিল্পনীতি প্রভৃতি এই উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে।

সুতরাং উপরোক্ত বিষয়গুলিকে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার বলা হয়।

বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি ও বর্ধিত উৎপাদন (**Increased Productivity and Increased Production**) :—

এই দুটি ধারণা এক নহে। উহাদের মধ্যে পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধিকে বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি বলে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে তাহাকে বর্ধিত উৎপাদন বলে। অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন ক্ষমতাকেই বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি বলে আর মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকে বর্ধিত উৎপাদন বলে। উৎপাদিকা শক্তি বর্ধিত হইলেই উৎপাদনও বর্ধিত হয়, কিন্তু উৎপাদন বর্ধিত হইলেই সর্বত্র উৎপাদিকা শক্তি বর্ধিত হয় না। বর্ধিত উৎপাদন অনেকাংশে বাজারের উপর নির্ভরশীল কিন্তু বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি বাজারের উপর নির্ভরশীল নহে। ইহা শ্রমিক, আর্থিক, কারিগরী প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

ভারতে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির আন্দোলন (**Productivity Movement in India**) : —

অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নমান দেশের তুলনায় ভারতে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির ইতিহাস অত্যন্ত নতুন। অর্থাৎ অল্পদিনের। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে হইলে এই শক্তির বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। এই শক্তির বৃদ্ধি কোন একটি নির্দিষ্ট শিল্পে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, ইহা সর্বস্তরে হওয়াই কাম্য। ইহা না হইলে শ্রমিক তথা দেশের জীবনধারণের মান উন্নত হইতে পারে না। ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই আমাদের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ইহার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ এই উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচনার জন্য ১৯৫২ সালে ভারতে আসেন। ইহাদের সুপারিশের ভিত্তিতেই ভারতে জাতীয় উৎপাদিকা শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তী কালে আর এক বিশেষজ্ঞ দল ভারতে আসিয়া কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতির কয়েকটি শিল্প পরিদর্শন করেন। ইহার পরে ডঃ সারাভাইয়ের নেতৃত্বে ভারত হইতে এক প্রতিনিধিদল জাপান পরিদর্শন করেন। ১৯৫৮ সালে ভারতে স্বয়ংশাসিত জাতীয় উৎপাদিকা শক্তি পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পরিষদে মোট ৬০ জন সভ্য আছে। শ্রমিক, মালিক, সরকার প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়াই এই পরিষদ গঠিত। দিল্লীতে ইহার প্রধান কার্য্যালয়। এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে শাখা কার্য্যালয় আছে। এই

উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারত এশীয় উৎপাদিকা সংস্থার সভ্য হইয়াছে। এই শক্তি বৃদ্ধ করিতে পারিলে শ্রমিক তথা দেশ শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয় সমষ্টিগত ভাবে উৎসাহিত ও উপকৃত হইবে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কাহাকে বলে? এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(What is Scientific Management? Discuss briefly the objects of Scientific Management.)

2. শিল্পে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির দ্বারা ফললাভের জন্য টেলর কতকগুলি অবস্থার নির্দেশ দিয়াছেন। ঐ অবস্থাগুলি কি?

(Taylor laid down certain conditions for securing results by the application of Scientific Management in industry. What are those conditions?)

3. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(Discuss the Main Features of Scientific Management).

4. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

(Discuss the main advantages and Dis-advantages of Scientific Management)

5. শিল্প-সংস্কারের অর্থ ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(Briefly discuss the Meaning and objects of Rationalisation).

6. শিল্প-সংস্কারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Discuss the Advantages and Dis-advantages of Rationalisation).

7. শিল্প-সংস্কারের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

(Discuss the different stages of Rationalisation.)

8. ভারতীয় শিল্প-সংস্কার ও উহার সমস্যাবলী আলোচনা কর।

(Discuss the role of Rationalisation in Indian industries and its Problems).

9. শিল্প-সংস্কার ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

(Distinguish between Rationalisation and Scientific Management.)

10. শিল্প-সংস্কার ও জাতীয়করণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

(Distinguish between Rationalisation and Nationalisation)

11. উৎপাদিকা শক্তি মতামতের ব্যাখ্যা কর। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সহায়কগুলি কি কি ?

(Explain the concept of Productivity. Enumerate the factors to increase Productivity).

12. বর্ধিত উৎপাদন ও বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ? আলোচনা কর।

(Is there any difference between Increased Production and Increased-Productivity ? Discuss briefly.)

13. ভারতের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির আন্দোলন বর্ণনা কর।

(Discuss the Productivity Movement in India).

শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগঠন

(Organisation of Manufacturing Undertaking)

কোন শিল্পের অবস্থান নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Factors for Location of Industry) :—

কোন শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে উহার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। সুতরাং শিল্প প্রতিষ্ঠার সময় অত্যন্ত সচেতন হইতে হয়। যে সকল বিষয়ের উপর নিভর করিয়া শিল্পের স্থান নির্ধারণ করা হয় তাহাদিগকে প্রথমে **দুই শ্রেণীতে** ভাগ করা হয়। যেমন **মুখ্য ও গৌণ**।

এই **মুখ্য** বিষযগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(ক) **কাঁচামাল** (Raw Materials) :—

শিল্পের স্থান নির্ধারণে ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। দুই শ্রেণীর কাঁচামাল দেখা যায় যেমন : যাহা পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। যথা বালুকা, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি। আর অপর শ্রেণীর কাঁচামাল হইল যাহা সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে পাওয়া যায় না। যথা কয়লা, পাট, তুলা প্রভৃতি যে সকল কাঁচামাল সর্ব্বত্র পাওয়া যায় তাহারা শিল্পের স্থান নির্ধারণে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতে পারে না। কিন্তু যে সকল কাঁচামাল সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না সেই সকল কাঁচামাল শিল্পের স্থান নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই কারণেই লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, চিনি-শিল্প প্রভৃতি কাঁচামালের নিকটবর্তী স্থানে আকৃষ্ট হয়।

(খ) **শক্তি** (Power Resources) ঃ—

প্রাচীনকালে কয়লাই শক্তি সম্পদ হিসাবে অধিক ব্যবহৃত হইত। সেজন্য কয়লা ক্ষেত্রের নিকট অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে বিদ্যুৎ, খনিজ তৈল প্রভৃতিও শক্তিসম্পদ। অল্প খরচে ইহাদিগকে অনেক দূরে প্রেরণ করা যায়। সেজন্য বর্তমানে খনিজ অঞ্চল ছাডাও অন্যত্র শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে।

(গ) **শ্রমিক** (Labour) ঃ—

যে সকল স্থানে কম খরচে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় সেই সকল স্থানে শিল্প স্থাপন করা উচিত। সেইজন্য কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই শ্রম-শক্তি যদি গতিহীন হইয়া পড়ে তবে যেস্থানে শ্রমিক পাওয়া যায় সেই স্থানে শিল্প গড়িয়া উঠে। কিন্তু শ্রম-শক্তির গতি থাকিলে বিভিন্ন স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

(ঘ) **পরিবহন** (Transport) :—

পণ্যের মূল্যের উপর ইহার প্রভাব যথেষ্ট। পণ্য পরিবহন খরচ যদি খুব বেশী পড়িয়া যায় তবে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করা সমস্যা হইয়া উঠে। সেজন্য যেস্থানে পরিবহন খরচ কম, সেই স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

(ঙ) **বাজার** (Market) :—

শিল্পের স্থান নির্ধারণে বাজার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যে সকল শিল্প বিশুদ্ধ (অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতিতেও ওজন হ্রাস হয় না) পণ্য ব্যবহার করে তাহাদের স্থান বাজারের নিকট হওয়াই কাম্য। যে সকল শিল্পে কাঁচামাল বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হয় তাহাদের স্থানও বাজারের নিকট হওয়াই কাম্য। এমনকি পচনশীল, ভারী ওজনের পণ্য প্রভৃতির স্থানও বাজারের নিকট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(চ) **সামরিক গুরুত্ব** (Strategic Consideration) :—

যুদ্ধ দ্বারা শিল্প বিধ্বস্ত হয় বলিয়া বর্তমানে বিকেন্দ্রীয়করণের নীতি গৃহীত হইয়াছে। পরিবহন ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। যেজন্য সকলদেশেই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

গৌণ-বিষয় সমূহ :—

(ক) **ঐতিহাসিক আকস্মিকতা** (Historical Accident) :—

অনেক সময় দেখা যায় কোথাও কোন কারণে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলেই ধীরে ধীরে অনেক শিল্প ঐ স্থানে গড়িয়া উঠে। ফলে ঐ স্থানটি ক্রমে ক্রমে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। যেমন কানপুরের চর্ম-শিল্প।

(খ) **জলবায়ু** (Climate) :—

জলবায়ুর উপর নির্ভর করিয়াও অনেক শিল্প গড়িয়া উঠে। যেমন চা, কফি, তুলা বস্ত্র শিল্প প্রভৃতি। বিজ্ঞানের দ্বারা সাময়িক ভাবে কোথাও কৃত্রিম জলবায়ু অর্থাৎ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যায় সত্য কিন্তু ইহা অত্যন্ত ব্যয়-বহুল। এবং এই পদ্ধতিতে ব্যবসা করা লাভজনক হয় না।

(গ) **আর্থিক সুবিধা** (Financial Advantages) :–

অনেক সময় আর্থিক সুবিধার উপর নির্ভর করিয়াও শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সেজন্য যে সকল দেশে বা অঞ্চলে ঋণদান সমিতিগুলি অধিক সেই সকল স্থানে অধিক পরিমাণ শিল্প গড়িয়া উঠে।

(ঘ) **অন্যান্য সুবিধা** (Other Advantages) :—

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও অনেক সময় অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। এই অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে নিম্নোক্তগুলিই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জমির মূল্য, পরিপূরক শিল্প, বাজারে সুনাম, সরকারী নীতি প্রভৃতি।

সুতরাং কোন শিল্পের স্থান নির্ধারণ উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

কারখানা বাড়ী (Factory Building) :—

এই স্থানে শ্রমিকেরা পণ্য উৎপাদন করে। বিভিন্নপ্রকার উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এই বাড়ীতে থাকে। শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকগণকে উৎপাদনে উৎসাহিত করাই একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য দরকার এই কারখানা বাড়ী। কোন বিভাগের অসুবিধা অন্য বিভাগে যেন অসুবিধার সৃষ্টি না করে তাহার প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাড়ীর আয়তন, উচ্চতা, গঠন প্রভৃতি কি প্রকার হইবে তাহা শিল্পের প্রকৃতি দ্বারা অনেকাংশে নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের বিভিন্নপ্রকার সমস্যা থাকিলেও তাহাদের কারখানা বাড়ী নির্মাণের সময় **নিম্নোক্ত বিষয়গুলির** প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

(ক) ঐ বাড়ী যেন অগ্নি অথবা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

(খ) বাড়ীর ভিতরে যেন যথেষ্ট পরিমাণ আলোবাতাস থাকে।

(গ) ভবিষ্যতে প্রয়োজনে যেন বাড়ীটি সম্প্রসারণ করা যায়।

(ঘ) শ্রমিকরা যেন উপযুক্ত স্থানে চলাফেরা করিয়া কাজ করিতে পারে।

(ঙ) প্রয়োজনে বাড়ীর তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকিবে।

(চ) বাড়ীটি যেন সুশ্রী ও মনোহর দেখায়।

কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাসের অর্থ, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়সমূহ (Meaning, Features and factors of a factory lay out) :—

পণ্য উৎপাদন করিবার জন্য কারখানার ভিতরে উহার যন্ত্রপাতি ঠিকভাবে [illegible] কারখানার অভ্যন্তরীণ বিন্যাস বলে।

এই আভ্যন্তরিণ বিন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য হইল সব চাইতে কম খরচে উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপন্ন করা। ইহাতে কাঁচামালের অপচয় কম হয়। এবং ঠিকভাবে উৎপাদন কার্য অগ্রসর হইতে পারে।

যে সকল বিষয়ের উপর এই আভ্যন্তরীণ বিন্যাস নির্ভর করে তাহার মধ্যে নিম্নোক্তগুলিই প্রধান।

(ক) **শিল্পের প্রকৃতি** (Nature of the Industry) :—

ইহার উপর কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস বিশেষভাবে নির্ভর করে। কতকগুলি শিল্প আছে যাহা বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে। যেমন কাগজ, সূতা প্রভৃতি। আবার অন্য একপ্রকার শিল্প দেখা যায় যাহাতে বিভিন্ন শিল্পের উৎপন্ন পণ্যের সংযোগ দ্বারা নতুন জিনিষ তৈয়ার করিতে হয়। যেমন পাদুকা, রেল-ইঞ্জিন প্রভৃতি। ইহাদের একত্রীকরণ শিল্পও বলা হয়। সুতরাং এই দুইপ্রকার শিল্পের অভ্যান্তরীণ বিন্যাস এক হইতে পারে না।

(খ) **উৎপাদনের পরিমাণ** (Quantity of Production) :—

একই শিল্পের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্রায়তন ও অপরটি বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস এক হইতে পারে না। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের এই বিন্যাস একপ্রকার হইবে আর ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের বিন্যাস অন্যপ্রকার হইবে।

(গ) **দ্রব্যের প্রকৃতি** (Nature of the Product)—:

দ্রব্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াও আভ্যন্তরীণ বিন্যাস পৃথক পৃথক হইতে পারে। যেমন শুষ্ক পণ্যের জন্য একপ্রকার বিন্যাস আবশ্যক। ভারী ও হাল্কা পণ্যের জন্য অন্যপ্রকার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস দরকার। সুতরাং দ্রব্যের প্রকৃতির পার্থক্যের জন্যও আভ্যন্তরীণ বিন্যাস পৃথক হইতে পারে।

(ঘ) **শ্রমিক প্রকৃতি** (Type of Workers) :

যে শিল্পে শুধুমাত্র পুরুষ শ্রমিক দরকার তাহার বিন্যাস একপ্রকার হইবে। আর যে শিল্পে নারী শ্রমিক দরকার তাহার বিন্যাস অন্যপ্রকার হইবে। সুতরাং শ্রমিকের প্রকৃতির পার্থক্যের জন্য আভ্যন্তরীণ বিন্যাসও পৃথক হইয়া থাকে।

(ঙ) **উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত কাজের প্রকৃতি** (Type of the Operations) : —

যে সকল শিল্প একটা নির্দিষ্ট মান সম্পন্ন কাঁচামাল দ্বারা নির্দিষ্ট কয়েকটি সহজ ও সরল প্রকৃতির পণ্য তৈয়ারী করে তবে তাহার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস পদ্ধতি

একপ্রকার হইবে। অপরদিকে যদি কোন নির্দিষ্ট মানহীন কাঁচামালের সাহায্যে বিভিন্নপ্রকার পণ্য উৎপন্ন করিতে হয় তবে তাহার বিন্যাস পদ্ধতি অন্যপ্রকার হইবে। সুতরাং উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত কাজের প্রকৃতি দ্বারাও আভ্যন্তরীণ বিন্যাস পৃথক হইয়া থাকে।

সুতরাং আভ্যন্তরীণ বিন্যাস পদ্ধতি উপরোক্ত মুখ্য বিষয়গুলি দ্বারাই অধিকাংশ স্থানে নির্ধারিত হয়।

অফিস আভ্যন্তরীণ বিন্যাসের অর্থ ও বিষয়সমূহ (**Meaning on an Office layout and factors on which it depends**):—

কোন অফিসের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, চেয়ার, টেবিল, কর্মীদের বসিবার স্থান প্রভৃতি স্থাপন-পদ্ধতিকে অফিসের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস বলা হয়। ইহাতে কাজের গতি বৃদ্ধি পায় এবং উহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়।

যে সকল বিষয়ের উপর এই বিন্যাস নির্ভর করে অর্থাৎ যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া এই বিন্যাস করা হয় তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

১। ভালভাবে অফিসে বসিয়া কাজ কারবার জন্য, মূল্যবান কাগজপত্র রক্ষা করার জন্য ঘরগুলি যথেষ্ট আলোবাতাসযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং উপযুক্ত স্থান একান্ত প্রয়োজন।

২। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন করিতে হইবে এবং উহাদের মধ্যে উন্নত সম্পর্ক স্থাপনও করিতে হইবে। এই ক্রিয়াগত বিন্যাসে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মীর জন্য পৃথক পৃথক ঘরও করিতে হইবে।

৩। কারবারের প্রকৃতি অনুযায়ী সমগ্র অফিসের কাজকে এমনভাবে বিন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত কাজ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে গুণগত উৎকর্ষ বজায় রাখিয়া সম্পন্ন করা যায়।

৪। কর্মীদের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থান দিতে হইবে। কারণ তাহারা যদি ঠিকভাবে বসিতে না পারে তবে তাহারা কাজ করিতে পারিবে না। এইরূপ স্থান নির্বাচনের সময় ভবিষ্যতের দিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হইবে।

৫। একই তলে সমস্ত অফিসটি হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে কর্মীদের পরিশ্রম অনেক কম হয় আর সময়ের অপব্যবহারও হয় না।

৬। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরের পরিবর্তে একটা বৃহৎ অফিস বাঞ্ছনীয়। ইহাতে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৭। যে সকল বিভাগের সহিত বাহিরের লোকের সম্পর্ক বেশী, যেমন ক্যাশ, তাহা প্রবেশ দ্বারের নিকট অবস্থিত হওয়া দরকার।

৮। প্রাকৃতিক আলোবাতাস ছাড়াও, কৃত্রিম আলোবাতাসের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। যন্ত্রপাতির শব্দে যাহাতে কোন কর্মীর কাজের অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সেজন্য অফিসের কোন পৃথক ঘরে ঐ সকল যন্ত্রপাতি রাখা বাঞ্ছনীয়।

১০। কর্মীদের গল্প করিয়া সময় যাহাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এইজন্য টেবিলগুলি মুখামুখি না সাজাইয়া এক সারির পশ্চাতে অপর সারি করিয়া সাজানো উচিত।

অফিসের বিভিন্ন বিভাগসমূহ (Various departments of the Office) :—

কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন অফিসের বিভাগ বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। কোন নির্দিষ্ট নীতি এক ব্যাপারে দেখা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন অফিস দেখিয়া তাহার অভিজ্ঞতা হইতে এই বিভিন্ন বিভাগ নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে

(ক) **ক্যাশ বিভাগ** :—

কোন অফিসের সমস্ত আয় ব্যয় নগদ, অথবা চেকে হইয়া থাকে। ক্যাশিয়ারই এই বিভাগের প্রধান কর্মচারী। প্রয়োজন বোধে তিনি সহকারী লইতে পারেন। সুতরাং প্রতিটি অফিসে ক্যাশ বিভাগ রাখা প্রয়োজন।

(খ) **হিসাব বিভাগ** :—

কারবারে বিভিন্ন প্রকার লেনদেন হইয়া থাকে। তাহাদের হিসাব রক্ষণ, হিসাব পরীক্ষা, তাহার সততা নির্ণয় প্রভৃতি এই বিভাগের কাজ। হিসাব রক্ষকই এই বিভাগের প্রধান কর্মচারী। কারবার খুব বড হইলে এই বিভাগে বিভিন্ন সহকারী লওয়া হয়। ইহাতে কাজটী ভালভাবে সম্পন্ন হয়।

(গ) **ষ্টেশনারী বিভাগ** :—

অফিসের বিভিন্ন বিভাগে কাগজ, কলম, কালি, সুতা, প্রভৃতি এই বিভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। অফিস খুব বড হইলে এই বিভাগের গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) **চিঠিপত্র আদান-প্রদান বিভাগ :—**

প্রতিষ্ঠানকে বাহিরের বিভিন্ন ব্যক্তি চিঠিপত্র লিখিতে পারে। অর্ডার দিতে পারে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন বাহিরের ব্যক্তিকে চিঠিপত্র লিখিতে পারে। সেজন্য একটি পৃথক চিঠিপত্র আদানপ্রদান বিভাগ অফিসে থাকা দরকার।

(ঙ) **এস্টাব্লিশমেণ্ট বিভাগ :—**

কারবারের বিভিন্ন ব্যক্তির নিয়োগ, বদলী, উন্নতি, অবনতি, অবসর, ছুটি, প্রভৃতির হিসাব রাখা দরকার। এই সকল হিসাবপত্র এই বিভাগে রক্ষা করা হয়।

(চ) **ক্রয় বিভাগ :—**

প্রতিষ্ঠানটি যাহা কিছু ক্রয় করিবে তাহার হিসাব রাখা একান্ত দরকার। অন্যথায় অনেক অসুবিধা হয়। একজন অভিজ্ঞ কর্মীর দ্বারা এই বিভাগটি পরিচালিত হয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে এই ক্রয় বিভাগকে বিক্রয় বিভাগ হইতে পৃথক করিয়া পরিচালনা করা হয়।

(ছ) **বিক্রয় বিভাগ :—**

কারবারের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ এই বিভাগে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ওজন, মোড়ক প্রভৃতি কার্য্য এই বিভাগেই করা হয়। একজন অভিজ্ঞ কর্মীর হাতে এই বিভাগের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রয়োজনে তিনি সহকারী লইতে পারেন।

(জ) **পরিব্যয় বিভাগ :—**

পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন স্তরে খরচ কত পড়িয়াছে তাহা এই বিভাগ নির্দ্ধারণ করে। কোন পণ্য কি পরিমাণ উৎপাদন করিলে মুনাফা বেশী হইবে তাহাও এই বিভাগ স্থির করিয়া দেয়।

উপরোক্ত বিভাগ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানে আইন-সংক্রান্ত বিভাগ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার বিভাগ, মালগুদাম বিভাগ, টাইপ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, প্রভৃতিও থাকিতে পারে।

নথিবদ্ধকরণের অর্থ ও নীতিসমূহ (Meaning and P inciples of Filing) :—

ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ঠিকভাবে উপযুক্ত স্থানে সাজাইয়া রাখার পদ্ধতিকে **নথিবদ্ধকরণ** বলে। কারবারে ইহার গুরুত্ব অসাধারণ। কারণ

ইহা ঠিকভাবে সাজাইয়া না রাখিলে কাগজপত্র হারাইয়া যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

আদর্শ নথিবদ্ধকরণের **নীতিসমূহ** :—

১। সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়া যায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২। এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে উহা সহজে পরিবর্তন করা যায়।

৩। সব সময় চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে ঐ নথিবদ্ধকরণ পদ্ধতি যেন অতি সহজ ও সরল হয়।

৪। ঐ সকল নথি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। সমস্ত সময় প্রয়োজনীয় দলিলকে কম প্রয়োজনীয় দলিল সমূহ হইতে পৃথক করিয়া নথিবদ্ধকরণ করিতে হইবে।

৬। সবশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, এই নথিবদ্ধকরণের খরচ যেন বেশী পড়িয়া না যায়।

নথিবদ্ধকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of Filing) :—

যে সকল বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই নথিবদ্ধকরণ কার্য করিতে হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(ক) **বর্ণানুক্রমে** :—

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি, বিষয় প্রভৃতির নামের প্রথম অক্ষর লইয়া এই নথিবদ্ধ করা হয়।

(খ) **বিষয় অনুসারে** :—

পৃথক পৃথক চিঠিপত্রের বিষয় অনুসারে উহাদিগকে এই পদ্ধতিতে নথিবদ্ধ করা যায়।

(গ) **তারিখ অনুসারে** :—

যে সকল কারবারে চিঠিপত্রের তারিখ অতি উল্লেখযোগ্য সে সকল স্থানে তারিখ অনুসারে নথিবদ্ধ করা হয়।

(ঘ) **অঞ্চল অনুসারে :—**

এই পদ্ধতিতে যেস্থানে চিঠিপত্র প্রেরণ করিতে হইবে অথবা যেস্থান হইতে উহা আসিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এই আঞ্চলিক নথিবদ্ধ করা হয়।

অনুক্রমণী প্রণয়নের অর্থ ও পদ্ধতি (Meaning and Method of Indexing) :—

কোন চিঠি কারবারে লেখার পরে ভবিষ্যতে উহার প্রতিলিপির প্রয়োজন হইতে পারে। সেজন্য ঐ প্রতিলিপি সমূহ এমনভাবে সাজাইয়া রাখিতে হয় যাহাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলেই উহা সহজেই খুঁজিয়া বাহির করা যায়। সেজন্য দরকার হয় উহাদের একটা তালিকা প্রণয়ন। এই তালিকা প্রস্তুতকরণকেই বলা হয় **অনুক্রমণী প্রণয়ন**।

ইহার **পদ্ধতি :—**

১। **সাধারণ সূচী :—**

এই পদ্ধতিতে সূচীপত্রের বহিতে A. B........D পর্যন্ত বর্ণগুলি একটি পৃষ্ঠায় লিখিতে হয়। এবং ঐ বর্ণ অনুযায়ী পত্রদাতাদের নাম লিখিয়া রাখা হয়। ঐ বর্ণ হইতে যে কোন পত্রদাতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবর সহজেই পাওয়া যায়।

২। **স্বরবর্ণ অনুযায়ী সূচী :—**

এই পদ্ধতিতে নামের প্রথম স্বরবর্ণানুযায়ী সূচী তৈয়ার করা হয়। ইংরেজী বর্ণমালার A. E. I. O. U. এই স্বরবর্ণ অনুযায়ী প্রতি পৃষ্ঠায় ঘর থাকে। উহাতে নাম অনুযায়ী নথিবদ্ধের কাগজপত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখিয়া রাখিতে হয়।

৩। **কার্ড সূচী :—**

এই পদ্ধতির গুরুত্ব বর্তমানে বেশী দেখা যায়। কারণ ইহা অতি সহজ ও সরল পদ্ধতি। ইহাতে প্রতিটি পত্র গ্রহীতার সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ সংক্ষেপে একটি কার্ডে লিখিয়া রাখা হয়। এবং ঐ কার্ড 'দেরাজে' বর্ণ অনুসারে সাজাইয়া রাখা হয়।

সংগঠনের দক্ষতা বিচার পদ্ধতি (Test applied to check up the efficiency of an Organisation) :—

যে সকল পদ্ধতির দ্বারা কোন সংগঠনের দক্ষতা বিচার করা যায় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। **আর্থিক নিয়ন্ত্রণ :—**

এই পদ্ধতিতে হিসাবের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান বাহির করা হয়। এই লাভের অঙ্কের উপর ভিত্তি করিয়া কোন কারবারের সংগঠনের দক্ষতা বিচার করা যায়।

২। **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ—**

ইহা দ্বারাও সংগঠনের দক্ষতা বিচার করা যায়। উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া এই নিয়ন্ত্রণ ব্যয়কে কম রাখার চেষ্টা করা হয়। এই ব্যয় কম হইলে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এবং কারবার সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে।

৩। **বাজেট নিয়ন্ত্রণ :**

সরকারের আয়ব্যয়কে বাজেট বলা হয়। অতীতে ও বর্তমানে সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের উৎপাদন, বিক্রয়, প্রভৃতি নির্ধারিত হইতে পারে। ইহাতে সহজে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। এইরূপ পরিকল্পনাকে কারবারী বাজেট বলে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য যে বাজেট প্রস্তুত করা হয় তাহাকে সামগ্রিক বাজেট বলে। এই বাজেটের উপর ভিত্তি করিয়াও কোন সংগঠনের দক্ষতা বিচার করা যায়।

৪। **কাজের পরিমাপ :—**

এই পদ্ধতিতে পূর্ব্বেই একটি কাজের পদ্ধতি স্থির করা হয়। শ্রমিকগণকে উহা সম্পন্ন করিবার জন্য বিভিন্নপ্রকার উৎসাহ দেওয়া হয়। পরিশেষে কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়া সংগঠনের দক্ষতা বিচার করা হয়।

৫। **পরিসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :—**

কাজের বিভিন্ন তথ্য, তালিকা প্রভৃতি দ্বারা কাজের বিভিন্ন লোকের কর্মক্ষমতা পরিমাপ করা যায়। এইরূপ ব্যক্তিগত কর্মীর কর্মক্ষমতা হইতে সহজেই প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতা পরিমাপ করা যায়।

৬। **গুণগত নিয়ন্ত্রণ :—**

এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক কর্মীকে পূর্ব্বেই কাজের গুণ সম্পর্কে সাবধান করিয়া দেওয়া হয় এবং পরে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ যাচাই করিয়া লওয়া হয়।

৭। **লগ্নির আয় :—**

যে পরিমাণ অর্থ লগ্নী করা হইয়াছে তাহার উপর প্রাপ্ত অর্থ দিয়াও ঐ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বিচার করা যায়। নিম্নরূপে ইহা নির্ণয় করা হয় :—

$$\text{লগ্নির উপর আয়} = \frac{\text{লাভ}}{\text{বিক্রয়}} \times \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{লগ্নীকৃত মূলধন}} \times ১০০.$$

৮। **অনুপাতের হিসাব :—**

কারবারের বিভিন্ন কার্যক্ষমতা এই পদ্ধতি দ্বারা নির্ণয় করা যায়। ক্রয়দক্ষতার অনুপাত, পণ্য ব্যবহারের অনুপাত, মূলধনের অনুপাত প্রভৃতি এই পদ্ধতিতে হিসাব করা যায়। এবং উহা হইতে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বিচার করা যায়।

৯। **সম-কারবারী প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনা :—**

বিভিন্ন সম-জাতীয় কারবারের সহিত তুলনা করিয়াও কোন প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের দক্ষতা বিচার করা যায়।

১০। **উৎপাদিকা শক্তির তুলনা :—**

কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা তাহা এই পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়। এবং ইহা দ্বারাই ঐ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাও বিচার বা পরিমাপ করা যায়।

বিভিন্নপ্রকার মজুরি প্রদান পদ্ধতি ও উহাদের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা কর (**Discuss the Various methods of Wage-Payment and their respective Merits and Demerits**) :—

১। **সময় ভিত্তিক মজুরি** (**Fine Rate**) :—

এই পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট সময় কাজ করার জন্য মজুরি দেওয়া হয়। ইহা প্রতিদিন, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি সময়ের উপর ভিত্তি করিয়া দেওয়া হইতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে পণ্যের পরিমাণ অপেক্ষা গুণই অধিক প্রয়োজন সে সকল স্থানে এই পদ্ধতি একান্ত দরকার। নির্দ্দিষ্ট সময় কাজ করিলেই শ্রমিকের মজুরি পাইবে।

সুবিধা :—

এই পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল, শ্রমিকগণ সহজেই তাহাদের প্রাপ্য মজুরি হিসাব করিতে পারে। নির্দিষ্ট মানের পণ্য উৎপাদন করিতে এই পদ্ধতি একান্ত দরকার। ইহাতে বিভিন্ন শ্রমিকের মজুরির মধ্যে তারতম্য ঘটাইতে পারে না।

অসুবিধা ঃ—

এই পদ্ধতিতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। কারণ দিনের শেষে উভয়েই সমান মজুরি পায়। ইহাতে কারবারের আনুপাতিক স্থির খরচা বৃদ্ধি পায়। দক্ষ শ্রমিক এই পদ্ধতিতে অদক্ষ হইয়া যায়।

২। **ঠিকা অথবা কার্যহার মজুরি** (Piece Rate) :—

শ্রমিকেরা কাজের পরিমাণ অনুযায়ী ইহাতে মজুরি পায়। ফলে যে যেমন কাজ করে সে তেমনি মজুরি পায়। একটি কাজের পরিমাণ ইহাতে স্থির করা হয়। উহার ভিত্তিতে মজুরির হার নির্ধারিত হয়।

সুবিধা ঃ —

কাজের উৎসাহ ইহাতে বৃদ্ধি পায়। কারণ ইহাতে বেশী কাজ করিলে বেশী মজুরি পাওয়া যায়। তদারকী খরচও ইহাতে কম পড়ে। দ্রুত প্রচুর পণ্য এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়।

অসুবিধা ঃ—

পণ্যের মান এই পদ্ধতিতে বজায় রাখা যায় না। কারণ সবাই বেশী পণ্য উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। প্রচুর পরিমাণে কাঁচামালের ও যন্ত্রপাতির অপচয় হইতে দেখা যায়। বিভিন্নপ্রকার মজুরি প্রাপ্তির জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়।

৩। **শ্রম-সময় হার মজুরি** (Task Rate Wage) :—

সময়ভিত্তিক ও ঠিকা মজুরি পদ্ধতির সমন্বয়ে এই পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে শ্রমিককে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার জন্য একটি মজুরি দেওয়া হয়। আবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে উহা সম্পন্ন করিলে তাহাকে আরও কোন পুরস্কার দেওয়া হয় না।

সুবিধা ঃ—

শ্রমিক খরচ কত পড়িবে তাহা পূর্বেই জানা যায়।

অসুবিধা ঃ—

দক্ষ শ্রমিকেরা এই পদ্ধতিতে নিরুৎসাহিত হয়। কারণ তাহাদের দক্ষতার কোন দাম দেওয়া হয় না।

৪। **প্রগতিশীল মজুরি (Progressive Rate) :—**

টাস্ক মজুরি প্রথার অসুবিধা দূর করিবার জন্য এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটা নির্দিষ্ট মজুরি পায়। আর যাহারা ঐ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ঐ কাজ সম্পন্ন করিতে পারে তাহারা নির্দিষ্ট মজুরি এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগে কাজ শেষ করার জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে।

সুবিধা :—

অতিরিক্ত আয়ের আশায় শ্রমিকেরা এই পদ্ধতিতে প্রচুর পরিশ্রম করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। তাহারা শান্তিতে বসবাস করিতে পারে।

অসুবিধা :—

দক্ষ শ্রমিকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে এই পদ্ধতিতে কাজ করিতে পারে না। কারণ ইহাতে ক্রম হ্রাসমান, অতিরিক্ত মজুরি প্রথা রহিয়াছে। এই পদ্ধতিতে কাজের উৎকর্ষ অনেক কমিয়া যায়।

৫। **বোনাস মজুরি (Bonus System) :—**

এই পদ্ধতিতে কোন কাজ শেষ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত থাকে। যদি কেহ ঐ কাজ ঐ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারে তবে নির্দিষ্ট মজুরি পাইবে। কিন্তু যে শ্রমিক ঐ কাজ ঐ বর্ণিত সময়ের পূর্বেই শেষ করিতে পারিবে যে নির্দিষ্ট মজুরি এবং যে সময়টুকুর আগেই উহা সম্পন্ন করিতে পারিবে তাহার জন্য একটি অংশ বোনাস হিসাবে পাইবে।

সুবিধা :—

শ্রমিকেরা এই পদ্ধতিতে অনেক অর্থ আয় করিতে পারে। ইহা দ্বারা কাজের মানের কোন অপকর্ষ সৃষ্টি হয় না।

অসুবিধা :—

ইহা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। সাধারণ শ্রমিক তাহার প্রাপ্য হিসাব বুঝিতে পারে না।

৬। **সর্বনিম্ন মজুরি** (Minimum Wage) :—

এই পদ্ধতিতে প্রতিটি শ্রমিক কমপক্ষে তাহার জীবনযাত্রার জন্য একটা নির্দিষ্ট মজুরি পাইবে।

সুবিধা :—

শ্রমিকেরা কোনপ্রকারে এই পদ্ধতিতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আর ইচ্ছা করিলে অধিক পরিশ্রম করিয়া অধিক অর্থ উপার্জন করিতেও পারে।

অসুবিধা :—যে মজুরি শ্রমিকেরা এই পদ্ধতিতে পায় তাহা অতি নগণ্য। তাহাদের বাঁচিয়া থাকাই এক সমস্যা হইয়া দেখা দেয়।

৭। **পার্থক্যমূলক কার্যহার** (Differential Piece Rate) :—

এই পদ্ধতি **টেলর** আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে দুই প্রকারে মজুরি দেওয়া হয়। একটা কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করিলে উচ্চহারে পরিশ্রম দেওয়া হয় আর ঐ সময়ে শেষ করিতে না পারিলে অপেক্ষাকৃত নিম্নহারে শ্রমিককে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

সুবিধা :—

দক্ষ শ্রমিকেরা আরও দক্ষ হইয়া উঠে। কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ শ্রমিকেরাও দক্ষ হইতে চেষ্টা করে।

অসুবিধা :—

অদক্ষ শ্রমিকেরা এই পদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হয়। তাহারা নিজেদের ভিতরে বিভেদ সৃষ্টি করে।

৮। **মুনাফার অংশীদার** (Profit Sharing) :—

এই পদ্ধতিতে শ্রমিকেরা তাহাদের নির্দিষ্ট মজুরি পায় এবং মুনাফার একটা অংশও পায়।

সুবিধা :—

শ্রমিক বিরোধ এই পদ্ধতিতে মীমাংসা হয়। শ্রমিকেরা অধিক কাজ করে। কারণ মুনাফা পাইবার আশায়। বিভিন্নপ্রকার অপচয় ইহাতে দূর হয়।

অসুবিধা :—

মুনাফা শ্রমিকের মধ্যে ভাগ করা একটা সমস্যা। মুনাফার কত অংশ শ্রমিক পাইবে এবং কতটুকু মালিক পাইবে তাহাও একটি বিতর্কিত বিষয়। মুনাফা কোন কারণে না হইলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা দেয়।

সময়-ভিত্তিক মজুরি ও ঠিকা মজুরির সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Time Rate and Piece rate System of Wage Payment) :—

১। অন্যান্য মজুরি প্রদানের পদ্ধতি অপেক্ষা ঠিকা মজুরি অনেক ভাল ব্যবস্থা। ইহাতে ব্যয় সংকোচ করা যায় এবং ন্যায় নীতির ভিত্তিতে মজুরি প্রদান করা যায়। শ্রমিকেরা এই পদ্ধতিতে অনেক উৎসাহ পায়। কিন্তু এই প্রকার সুবিধা সময়-ভিত্তিতে পাওয়া যায় না। দিনের শেষে, মাসের শেষে শ্রমিকেরা একটা নির্দিষ্ট অর্থই পাইয়া থাকে। ইহাতে শ্রমিকের উৎসাহিত হয় না।

২। পণ্যের মোট উৎপাদন ব্যয় ঠিকা পদ্ধতিতে কম পড়ে। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে একক পণ্য প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়। কিন্তু সময়-ভিত্তিতে ইহা সম্ভব হয় না। কারণ পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এই পর্দ্ধতিতে দেখা যায় না। সুতরাং উৎপাদন ব্যয়ও কম হয় না।

৩। ঠিকা পদ্ধতিতে কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। কারণ শ্রমিকেরা নিজেরাই দল সৃষ্টি করিয়া দ্রুত ঐ কাজ শেষ করে। ইহাতে তাহাদের আয়ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এরূপ কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি সময় ভিত্তিতে সম্ভব নয়।

৪। ঠিকা পদ্ধতিতে শ্রমিকগণকে কোনপ্রকার তদারক করিতে হয় না। তাহারা নিজেরাই কার্য সম্পন্ন করে। ইহাতে পর্যবেক্ষণ খরচ কম পড়ে। কিন্তু ইহা সময় ভিত্তিতে সম্ভব নয়। সময় ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ একান্ত দরকার। সেজন্য পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পায়।

(৫) ঠিকা পদ্ধতিতে সুযোগ্য ও দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা যায়। ইহাতে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। কিন্তু সময় ভিত্তিতে দক্ষ কর্মী নিয়োগ করা যায় না। কারণ দক্ষ শ্রমিক সময়" ভিত্তিতে কাজ করিতে রাজী হয় না। ইহাতে তাহাদের লোকসান হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার উন্নত ধরণের আরও অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার হইয়াছে। ইহাতে শ্রমিকেরা কাজ করিতে অধিক পরিমাণে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার উৎসাহমূলক মজুরি পদ্ধতি (Different types of incentive wage Payment) :—

বর্তমানে শ্রমিকগণকে আরও উৎসাহিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার মজুরি পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) **হালসী পদ্ধতি** (Halsey System) :—

এই পদ্ধতিতে কোন কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিবার জন্য একটা মজুরি দেওয়া হয়। কিন্তু যে শ্রমিক ঐ সময়ের পূর্বেই ঐ কাজ সম্পন্ন করিবে তাহাকে একটি বোনাস দেওয়া হইবে। যেমন,

ধরা যাক কোন কাজের সময় ১৬ ঘণ্টা। একটি শ্রমিক উহা ১২ ঘণ্টায় শেষ করিয়াছে। প্রতি ঘণ্টার মজুরি হইল ১ টাকা। এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে, যে সময় বাঁচিয়া যাইবে তাহার ৫০ ভাগ মজুরি শ্রমিককে বোনাস হিসাবে দেওয়া হইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মজুরির পরিমাণ হইবে :—

প্রকৃত সময় × ঘণ্টা প্রতি হার + ৫০% বাঁচান সময় × ঘণ্টা প্রতি হার।

অতএব $১২ \times ১ + \frac{৫০}{১০০} \times ৪ \times ১ = ১৪$ টাকা।

সুবিধা=শ্রমিকের কর্মক্ষমতা ইহাতে বৃদ্ধি পায়। কাজ করিতে উৎসাহ পায়।

অসুবিধা=ইহা অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি। অনেক সময় শ্রমিক ৫০ শতাংশ সময়ের মজুরি লইতে রাজী হয় না।

(২) **রোয়াণ বোনাস পদ্ধতি** (Rowan Bonus System) :—

অনেক সময় ইহা হালসী পদ্ধতির অনুরূপ। বাঁচান সময়ের জন্য মজুরি হিসাব পদ্ধতিটি একটু স্বতন্ত্র। উপরের উদাহরণ অনুযায়ী এই পদ্ধতিতে শ্রমিকের মজুরি নিম্নরূপ হইবে।

$$\text{প্রকৃত সময়} \times \text{হার} + \frac{\text{বাঁচান সময়}}{\text{নির্ধারিত সময়}} \times \text{প্রকৃত সময়} \times \text{ঘণ্টা প্রতি হার।}$$

$$\text{অতএব } ১২ \times ১ + \frac{৪ \text{ ঘণ্টা}}{১৬ \text{ ঘণ্টা}} \times ১২ \text{ ঘণ্টা} \times ১ \text{ টাকা} = ১৫ \text{ টাকা।}$$

সুবিধা :—

(১) শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(২) মালিকেরাও এই পদ্ধতিতে লাভবান হয়।

অসুবিধা :—

(১) বাঁচানো সময়ের সমস্ত সুবিধা শ্রমিকেরা ভোগ করিতে পারে না।

(৩) **মেরিকের বহুগুণা কার্যপদ্ধতি** (Merick's Multiple Piece Rate) :—

সকল শ্রমিক সমান কাজ করিতে পারে না। সেজন্য মেরিক এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তিনি সমস্ত শ্রমিকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম

শ্রেণীতে তিনি নতুন শ্রমিকের কথা বলিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাধারণ শ্রমিকের কথা বহিযাছেন আর তৃতীয় শ্রেণীতে তিনি দক্ষ শ্রমিকের কথা বলিয়াছেন। এই দক্ষ শ্রমিককে তিনি বেশী মজুরি প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন।

(৪) **গ্যান্টের শ্রম সময় ও বোনাস পদ্ধতি** (Gantt's Task and Bonus System) :—

সময় ও ঠিকা ভিত্তিতে এই পদ্ধতির সৃষ্টি হইযাছে। দক্ষ শ্রমিকেরা এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট মজুরি ও উপরন্তু বোনাস পাইবে। আর অদক্ষ শ্রমিকেরা মাত্র নির্দিষ্ট হারে মজুরি পাইবে।

(৫) **এমার্সণের দক্ষতা মজুরি পদ্ধতি** (Emerson's Efficiency Wage System) :—

এই পদ্ধতিতে শ্রমিকের জন্য নির্দিষ্ট মজুরি ঠিক থাকে। কোন শ্রমিক সম্পূর্ণ কাজ করিতে না পারিয়া যদি ⅔ অংশ সম্পন্ন করে তবে দৈনিক মজুরির একটা শতকরা অংশ যেমন ৫ ভাগ বোনাস হিসাবে পাইবে। এই ন্যূনতম অংশ অপেক্ষা শ্রমিক যত বেশী অংশ করিতে পারিবে তাহার মজুরি ও বোনাসের পরিমাণ এই পদ্ধতিতে তত বেশী হইবে।

অন্যান্য প্রেরণাদায়ক মজুরির পদ্ধতির মধ্য প্রগতিশীল হার, সহ-অংশীদারী, মুনাফা শরিকানা পদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুনাফার শরিকানা ও সহ-অংশীদারী মজুরি পদ্ধতি (Profit sharing and co-partnership method of wage Payment) :--

বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতিতে শ্রমিকের মজুরি প্রদান করা হইয়া থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে এই মজুরি প্রদান ব্যবস্থারও পরিবর্তন হইতেছে। নতুন নতুন পদ্ধতির দ্বারা সমগমত শ্রমিকগণ সন্তুষ্ট করিয়া রাখা যায়। ইহা তাহাদের জীবন-ধারণের মানকে ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করে। যে সকল পদ্ধতিতে মজুরি প্রদান করা হয় তাহার মধ্যে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মুনাফার শরিকানা পদ্ধতিতে বলা হয় যে, শ্রমিকেরা তাহাদের কাজের জন্য একটা নির্দিষ্ট মজুরি পাইবে। আর বৎসর শেষে প্রতিষ্ঠানের যে লাভ হইবে তাহার একটা অংশও তাহারা পাইবে। ইহাই মুনাফা শরিকানা মজুরি পদ্ধতির প্রতিপাদ্য বিষয়।

সুবিধা ঃ—

(১) ইহা দ্বারা শ্রমিক ঐক্য স্থায়ী হয় এবং শিল্প ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) এই পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য মালিকই চেষ্টা করে না। অন্য দিকে শ্রমিকেরাও চেষ্টা করে। কারণ মুনাফার সহিত তাহাদের সংযোগ আছে।

(৩) এই পদ্ধতিতে কোন তদারকী ব্যয় নাই। কারণ শ্রমিকেরাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কাজ করিয়া চলে।

(৪) ইহাতে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকায় অধিক দক্ষ শ্রমিক কাজ করিতে রাজী নয়।

(৫) কাঁচা মাল ও অন্যান্য সম্পদের অপচয় এই পদ্ধতিতে অনেক কম হয়। কারণ শ্রমিকেরা যত্নসহকারে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

(৬) এই পদ্ধতিতে কারবারে শ্রমিকগণ স্থায়ীভাবে কাজ করিতে পারে বলিয়া পণ্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

অসুবিধা ঃ—

(১) এই পদ্ধতিতে মুনাফার যে অংশ শ্রমিকগণের মধ্যে বণ্টিত হয় তাহা কোন নীতি অনুযায়ী হয় না। খেয়াল খুশীমত হইয়া থাকে।

(২) ইহাতে শ্রমিকগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। কারণ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা এক হয় না। এই মুনাফা কম হইলে শ্রমিকগণ মালিকের সহিত খারাপ ব্যবহার করে।

(৩) মন্দার সময় মুনাফা হ্রাস পাইলে শ্রমিকগণ বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(৪) মুনাফা বৎসরের শেষে বণ্টিত হয়। সেই সময় পর্যন্ত দরিদ্র শ্রমিকগণকে অপেক্ষা করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের উৎসাহ হ্রাস পায়।

(৫) এই পদ্ধতিতে ঠিকভাবে মুনাফা স্থির করিতে না পারিলে শ্রমিকেরা মূলধনের অংশ লইয়া চলিয়া যায়।

(৬) মালিকেরা এই পদ্ধতি স্বীকার করিতে চাহে না। তাহাদের মতে শ্রমিকগণ শুধু মুনাফা লইবে না। তাহাদিগকে লোকসানও লইতে হইবে।

মুনাফার শরিকানাতে শ্রমিকগণ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না। সেজন্য বিভিন্নপ্রকার সন্দেহ তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য সহ অংশীদারী মজুরি পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে শ্রমিকগণ নির্দিষ্টহারে মজুরি পাইবে এবং মুনাফার একটা অংশও পাইবে এবং প্রতিষ্ঠান-পরিচালনায় শ্রমিক প্রতিনিধি থাকিবে। এইরূপ প্রতিনিধি একদিকে শ্রমিক এবং অন্যদিকে মালিকগণের

অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়। এই পদ্ধতিতে শ্রমিকগণ যে অংশ বোনাস হিসাবে পায় তাহা তাহারা আবার ঐ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে।

সুবিধা :—

(১) শ্রমিকগণ এই পদ্ধতিতে মালিক হইয়া পড়ে।

(২) শ্রমিকগণ অন্য প্রতিষ্ঠানে চলিয়া যাইতে পারে না।

(৩) দক্ষ-শ্রমিক এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায়।

(৪) কাজের অগ্রগতি কোনপ্রকার ব্যাহত হয় না।

অসুবিধা :—

(১) আইনের চোখে শ্রমিক মালিক হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাদের কোন বক্তব্য থাকে না।

(২) বোনাসের যে অংশ তাহারা কারবারে বিনিয়োগ করে তাহা যে কোন সময়ে লোকসান হইলে নষ্ট হইতে পারে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. কোন কারখানার স্থান নির্বাচনে যে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত তাহা আলোচনা কর।

(Discuss the factors that should be taken into consideration in selecting the site for a factory).

2. কোন কারখানার বাড়ী তৈয়ারের সময় কি কি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হইবে ?

(What are the factors to be considered at the time of erection of a factory building ?)

3. কারখানার আভ্যন্তরীণ বিন্যাস বলিতে কি বুঝ ? উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আলোচনা কর।

(What is meant by Layout of a Factory ? Discuss the Features and factors of a factory layout).

4. অফিসের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস কাহাকে বলে? কি কি বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে?

(What is meant by office-layout ? Discribe the factors on which it depends).

5. কোন একটি অফিসের বিভিন্ন বিভাগগুলি বর্ণনা কর।

(Describe the various departments of an office).

6. নথিবদ্ধকরণ কাহাকে বলে? ইহার নীতিগুলি ও বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

(What is meant by Filing system ? What are its Principles ? Discuss the various methods of Filing).

7. অনুক্রমনী প্রণয়নের অর্থ কি? কি পদ্ধতিতে ইহা করিতে হয়?

(What is meant by Indexing ? How it is done ?)

8. কি কি পদ্ধতি দ্বারা কোনও সংগঠনের দক্ষতা বিচার করা হয়?

(What are the tests to check up the efficiency of an organisation ?)

9. কি কি বিভিন্ন উপায়ে শ্রমিকদিগকে মজুরি দেওয়া যাইতে পারে? উহাদের প্রত্যেকটির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(In how many ways wages can be paid to workers ? State their respective merits and de-merits).

10. সময়ভিত্তিক মজুরির সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

(Describe the merits and de-merits of Time and Piece Rate system of wage payment).

11. বিভিন্নপ্রকার উৎসাহমূলক মজুরি প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(Describe the various methods of Incentive wage Payment).

12. মুনাফা শরিকানা এবং সহ-অংশীদারীর মধ্যে পার্থক্য কি? মুনাফা শরিকানার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(How is Profit-sharing distinguished from Co-partnership ? Discuss the advantages and dis-advantages of Profit-sharing).

13. ভারতের অধিকাংশ ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা কলিকাতায় অবস্থিত। উহার কারণ কি?

(Majority of the units of the engineering industries of india are located in Calcutta. What are the reasons ?)

14 একটি ইস্পাত কারখানার স্থান নির্বাচনের জন্য কি কি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন ?

(In selecting the site for the location of a 'steel-plant', what factors are to be considered ?)

বাণিজ্য সংগঠন

(Organisation of Trade)

পণ্য বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি (The Principal methods of distribution of goods).

পণ্যের উৎপাদক তাহার সমস্ত পণ্য ভোগ করে না। উৎপাদক ঐ পণ্য বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে উহার ভোগকারীর হাতে পৌছাইয়া দেয়। প্রাচীনকালে জনসংখ্যা ছিল খুব কম। উৎপাদন ছিল সীমাবদ্ধ। সুতরাং সেই সময় পণ্য ভোগকারীর হাতে পৌছাইয়া দিতে কোন বিশেষ অসুবিধা হইত না। কিন্তু বর্তমান জনসংখ্যা বিশাল। উৎপাদন ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সেজন্য বর্তমানে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতার নিকট পৌছাইয়া দেওয়া একটি সমস্যা। বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমানে এই ব্যবস্থা চালু রাখিবার অবিরাম প্রচেষ্টা চলিয়াছে। যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে এই পণ্য ভোগকারীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

(ক) ভোগকারীর নিকট সরাসরি বিক্রয়ের ব্যবস্থা :—

বর্তমানেও অনেক পণ্য আছে যাহা ক্রেতার নিকট উৎপাদক সরাসরি পৌছাইয়া দেয়। যে সকল পণ্যের সবদা স্থায়ী নির্ভরযোগ্য বাজার নাই সেই সকল পণ্য এই পদ্ধতির সাহায্যে ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করা হয়।

(খ) খুচরা ব্যবসায়ীর বিক্রয়ের ব্যবস্থা :—

বিভিন্নপ্রকার ভোগ্য পণ্য এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করা হয়। যে সকল উৎপাদক বিভিন্নপ্রকার পণ্য উৎপাদন করে অথবা যাহাদের আর্থিক সঙ্গতি ভাল তাহারা তাহাদের পণ্য ধারে খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ভোগকারীর মধ্যে মাত্র একদল খুচরা ব্যবসায়ী থাকে।

(গ) পাইকারী ব্যবসায়ীর দ্বারা পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা :—

যখন পণ্য উৎপাদক প্রচুর পণ্য উৎপাদন করে এবং বিভিন্ন বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে তখন এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। উৎপাদক নিজে সমস্ত

বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কারণ ইহাতে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উৎপাদকগণের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া পাইকারী ব্যবসায়ী খুচরা ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করে। পরে খুচরা ব্যবসায়ী ঐ পণ্য ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে।

(ঘ) প্রতিনিধি দ্বারা বিক্রয় ব্যবস্থা :—

উৎপাদক অনেক সময় প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া তাহার পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। প্রতিনিধিরা উৎপাদকের নামেই পণ্য বিক্রয় করে। ইহাদিগকে উৎপাদক মাহিনা এবং দস্তুরি অথবা শুধুই দস্তুরি দিয়া থাকে।

(ঙ) নিজ দোকান মারফৎ বিক্রয় ব্যবস্থা :—

বর্তমানে উৎপাদকগণ এই ব্যবস্থার দ্বারাই অধিক পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। বহু শাখা বিপণী ও চেইন স্টোরস এই প্রকার ব্যবস্থার উদাহরণ। এই পদ্ধতি সাধারণতঃ ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রেই বেশী দেখা যায়।

বিভিন্নপ্রকার মধ্যস্থ কারবারী (Various types of Business intermediaries) :—

বর্তমান পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থায় যে সকল বিভিন্নপ্রকার মধ্য কারবারী দেখা যায় তাহাদিগকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

১। **পাইকার :—**

ইহারা উৎপাদকের নিকট হইতে প্রচুর পণ্য ক্রয় করিয়া খুচরা ব্যবসায়ীকে ধারে ও নগদে পণ্য বিক্রয় করে। ইহারা উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীর মধ্যে কাজ করিয়া থাকে।

২। **খুচরা ব্যবসায়ী :—**

ইহারা পাইকারের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া ভোগকারীকে সময়মত সরবরাহ করে। ইহারা পাইকার ও ভোগকারীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলে।

৩। **দালাল :—**

ইহারা পণ্যের মালিক নহে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ইহারা যোগাযোগ করিয়া দিয়া দালালী পাইয়া থাকে মাত্র।

৪। ফড়িয়া :—

ইহারা উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য গ্রহণ করে এবং ঐ পণ্য নিজের কাছে রাখিয়া দেয়। সময়মত উহা ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। এবং ধারে বিক্রয় করিয়া দেয়। ধারে বিক্রয় করিলে ঐ অর্থ আদায় করে।

৫। কমিশন এজেণ্ট :—

ইহারা বিদেশী ক্রেতার পক্ষে পণ্য ক্রয় করিয়া দিয়া কমিশন গ্রহণ করে।

৬। নীলামদার :—

পণ্য বিক্রয়ের সময় ইহারা বিক্রেতার পক্ষ হইয়া বাজারে দাম ডাকিয়া থাকে। এবং কাজের জন্য দস্তুরি পায়।

৭। পণ্য প্রাপক :—

উৎপাদকের পণ্য দস্তুরি ভিত্তিতে ইহারা বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। চালানী কারবারে ইহা দেখা যায়।

৮। ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি :—

ধারে পণ্য বিক্রয় করিয়া উহার অর্থ আদায় করিয়া দেওয়াই ইহাদের কাজ। ঐ আদায়ের ঝুঁকি গ্রহণ করে বলিয়া উহাদিগকে ঝুঁকি বাহক প্রতিনিধি বলে। উহারা দস্তুরি পাইয়া থাকে।

ইহা ছাড়াও দায়গ্রাহক, একমাত্র প্রভৃতি প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়া যায়।

পাইকারী ব্যবসায়ের ভূমিকা (Role of Wholesale Trade) :—

পণ্যবণ্টনে পাইকারী ব্যবসায়ীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগের ব্যবসা এই পাইকারী ব্যবসার দ্বারাই অনেকাংশে সম্ভবপর হইয়াছে। এই পাইকারী ব্যবসায়ীরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীকে সাহায্য করে।

(ক) **উৎপাদনকারীগণের লাভ** :—

এই পাইকারী ব্যবসার জন্য প্রচুর পণ্য একসাথে উৎপাদনকারী উৎপাদন করিতে পারে। ফলে বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা পাওয়া যায়। তাহারা প্রয়োজনে অনেক পণ্য গুদামে মজুত রাখিয়া বিক্রয় করে। যদি এই পাইকারী ব্যবসায়ী না থাকিত তবে উৎপাদনকারী প্রচুর পণ্য উৎপাদন করিতে পারিত না। কারণ একদিকে পণ্য উৎপাদন এবং অন্যদিকে ভোগ্যপণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় একটি

কঠিন কাজ। ইহাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। পণ্যের মান ঠিক রাখা যায় না। ভোগকারী ধারে ক্রয়ের সুবিধা পায় না। কারণ ধারে পণ্য বিক্রয় করিলে তাহার মূল্য আদায়ের প্রশ্ন দেখা দেয়। কোন উৎপাদনকারী এই দায়িত্ব লইতে রাজী হয় না। উপরন্তু উৎপাদকগণ ভোগকারীর রুচি অনুযায়ী অল্প অল্প পণ্য বিক্রয় করে না। ইহাতে সময় নষ্ট হয়। উপরন্তু চাহিদার পরিবর্তন হইলে আর এক সমস্যা দেখা দেয়। সেইজন্য এই সকল বিভিন্ন প্রকার সমস্যা পাইকারী ব্যবসায়ীগণ নিজেরাই বহণ করে। ইহাতে উৎপাদকগণ বিশেষ উপকৃত হয়।

(খ) খুচরা ব্যবসায়ীগণের লাভ :—

খুচরা ব্যবসায়ীরাও বিভিন্ন প্রকারে পাইকারী ব্যবসায়ী হইতে উপকৃত হইয়া থাকে। কোন উৎপাদকই অল্প পণ্য ধারে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিতে রাজী হয় না। এই অবস্থায় খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিন্তু পাইকারী ব্যবসায়ী থাকিলে খুচরা ব্যবসায়ী তাহাদের প্রয়োজনীয় পণ্য ধারে ক্রয় করিতে পারে। এবং ঐ পণ্য ভোগকারীর নিকট সহজেই পৌছাইয়া দিতে পারে। পাইকারী ব্যবসায়ী থাকার জন্য খুচরা ব্যবসায়ীকে আর পণ্য মজুত রাখিতে কোন খরচ করিতে হয় না। পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পণ্য লইয়াই খুচরা ব্যবসায়ী উহা সহজে ভোগকারীর নিকট পৌছাইয়া দিতে পারে। খুচরা ব্যবসায়ীরা অনেক সময় পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে মূল্যবান পরামর্শও পাইয়া থাকে। অল্প মূলধনে তাহারা কারবার পরিচালনা করিতে পারে।

(গ) সমাজের লাভ :—

পাইকারী ব্যবসায়ীরা নানাপ্রকারে সমাজকে উপকার করিয়া থাকে। পাইকারী ব্যবসায়ীদের জন্য অবিরাম উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুত্রপাত হইয়াছে। সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

ভবিষ্যতে বাজারে কোন্ পণ্য কতটা হইবে তাহা পাইকারী ব্যবসায়ীরা অনেকটা অভিজ্ঞতা হইতে শিখিয়াছে। ইহাতে উৎপাদিত পণ্য নষ্ট হয় না। ফলে সামাজিক দৃষ্টি কোণে সম্পদের ক্ষতি বন্ধ হয়। বিভিন্নপ্রকার পণ্য অতি বিচার বিবেচনা করিয়া উৎপন্ন করার জন্য দেশের কাঁচামালের ঘাটতি দেখা যায় না। এইরূপে পাইকারী কারবারী উৎপাদনকারী, খুচরা ব্যবসায়ীও সমাজকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, পাইকারী ব্যবসায়ীদের ঐ সকল সেবা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের সাধু ব্যবসায় মনোভাবের উপর নির্ভর করে।

পাইকারী ব্যবসার অর্থ ও সংগঠন (Meaning and Organisation of Wholesale Trade) :—

পণ্যর উৎপাদকগণের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে পণ্য খরিদ করিয়া আনিয়া অল্প বা বেশী পরিমাণে খুচরা ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করার পদ্ধতিকে **পাইকারী ব্যবসা বলে।**

ইহার সংগঠন :—

(ক) পণ্যর উৎপাদকগণের নিকট হইতে তাহারা প্রচুর পণ্য ক্রয় করিতে পারে।

(খ) প্রচুর পণ্য ক্রয়ের জন্য গুদাম ঘর ব্যবস্থা করে।

(গ) প্রয়োজনে মূলধন হাতে না থাকিলে তাহারা ঐ পণ্য বন্ধক রাখিয়াও অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

(ঘ) চাহিদার পরিবর্তনের সহিত পণ্যর মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই দায়িত্ব পাইকার গ্রহণ করে।

(ঙ) বিভিন্নপ্রকার পরিবহণ ব্যবস্থাও পাইকার গ্রহণ করে।

(চ) খুচরা ব্যবসায়ীকে নগদে ও ধারে তাহার প্রয়োজনমত পণ্য বিক্রয় করিতে পারে।

(ছ) পাইকার তাহার ব্যবসায়ের জন্য অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করিতে পারে।

খুচরা ব্যবসার অর্থ, কাজ ও গুরুত্ব (Meaning, Works and Importance of Retail Business) :—

পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া ঐ পণ্য ভোগকারীর নিকট বিক্রয় ব্যবস্থাকে **খুচরা ব্যবসা** বলে। এই ব্যবস্থায় খুচরা ব্যবসায়ী ও ভোগকারী উভয়েই উপকৃত হয়।

ইহার কাজ ও গুরুত্ব :—

খুচরা ব্যবসার কাজও গুরুত্ব সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(ক) বিভিন্ন প্রকার পণ্য রুচি অনুযায়ী খুচরা ব্যবসায়ী ভোগকারীর হাতে পৌছাইয়া দেয়।

(খ) ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক এই পদ্ধতিতে অতি নিবিড় হয়।

(গ) ব্যবসায়ী ভোগকারীর রুচি ও অভ্যাসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারে। ইহাতে মোট বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) ভোগকারীরা কম দামে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে টাটকা পণ্য ক্রয় করিতে পারে। কারণ তাহারা পণ্য গুদামজাত করে না।

(ঙ) ভোগকারী খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ধারে পণ্য ক্রয় করিতে পারে।

(চ) অনেক সময় এই খুচরা ব্যবসায়ীরাই ভোগকারীর নিকট কোন নতুন পণ্যর বাজার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

মধ্যস্থ কারবারের সুফল ও কুফল (**Merits and Demerits of Intermediaries**).

বর্তমান কারবারে মধ্যস্থ কারবারীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। উহাদের ভূমিকাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন প্রকার শিল্প বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে; তাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামালও বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে। বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল ইহার উৎপাদন অঞ্চলে লইয়া আসিতে হয়। অন্যথায় উৎপাদন সম্ভব হয় না। এই প্রকার কাঁচামাল ইহাদের উৎপাদন অঞ্চলে লইয়া আসিতে এই মধ্যস্থ কারবারীগণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহার পরে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়েও তাহাদের যথেষ্ট অবদান আছে। উৎপন্ন পণ্য উৎপাদকগণ খুচরা বিক্রেতা অথবা ভোগকারীর বিক্রয় করিতে পারে না। কারণ ইহাতে সময়ের অপচয় হয় ও উৎপাদন ব্যাহত হয়। সেইজন্য এই মধ্যস্থ কারবারীগণ উৎপাদকের নিকট হইতে প্রচুর পণ্য খরিদ করিয়া খুচরা ব্যবসায়ীর মারফৎ উহা ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। ইহাতে উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে।

অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী হিসাবে ইহারা মূল্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ক্ষান্ত হয় না। সব সময় পণ্য মূল্য হ্রাসেরও চেষ্টা করে। ইহাতে ভোগকারী উপকৃত হয়। ইহারা বাজারের ফাটকা কারবারও বন্ধ করিয়া থাকে। ফলে উৎপাদকগণ উপকৃত হয়। ইহারা আবার প্রয়োজনে ভোগকারীর রুচি, অবস্থা অনুযায়ী উৎপাদকগণকে পরামর্শ দিয়া থাকে। ইহাতে বাজারের অনিশ্চয়তা হইতে উৎপাদকগণ মুক্তিলাভ করে এবং প্রচুর পণ্য উৎপাদন করিতে পারে—ফলে বৃহদায়তন শিল্প দেশের মধ্যে গড়িয়া উঠে।

বিভিন্ন প্রকার সেবা মধ্যস্থ কারবারীগণ, সমাজ, উৎপাদক, খুচরা ব্যবসায়ী ও ভোগকারীকে প্রদান করিলেও বিভিন্ন লোক উহাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। উপরন্তু সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের বিরুদ্ধে যে সকল মতামত দেখা যায় তাহার মধ্যে নিম্নোক্তগুলিই প্রধান।

(ক) পণ্যের মূল্য তাহাদের জন্য বৃদ্ধি পায়। কারণ উৎপাদকগণের নিকট হইতে পণ্য আনিয়া ভোগকারীকে দেওয়ার সময় তাহারা লাভ করিয়া থাকে।

(খ) উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক ইহাদের জন্য স্থাপিত হইতে পারে না। কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে মধ্যস্থ কারবারীগণ তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। অনেক সময় কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া ভোগকারী ও উৎপাদকের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

(গ) অনেক সময় তাহারা পণ্যের ফাট্‌কা কারবার সৃষ্টি করিয়া প্রচুর মুনাফা লাভ করে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, তাহাদের কিছু কিছু অসুবিধা থাকিলেও বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তাহাদের ভূমিকা অপরিহার্য্য। সুতরাং তাহাদের 'বিলোপ' বর্তমান ব্যবস্থাতে আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

বহুশাখা বিপণির অর্থ, সংগঠন, সুবিধা ও অসুবিধা (Meaning, Organisation, Advantages and Dis-Advantages of Multiple shops):—

মধ্যস্থ কারবারীর হাত হইতে ভোগকারীকে রক্ষা করিবার জন্য যখন পণ্যের উৎপাদক নিজেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দোকান খুলিয়া ঐ পণ্য ভোগকারীর নিকট সরাসরি বিক্রয় করে তখন তাহাকে **বহু শাখা বিপণি** বলে। সাধনা ঔষধালয়, বাটার জুতার দোকান প্রভৃতি এই শ্রেণীর বিপণির উদাহরণ।

ইহার সংগঠন :—

এই প্রকার কারবারে অনেক পুঁজির দরকার হয় কারণ যৌথ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে ইহা গঠিত হয়। ইহার পরিচালনা ভার পরিচালকমণ্ডলীর হাতে দেওয়া হয়। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিক্রয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর দ্বারা এই কারবার পরিচালিত হয়। প্রত্যেক বিপণিতে একজন ম্যানেজারের অধীনে কয়েকজন বিক্রয় কর্মী থাকে। প্রত্যেক ম্যানেজারকে হেড অফিসে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করিতে হয়। বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে ম্যানেজার কোন খরচ করিতে পারে না। সবই জমা দিতে হয়। বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন খরচ হেড অফিস হইতে প্রদান করা হয়। বিভিন্ন শাখার কাজ তদন্ত করিবার জন্য হেড অফিস হইতে তদন্ত কর্মী নিযুক্ত হইতে পারে।

সুবিধা :—

(১) পণ্যভোগকারীগণ মধ্যস্থকারবারী না থাকায় কম মূল্যে পণ্য পাইয়া থাকে।

(২) পণ্য উৎপাদক ও পণ্যভোগকারীর সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

(৩) মধ্যস্থ কারবারী না থাকায় উৎপাদকের লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

(৪) পণ্যভোগকারী শহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই দোকান মারফৎ তাহাদের প্রয়োজনীয় পণ্য খরিদ করিতে পারে।

(৫) এই ব্যবস্থায় প্রচার খরচ কম হয়।

(৬) এই ব্যবস্থায় কোন শাখায় কোন পণ্যের প্রয়োজন হইলে সহজেই নিকটবর্তী শাখা হইতে আনিয়া ক্রেতাগণকে সন্তুষ্ট করা যায়।

(৭) এই ব্যবস্থায় সমস্ত পণ্য নগদ বিক্রয় হয়। সুতরাং অনাদায়ী বাকীর কোন সমস্যা থাকে না।

(৮) পণ্যের বিক্রয় এই ব্যবস্থায় খুব বেশী হয়, যে জন্য দোকান পরিচালনার খরচও অপেক্ষাকৃত কম হয়।

অসুবিধা :—

(১) বিভিন্ন শাখায় এই পদ্ধতিতে অনেকটা একপ্রকার পণ্য বিক্রয় হওয়ায় ক্রেতাগণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(২) এই পদ্ধতিতে প্রথমে প্রচুর মূলধন দরকার হয়। ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা সম্ভব হয় না।

(৩) এই পদ্ধতিতে উচ্চ বেতনভোগী প্রচুর কর্মী দেখা যায়। ইহাতে পরিচালনার খরচ বেশী হয়।

(৪) অধিক বিক্রয় বহুল পদ্ধতি বলিয়া ক্রেতার সংখ্যা অনেক থাকে, সেজন্য অনেক সময় বিক্রেতা ও ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় না।

(৫) অনেক সময় এই প্রকার কারবার হইতে একচেটিয়া কারবার উদ্ভব হয়।

বিপণি-শৃঙ্খলের অর্থ, পরিচালনা, সুবিধা ও অসুবিধা (Meaning, Organisation, Advantages and Dis-Advantages of Chain Store) :—

এই পদ্ধতিতে খুচরা ব্যবসায়ী উৎপাদকের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণ পণ্য ক্রয় করিয়া একটি গুদামে মজুত করে। পরে নিকটবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন দোকান খুলিয়া গুদাম হইতে পণ্য আনিয়া ঐ সকল দোকানের মাধ্যমে ভোগকারীর নিকট

বিক্রয় করে। অনেকগুলি দোকান একটিমাত্র কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত থাকে বলিয়া ইহাকে **বিপণি-শৃঙ্খল** বলা হয়। বিভিন্নপ্রকার পণ্য এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায়।

পরিচালনা :—

প্রচুর পণ্য ক্রয় করিয়া মালিক উহা বিভিন্ন দোকান মারফৎ বিক্রয় করে। প্রত্যেক দোকান পরিচালনার জন্য একজন ম্যানেজার থাকে। তাহার অধীনে থাকে অনেক কর্মচারী। বিক্রয় লব্ধ অর্থ ম্যানেজার হেড অফিসে পাঠাইয়া দেয়। উহা হইতে কোন টাকা খরচ করিতে পারে। বিপণির হিসাবপত্রও হেড-অফিসে পাঠাইয়া দিতে হয়। কারবারের নীতি-নির্ধারণে ম্যানেজারের কোন হাত নাই।

সুবিধা :—

১। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার সহিত সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

২। বিক্রেতাগণ উৎপাদকগণের নিকট হইতে একসাথে প্রচুর পণ্য ক্রয় করে বলিয়া অনেক কম দামে পায়। ফলে ভোগকারীরাও কম মূল্যে ঐ পণ্য ক্রয় করিতে পারে।

৩। এই প্রকার কারবারে মুনাফা বেশী হয় কারণ পণ্যের চাহিদা খুব বেশী হয়।

অসুবিধা :—

১। বৃহদায়তনে কারবার পরিচালিত হওয়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

২। পরিচালনার ব্যয় ইহাতে অনেক বেশী হয়। কারণ হেড-অফিসকে বিভিন্ন শাখায় প্রচুর কর্মী নিয়োগ করিতে হয়।

বিপণি-শৃঙ্খল ও বহু-শাখা বিপণির মধ্যে পার্থক্য (Distinction beetween Chain Stores and Multiple Shops.) :—

বিপণি-শৃঙ্খল	বহু-শাখা বিপণি
১। ইহাতে বিক্রেতা ও উৎপাদক পৃথক ব্যক্তি।	১। ইহাতে বিক্রেতা ও উৎপাদক একই ব্যক্তি।
২। বিভিন্নপ্রকার পণ্য ইহাতে বিক্রয় হয়।	২। একই জাতীয় পণ্য ইহাতে বিক্রয় হয়।

বিপণি-শৃঙ্খল	বহুশাখা বিপণি
৩। মধ্যস্থ কারবারী ইহাতে বিলোপ হয় না।	৩। মধ্যস্থ কারবারী এই ব্যবস্থায় থাকে না।
৪। প্রয়োজনবোধে ক্রেতার পণ্য তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।	৪। এই ব্যবস্থায় বিক্রীত পণ্য ক্রেতার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় না।
৫। ইহা পার্শ্বিক জোটের উদাহরণ।	৫। ইহা পূর্বাপর জোটের উদাহরণ।

বিভাগীয় বিপণির অর্থ, পরিচালনা, সুবিধা ও অসুবিধা (**Meaning, Organisation, Merits and De-Merits of Departmental Store**) :—

বড় বড় শহরে এই প্রকার বিপণী দেখা যায়। একই মালিকানায় ও পরিচালনায় যখন একই দোকান হইতে বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে ক্রেতাদের নিকট পণ্য বিক্রয় করা হয় তখন তাহাকে **বিভাগীয় বিপণি** বলে।

কমলালয় ষ্টোর্স, ওয়াচেল মোল্লা, হল এণ্ড এণ্ডারসন প্রভৃতি এই জাতীয় বিভাগীয় বিপণীর উদাহরণ

ইহার পরিচালনা :—

যৌথ মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে এইরূপ কারবার গড়িয়া উঠে। সমস্ত পরিচালনার ভার বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরই পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান তাহার বিভাগের জন্য দায়ী থাকে। সমস্ত পত্র তিনি প্রতি মাসের শেষে জেনারেল ম্যানেজারকে দিয়া দেন। বিভিন্নপ্রকার কর্মীর সাহায্যে তিনি তাহার বিভাগ পরিচালনা করেন। কারবার খুব বড় হইলে বিক্রয়, ক্যাশ; ক্রয় প্রভৃতি বিভাগকে পৃথক পৃথক করিয়া পরিচালনা করা যাইতে পারে। ক্রেতাগণ দোকানে আসিয়া পণ্য পছন্দ করিলে পণ্যের মূল্য লইয়া তাহাকে পণ্য সরবরাহ করা হয়। ডাক যোগেও এই পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয় করা যায়। এরজন্য অতিরিক্ত ব্যয় ক্রেতাকে বহণ করিতে হয়।

সুবিধা :—

১। ক্রেতারা এই দোকান হইতে একই সাথে বিভিন্নপ্রকার পণ্য ক্রয় করিতে পারে।

২। নির্দিষ্ট মানের পণ্য ক্রেতারা উৎপাদকগণের নিকট হইতে সরাসরি ক্রয় করিতে পারে। ইহাতে পণ্য মূল্য কম হয়।

৩। ভোগকারী ও বিক্রেতার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ভোগকারীর রুচি উৎপাদকগণ বুঝিতে পারে।

৪। এই পদ্ধতিতে ক্রেতাগণ বিশেষ উপকৃত হয় কারণ বিক্রেতা 'পণ্য' ক্রেতার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়।

৫। শহরের মধ্যস্থলে এই দোকান গড়িয়া ওঠার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রেতাগণ আসিয়া ঐ পণ্য ক্রয় করিতে পারে।

৬। ইহাতে স্থির খরচ বা ব্যবসা পরিচালনার খরচ কম হয়।

৭। বিত্তশীল ক্রেতাই বেশী হওয়ায় বিক্রয়ের পরিমাণ বেশী হয় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

৮। এই পদ্ধতিতে প্রচুর পণ্য একসাথে খরিদ করা হয় বলিয়া পণ্য ক্রয় খরচও কম পড়ে।

৯। বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান ব্যবসায়ীকে এই প্রকার কারবার হইতে অর্জ্জন করিতে হয়।

১০। এই পদ্ধতিতে প্রচুর অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীর সহায়তা লাভ করা যায়।

অসুবিধা :—

১। ইহাতে প্রচার খরচ অনেক বেশী। ছোট কারবারী ইহা বহণ করিতে পারে না।

২। এই কারবারের অবস্থান ক্রেতাদের অবস্থান হইতে অনেক দূরে হয়। বিশেষ করিয়া শহরাঞ্চলে।

৩। ধনী ও সাধারণ ক্রেতার মধ্যে এই পদ্ধতিতে পৃথক ব্যবহার করা হয়।

৪। বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রচুর দক্ষ কর্মী দরকার হয়। ইহাতে পরিচালনার খরচ বেশী পড়ে।

৫। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ইহা ভোগকারীর রুচির প্রতি লক্ষ্য করিতে পারে না।

৬। এই প্রকার কারবারে প্রচুর মূলধন দরকার হয়।

বিভাগীয় বিপণি ও বহু বিপণির মধ্যে পার্থক্য (**Distinction between Departmental Store and Multiple Shop**) :—

বিভাগীয় বিপণি	বহু-শাখা বিপণি
১। ইহা বিভিন্নপ্রকার পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে।	১। ইহা একইপ্রকার পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে।
২। বড় বড় শহরেই কেবল ইহা দেখা যায়।	২। ছোট বড় সকলপ্রকার শহরেই ইহা দেখা যায়।
৩। বিভিন্ন উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া ইহা ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে।	৩। উৎপাদক নিজেই পণ্য ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে।
৪। ইহাতে প্রচুর মূলধন দরকার হয় কারণ বিভিন্নপ্রকার পণ্য মজুত রাখিতে হয়।	৪। ইহাতে অধিক মূলধন দরকার হয় না। কারণ একশ্রেণীর পণ্য মজুত রাখা হয়।
৫। ইহাতে মধ্যস্থ কারবারী দেখিতে পাওয়া যায়।	৫। এই পদ্ধতিতে কোন মধ্যস্থ কারবারী দেখা যায় না।
৬। ইহা পার্শ্বিক জোটের উদাহরণ।	৬। ইহা পূর্বাপর জোটের উদাহরণ।

ডাক মারফৎ কারবারের অর্থ, সুবিধা ও অসুবিধা (**Meaning, Advantages and Dis-advantages of Mail Order Business**) :—

কোন ব্যবসায়ী দোকান হইতে সরাসরি ক্রেতার নিকট পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। আবার নির্দিষ্ট অর্ডারের ভিত্তিতে ডাক যোগে ঐ পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিতে পারে। আবার নির্দিষ্ট অর্ডারের ভিত্তিতে ডাক যোগে ঐ পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রয়ের জন্য পাঠাইতে পারে। বিক্রেতা যখন ডাক-যোগে কোন পণ্য ক্রেতাকে সরবরাহ করে তখন তাহাকে **ডাক মারফৎ কারবার বলে।** এক্ষেত্রে ডাক খরচ ক্রেতাকে বহণ করিতে হয়।

সুবিধা :—

১। এই পদ্ধতিতে ক্রেতাগণ বাড়ী বসিয়া পণ্য পাইয়া যায়।

২। এই পদ্ধতিতে দোকান পরিচালনার জন্য অর্থ ব্যয় হয় না।

৩। নগদ বিক্রয়ের ন্যায় বিক্রেতা বাড়ী বসিয়া পণ্যর মূল্য পাইয়া থাকে।

অসুবিধা :—

১। ইহাতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

২। ক্রেতার রুচির পরিবর্তন হইলে বিক্রেতা অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

৩। কিছুদিন পরে বিজ্ঞাপনের কোন মূল্য থাকে না। ইহা অপেক্ষা ক্রেতার সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অধিবিপণির অর্থ, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা (Meaning, Features, Advantages and Dis-Advantages of Super Market) :—

বর্তমানে আমেরিকায় ও ইউরোপে বৃহদাকার বিপণি প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং উহাকেই অধিবিপণি বলা হয়। ইহা একপ্রকার খুচরা বিক্রয়ের দোকান। এই বিপণিতে স্থায়ী পণ্য ছাড়াও শাক-সব্জি, ডিম, মাছ, দুধ, প্রভৃতিও বিক্রয় হয়। নেপালেও এই প্রকার বিপণি গড়িয়া উঠিয়াছে। দিল্লীর সুপার বাজার, কলিকাতার সমবায়িকা, প্রভৃতি এই প্রকার বিপণির উদাহরণ।

বৈশিষ্ট্য :—

১। ইহা বহুতল বিশিষ্ট বাড়ীতে অবস্থিত হয়। এবং বিভিন্ন পণ্য কাউন্টারে ক্রেতাদের জন্য সাজানো থাকে।

২। সম্ভাব্য সকলপ্রকার বিলাস ও ভোগদ্রব্য এই বিপণিতে বিক্রয় হয়।

৩। বিভিন্ন বিভাগ হইতে ক্রেতা তাহার পছন্দমত পণ্য লইয়া ক্যাশ কাউন্টারে আসিয়া মূল্য পরিশোধ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। ইহাতে কর্মীদের জন্য খরচ কম হয়।

৪। ইহাতে সকল সময় পণ্য নগদ মূল্যে বিক্রয় হয়।

৫। সমবায় প্রথায় এই বিপণি স্থাপিত হইলেও অনেক সময় সরকারী মালিকানায়ও উহা স্থাপিত হইতে পারে।

সুবিধা :—

১। একই দোকান হইতে ক্রেতা তাহার প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করিতে পারে। ইহাতে সময় নষ্ট হয় না।

২। পরিচালনা ব্যয় ইহাতে অনেক কম হয় কারণ বিভিন্ন বিভাগে কোন কর্মী না থাকিলেও চলে।

৩। এই প্রকার বিপণির প্রচার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম।

৪। বাজারের উপর এই বিপণি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে কারণ ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হয়।

৫। বিভিন্ন বিভাগ থাকায়, এক বিভাগের লোকসান অন্য বিভাগের লাভ দ্বারা পূরণ হইয়া যায়।

অসুবিধা :—

১। ইহাতে প্রচুর মূলধন দরকার হয়। সকলের পক্ষে উহা সম্ভব নয়।

২। ন্যায্য মূল্যে ইহা পণ্য বিক্রয় করিতে পারে না। কারণ বিভিন্ন বিভাগের লোকসান মিটাইয়া ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

৩। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

৪। সাধারণ ক্রেতারা ইহার দ্বারা উপকৃত হয় না। কারণ ইহার ক্রেতারা বেশীর ভাগই ধনী।

কেরায়া ও কিস্তিবন্দী ক্রয়ের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য (Meaning and Features of Hire Purchases and Instalment Purchases) :—

যে ক্রয় ব্যবস্থায় ক্রীত পণ্যের মূল্য এক সাথে প্রদান না করিয়া ধীরে ধীরে প্রদান করা হয় এবং সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পরে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট স্থানান্তরিত হয় তাহাকে **কেরায়া ক্রয়** বলে।

ইহার বৈশিষ্ট্য :—

১। এই পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয়ের সময় উহার মূল্যের সামান্য অংশ বিক্রেতাকে প্রদান করা হয়। বাকী অংশ ধীরে ধীরে পরিশোধ করা হয়।

২। নগদ মূল্য অপেক্ষা এই পদ্ধতিতে ক্রেতাকে বেশী টাকা পরিশোধ করিতে হয়। বেশী অর্থকে সুদ বলে।

৩। প্রথম কিস্তি পরিশোধ করিয়াই ক্রেতা পণ্য পাইয়া থাকে কিন্তু শেষ কিস্তি পরিশোধ না করা পর্যন্ত ক্রেতা উহার মালিক হইতে পারে না।

৪। ক্রেতা কোন কিস্তির অর্থ দিতে না পারিলে বিক্রেতা ঐ পণ্য ক্রেতার নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত করিতে পারে।

৫। এরূপ পণ্য ক্রেতা ইচ্ছা করিলে হস্তান্তর করিতে পারে না।

পক্ষান্তরে যে ক্রয় ব্যবস্থায় ক্রীত পণ্যের মূল্য এক সাথে প্রদান না করিয়া ক্রমে ক্রমে কিস্তিদ্বারা পরিশোধ করা হয় তাহাকে **কিস্তিবন্দী ক্রয় বলে**।

ইহার বৈশিষ্ট্য :—

১। এই পদ্ধতিতে পণ্যের সমস্ত মূল্য একসাথে প্রদান করিতে হয় না।

২। প্রকৃত নগদ মূল্য অপেক্ষা ইহাতে বেশী অর্থ প্রদান করিতে হয়। যেটুকু বেশী অর্থ প্রদান করা হয় তাহাকে সুদ বলে।

৩। প্রথম কিস্তি পরিশোধ করিয়াই ক্রেতা পণ্যর মালিক হয়।

৪। ক্রেতা ইচ্ছা করিলে ঐ পণ্যর সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পূর্বে হস্তান্তর করিতে পারে।

৫। কোন কিস্তি পরিশোধ করিতে না পারিলে বিক্রেতা ঐ পণ্য ক্রেতার নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত করিতে পারে না। কিন্তু মূল্য আদায়ের জন্য আইনের আশ্রয় লইতে পারে।

কেরায়া ক্রয় ও কিস্তিবন্দী ক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য (**Distinction between Hire Purchase and Instalment Purchase**) :—

কেরায়া ক্রয়	কিস্তিবন্দী ক্রয়
১। প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদানের সাথে সাথে পণ্য ক্রেতার হাতে আসিয়া যায় কিন্তু শেষ কিস্তি পরিশোধ করার পর মালিকানা ক্রেতার নিকট আসে।	১। প্রথম কিস্তি পরিশোধের পর পণ্য ও উহার মালিকানা ক্রেতার নিকট আসিয়া যায়।
২। কোন কিস্তি পরিশোধ করিতে না পারিলে বিক্রেতা ঐ পণ্য ক্রেতার নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারে।	২। ক্রেতা কোন কিস্তি পরিশোধ করিতে না পারিলে বিক্রেতা ঐ পণ্য বাজেয়াপ্ত করিতে পারে না। বাকী অর্থ আদায়ের জন্য আইনের আশ্রয় লইতে পারে।
৩। শেষ কিস্তি পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা ঐ পণ্য কাহারও নিকট হস্তান্তর করিতে পারে না।	৩। শেষ কিস্তি পরিশোধ হওয়ার পূর্বেই ক্রেতা ঐ পণ্য অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তর করিতে পারে।
৪। বিভিন্ন কিস্তির অর্থ এই পদ্ধতিতে পণ্যর ভাড়া বলিয়া গণ্য করা হয়।	৪। বিভিন্ন কিস্তির অর্থ এই পদ্ধতিতে পণ্যর মূল্য বলিয়া ধরা হয়।
৫। ইহাকে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি বলিয়া গণ্য করা হয় না।	৫। ইহাকে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (**Foreign Trade Controlling Organisation**) :—

যে কোন দেশ নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

(ক) **সরকার** :—

বৈদেশিক নীতি সরকারই স্থির করে। বিভিন্ন দেশের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। বাণিজ্য যুক্ত সম্পাদন করে। এইজন্য সরকারের একটি বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর থাকে। এই দপ্তরের মাধ্যমে সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

(খ) **শুল্ক কর্তৃপক্ষ** :—

এই কর্তৃপক্ষ আমদানি ও রপ্তানীকৃত পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করে এবং অবাঞ্ছিত পণ্যের আমদানি, রপ্তানী বন্ধ করে। রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উপর শুল্ক আদায় করিয়া রপ্তানীর অনুমতি পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখে। আমদানীর ক্ষেত্রেও আমদানীকারীর নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিয়া থাকে। বিভিন্ন পণ্য পরীক্ষা করিয়া দেখার পরে ইহারা মাল-খালাসের অনুমতি পত্র প্রদান করে।

(গ) **বন্দর কর্তৃপক্ষ** :—

বন্দর পরিচালনার সকলপ্রকার কাজ বন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয় জাহাজের চলাফেরা, শুল্ক আদায়, মাল নামান, উঠান প্রভৃতিই এই কর্তৃপক্ষের অন্যতম কাজ।

বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Methods of Foreign Trade Control) :—

নিম্নলিখিত পদ্ধতির সাহায্যে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

(১) **বাধা নিষেধ** :—

কোন পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির উপর সরকার কর্তৃক কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারিকে বাধা নিষেধ বলে। জাতীয় স্বার্থে সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে।

(২) **অনুমতি পত্র** :—

এই পদ্ধতির দ্বারাও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সরকার যদি কোন পণ্যের আমদানী ও রপ্তানীর জন্য অনুমতি পত্র না দেয় তবে আর ঐ পণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে পারে না।

৩। **পরিমাণ নির্দেশ :—**

এই পদ্ধতির দ্বারাও সরকার আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কোন পণ্যর সর্বোচ্চ আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যদি সরকার ঠিক করিয়া দেয় তবে ব্যবসায়ীরা তাহার অধিক আমদানী রপ্তানী করিতে পারিবে না।

৪। **শুল্ক :—**

সরকার আমদানীকৃত ও রপ্তানীযোগ্য পনার উপর শুল্কের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া উহার বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

৫। **বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ :—**

বৈদেশিক বাণিজ্যর জন্য বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হয়। উহা সরকারের নিকট পাওয়া যায়। ইহার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

৬। **বাণিজ্য চুক্তি :—**

সরকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে চুক্তি দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

৭। **সরকারী বাণিজ্য সংস্থা :—**

এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া এবং উহাদের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কারণ (**Causes for Control of Foreign Trade**) **:—**

যে সকল কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কারণসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

১। দেশের শিল্পকে সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য বৈদেশিক পণ্যর আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

২। রপ্তানীতে কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে দেশের অপ্রাচুর্য্য সম্পদ দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৩। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য পণ্য আমদানী বন্ধ করিয়া দেশের শিল্পগুলিকে পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হয়।

৪। আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত না হইলে দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী ছোট ব্যবসায়ী অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করে। ইহাতে জাতীয় আয়ের সম-বণ্টন হয় না।

৫। আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে ব্যবসায়ীগণ অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী করিয়া দেশের বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটায়। ইহা জাতীয় স্বার্থে ক্ষতি কর।

৬। রপ্তানীর তুলনায় আমদানী অধিক হইতে থাকিলে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দেয়।

৭। জাতীয় স্বার্থ ও আত্মরক্ষার জন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ একান্ত দরকার। ইহাতে প্রয়োজনীয় সামরিক যন্ত্রপাতির কারখানা দেশের ভিতরে গড়িয়া উঠিতে পারে।

৮। অনুন্নত দেশ বিশেষ করিয়া পরিকল্পনামূলক অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ (Some Words Used in Foreign Trade) :—

১। **অর্ডার** (Order) :—

আমদানীকারী তাহার প্রয়োজনীয় পণ্যের পরিমাণ, মূল্য, গুণগত উৎকর্ষ, প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া যে দলিলখানি রপ্তানী কারীর নিকট প্রেরণ করে তাহাকে অর্ডার পত্র বলে।

১। **ঋণের নিদর্শন পত্র** (Letter of Credit) :—

অর্ডার অনুযায়ী রপ্তানীকারী যখন পণ্য আমদানীকারীকে পণ্য প্রেরণ করে তখন উহার প্রাপ্তি স্বীকার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই পত্র ব্যবহৃত হয়। সেজন্য আমদানীকারী তাহার দেশের কোন ব্যাঙ্কের সাহায্য লয়। এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে রপ্তানীকারী তাহার পণ্যের মূল্য পাইয়া থাকে। সেজন্য আমদানীকারীর হইয়া বিদেশী ব্যাঙ্ক রপ্তানীকারীকে পণ্যের মূল্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া যে রসিদ প্রেরণ করে তাহাকেই ঋণের নিদর্শন পত্র বলে।

৩। **বাণিজ্য হুণ্ডি** (Bill of Exchange) :—

কোন নির্দিষ্ট সময় পরে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের সর্তহীন নির্দেশ পত্রকে বাণিজ্য হুণ্ডি বলে। বৈদেশিক বাণিজ্য রপ্তানীকারী আমদানীকারীর

উপর এইরূপ হুণ্ডি কাটিয়া থাকে। আমদানী উহাতে সহি করিয়া আবার রপ্তানীকারীকে ফেরৎ পাঠায়। নির্দিষ্ট সময় পরে রপ্তানীকারী ঐ অর্থ আমদানীকারীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়।

৪। **রপ্তানী চালান** (Export Invoice) :—

বিদেশে কোন মাল পাঠাইবার জন্য উহা জাহাজে বোঝাই করিবার পূর্বে ঐ মালের ওজন, মূল্য, আমদানীকারীর নাম, ঠিকানা, প্রভৃতি একটি কাগজে লিখিয়া একখানি বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এই বিবরণীর নাম রপ্তানী চালান।

(৫) **বন্ধকী পত্র** (Letter of Hypothecation) :—

যে পত্র মারফৎ কোন পণ্য ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখা হয় তাহাকে বন্ধকী পত্র বলে। বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থাৎ আমদানী ও রপ্তানী উভয় ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অগ্রিম কোন অর্থ লওয়ার প্রয়োজন হইলে এই বন্ধকী পত্রের মাধ্যমে তাহা সম্ভব হইতে পারে।

(৬) **জাহাজের সহ-অধ্যক্ষের রসিদ** (Mate's Receipt) :—

জাহাজে পণ্য তুলিয়া দেওয়ার পরে ঐ পণ্যের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জাহাজের সহ-অধ্যক্ষ অথবা অন্য কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মী যে রসিদ কাটিয়া দেয় তাহাকে জাহাজের সহ-অধ্যক্ষের রসিদ বলে।

(৭) **বহণ পত্র** (Bill of Leading) :—

জাহাজের নাম, গন্তব্যস্থল, পণ্য বোঝায়ের স্থান, মাশুলের পরিমাণ, প্রাপকের নাম প্রভৃতি যে রসিদে লেখা থাকে এবং যাহার মাধ্যমে জাহাজের মালিক ঐ পণ্য নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহাকে বহণ পত্র বলে। এই বহণ পত্র দেখাইয়া আমদানীকারী জাহাজ হইতে পণ্য খালাস করে। ইহা না থাকিলে আমদানীকারী মাল খালাস করিতে পারে না।

(৮) **বাণিজ্যদূতের চালান** (Consular Invoice) :—

আমদানীকারীর ফরমাস অনুসারে রপ্তানীকারী পণ্যের চালান প্রস্তুত করিয়া আমদানীকারী দেশের বাণিজ্য দূতের অফিসে জমা দেয়। ইহার পরে ঐ পণ্যের সত্যতা স্বীকার করিয়া বাণিজ্য দূত যে চালান দিয়া থাকে তাহাকে বাণিজ্যদূত

চালান বলে। এইরূপ চালান থাকিলে আমদানী শুল্ক সম্পর্কে কোন ঝামেলা থাকে না।

৯। **নৌ-বীমাপত্র** (Marine Insurance Policy) :—

বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্য পথিমধ্যে নষ্ট হইতে পারে। সেজন্য উহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বীমা কোম্পানীর সহিত যে চুক্তি করা হয় তাহাকে নৌ-বীমা বলে। জাহাজ, পণ্য, ও ভাড়া এই তিনটিই নৌ-বীমার বিষয়বস্তু। এই বীমার জন্য বীমা কোম্পানী প্রিমিয়াম পাইয়া থাকে।

১০। **প্রভব-লেখ** (Certificate of Origin) :—

যে পত্রে পণ্যর উৎপত্তির স্বীকারোক্তি থাকে এবং স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা ঐ স্বীকারোক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তাহাকে প্রভব-লেখ বলে। এই প্রভব-লেখ আমদানীকারী ও রপ্তানীকারী উভয়েই পাঠাইতে পারে। ইহার ফলে আমদানীকারী শুল্ক সম্পর্কে অনেক সুবিধা পায়।

১১। **দলিলী হুণ্ডি** (Documentary Bill) :—

পণ্যর রপ্তানীকারী জাহাজে পণ্য পাঠাইয়া ব্যাঙ্কের দ্বারা বাণিজ্য হুণ্ডির সহিত আমদানীকারীকে প্রভব-লেখ, নৌ-বীমাপত্র, চালানী রসিদ প্রভৃতি পাঠাইতে পারে। রপ্তানীকারী কর্তৃক প্রেরিত এরূপ হুণ্ডিকে দলিলী হুণ্ডি বলে। এই দলিলী হুণ্ডি স্বীকৃতি সাপেক্ষ ও পরিশোধ সাপেক্ষ উভয় প্রকার হইতে পারে।

১২। **আগম পত্র** (Bill of Entry) :—

কোন জাহাজ বন্দরে আসিয়া পৌঁছানোর পর কিন্তু মাল খালাসের পূর্ব্বে আমদানীকারীকে পণ্যর বিস্তৃত বিবরণ শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হয়। পণ্যর এই বিস্তৃত বিবরণকে আগম পত্র বলে। পণ্যর শুল্ক নির্ধারণের জন্য এই আগম পত্রের প্রয়োজন হয়।

১৩। **জাহাজী রিপোর্ট** (Ship's Report) :—

কোন জাহাজ বন্দরে আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহার অধ্যক্ষকে যে রিপোর্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষকে দিতে হয় তাহাকে জাহাজী রিপোর্ট বলে। এই রিপোর্টে জাহাজের নাম, বহন ক্ষমতা, অধ্যক্ষের নাম, মালের বিবরণ, প্রভৃতি ইহাতে লেখা থাকে।

ভুল রিপোর্ট দাখিল করিলে অধ্যক্ষকে শাস্তি পাইতে হইতে পারে এবং এমনকি জাহাজ ও পণ্য উভয়ই আটক হইতে পারে।

১৪। **মূল্যভিত্তিক শুল্ক** (Ad Valorem Duty) :—

পণ্যের মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া যে শুল্ক আদায় করা হয় তাহাকে মূল্যভিত্তিক শুল্ক বলে। বেশী মূল্যবান পণ্যের উপর এই পদ্ধতিতে শুল্ক ধার্য করা হয়।

১৫। **নির্দিষ্টহারে ধার্য শুল্ক** (Specific Duty) :—

আয়তন, মূল্য, ওজন প্রভৃতির ভিত্তিতে পণ্যের উপর যে শুল্ক ধার্য করা হয় তাহাকে নির্দিষ্টহারে ধার্য শুল্ক বলে। যেমন প্রতি কুইনটলে ৫ টাকা, প্রতি মিটারে ১ টাকা শুল্ক ইত্যাদি।

১৬। **শুল্ক ফেরৎ** (Drawback) :—

কোন পণ্যের আমদানী অথবা রপ্তানীর সময় একাধিকবার শুল্ক ধার্য হইয়া গেলে উহা ফেরৎ দিতে হয়। কারণ কোন পণ্যের উপর একবারের অধিক শুল্ক ধার্য করা হয় না। এইরূপে শুল্ক ফেরৎ দিলে তাহাকে শুল্ক ফেরৎ বলে।

১৭। **রাজবৃত্তি** (Bounty) :—

দেশীয় কোন নতুন শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অথবা বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় তাহাকে রাজবৃত্তি বলে।

১৮। **সহায়ক বৃত্তি** (Subsidy) :—

দেশের প্রয়োজনে ও কোন শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য সরকার ঐ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে যে অর্থ সাহায্য করে তাহাকে সহায়ক বৃত্তি বলে। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ হইয়া গেলে সরকার ঐ প্রকার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

১৯। **মৃত মাশুল** (Dead Freight) :—

পণ্য প্রেরণের জন্য জাহাজ ভাড়া লইয়া নির্দিষ্ট স্থান যদি সবটা ব্যবহৃত না হয় তবে জাহাজের মালিক অব্যবহৃত অংশটুকুর জন্য মাশুলের কিছু অংশ কম লয়। উক্ত মাশুলকে মৃত মাশুল বলে।

২০। **জাহাজের অধ্যক্ষের দস্তুরি** (Primage) :—

জাহাজের পণ্য পরিদর্শনের জন্য পণ্য প্রেরকের নিকট হইতে মাশুলের শতকরা ১০ ভাগ অতিরিক্ত আদায় করা হয়। এই অতিরিক্ত অর্থকে জাহাজের অধ্যক্ষের দস্তুরি বলে।

২১। **কড়তা** (Tare) :—

যাহার ভিতরে করিয়া পণ্য প্রেরণ করা হয় (যেমন মোড়ক, প্যাকিং, বাক্স প্রভৃতি) তাহাদের ওজনকে কড়তা বলে।

২২। **চলতা** (Draft) :—

পুনঃ পুনঃ পণ্য উঠান-নামানোর জন্য উহার ওজনের যে হ্রাস ঘটে তাহাকে চলতা বলে।

২৩। **নিকরাই** (Noting) :—

যে পণ্যর জন্য শুল্ক দিতে হয় এবং যাহার জন্য শুল্ক দিতে হয় না উভয়ই খাতায় লিখিয়া রাখা হয়। ঐরূপ লিখনকে নিকরাই বলে।

২৪। **পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাসী** (Rummaging) :—

শুল্ক অথবা চোরাই চালান সন্দেহ হইলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ জাহাজে যে তল্লাসী চালায় তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাসী বলে।

২৫। **ঋণপত্র** (Debenture) :—

সরকার অতিরিক্ত শুল্ক ফেরৎ দেওয়ার স্বীকৃতি হিসাবে যে দলিল প্রদান করে তাহাকে ঋণপত্র বলে।

বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী পদ্ধতি (Import Procedure) :—

বিদেশ হইতে কোন পণ্য আমদানী করিতে হইলে আমদানীকারীকে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১। **অনুমতি পত্র প্রাপ্তি** :—

বিদেশ হইতে যে পণ্য আমদানী করিতে হইবে তাহার উপর কোনপ্রকার বাধা নিষেধ থাকিলে সে ব্যাপারে সরকারের অনুমতি লইতে হইবে। সরকারের বিনা অনুমতিতে ঐ সকল পণ্য আমদানী করা যাইবে না।

২। **অর্ডার :—**

এই অনুমতি পত্র পাওয়ার পর যে যে পণ্য আমদানী করিতে হইবে তাহার অর্ডার তৈয়ার করিয়া রপ্তানীকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অনেক সময় গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করা হয়। পণ্যর কিছু মূল্য অনেক সময় রপ্তানীকারীকে আগাম দিতে হয়।

৩। **ঋণের প্রত্যয়ন পত্র :—**

আমদানীকারীর উপর রপ্তানীকারীর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য আমদানীকারী ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রদত্ত একটা ঋণের প্রত্যয়ণ পত্র পাঠায়। ইহা দ্বারা ব্যাঙ্ক রপ্তানী-কারীকে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

৪। **বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ :—**

পণ্যর মূল্য প্রদানের জন্য বিদেশী মুদ্রার দরকার হয়। সেজন্য আমদানীকারী সরকারের নিকট হইতে ইহার ব্যবস্থা করিবে। আবেদনপত্র পরীক্ষা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই মুদ্রা মঞ্জুর করে।

৫। **রপ্তানীকারী দ্বারা দলিল প্রাপ্তি :—**

রপ্তানীকারী জাহাজে মাল বোঝাই করিয়াই ঐ পণ্যর বিভিন্ন দলিলপত্রের নকল আমদানীকারীর নিকট পাঠাইয়া দেয়। অবশ্য ইহা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাঠান হয়। এই সকল দলিল আমদানীকারীকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৬। **পণ্য খালাস :—**

বন্দরে জাহাজ আসিলে আমদানীকারী উহা খালাসের জন্য ব্যবস্থা করিবে। যদি আমদানী শুল্ক বাকী থাকে তবে উহা পরিশোধ করিতে হইবে। এই শুল্ক ঠিক করার জন্য 'আগামপত্র' দাখিলের পর জাহাজের চালান রসিদ দেখাইয়াও পণ্য খালাস করা যায়।

৭। **বন্ধকী গুদামে মাল :—**

পণ্য খালাস করার সময় শুল্ক সব দেওয়া সম্ভব না হইলে ঐ পণ্য কিছু সময়ের জন্য জমা রাখা হয়। পরে ধীরে ধীরে শুল্ক দিয়া ঐ পণ্য লইয়া যাওয়া হয়।

৮। **মাল খালাসের প্রতিনিধি :—**

জাহাজ হইতে পণ্য খালাসের ঝামেলা আমদানীকারী না লইয়া প্রতিনিধির উপর ছাড়িয়া দিতে পাবে।

৯। **চূড়ান্ত হিসাব :—**

অর্ডার অনুযায়ী পণ্য পাইলে হিসাবে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু অর্ডার অনুযায়ী পণ্য না পাইলে উহার জন্য রপ্তানীকারীর সহিত যোগাযোগ করিয়া হিসাব স্থির করিতে হয়।

১০। **ক্ষতিপূরণ :—**

বিপদের জন্য কোন পণ্যরক্ষতি হইলে এবং উহার জন্য বীমা করা থাকিলে, বীমাকোম্পানীর নিকট হইতে ঐ পণ্যের ক্ষতিপুরণ আদায় করা হয়।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয় একটা রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে যেমন ;

আমদানীপদ্ধতি :—

|— অনুমতি পত্র প্রাপ্তি।
|— অর্ডার।
|— ঋণের প্রত্যয়ণ পত্র।
|— বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ।
|— রপ্তানীকারী দ্বারা প্রেরিত দলিল প্রাপ্তি।
|— পণ্য খালাস।
|— বন্ধকী গুদামে মাল।
|— মালখালাসের প্রতিনিধি।
|— চুড়ান্ত হিসাব।
|— ক্ষতিপূরণ।

বিদেশে পণ্যরপ্তানী পদ্ধতি (Export Procedure) :—

যদি কোন ব্যবসায়ী তাহার পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিতে চাহে তবে তাহাকে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(১) **পণ্যর ফরমাস প্রাপ্তি :—**

রপ্তানীকারীকে আমদানী কারীর নিকট হইতে পণ্যের লেখা ফরমাস পাইতে হইবে। এই ফরমাসে কি পণ্য, কতটা, প্রভৃতি বিস্তারিত লেখা থাকিবে। ইহাকে রপ্তানীর প্রথম স্তর বলে।

(২) **ঋণের প্রত্যয়ণ পত্র :—**

আমদানীকারী রপ্তানীকারীকে ইহা ব্যাঙ্ক দ্বারা পাঠাইয়া দেয়। ইহা হইতে রপ্তানীকারী তাহার পণ্যর মূল্য প্রাপ্তি সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

(৩) **বিনিময় হার নির্ধারণ :—**

প্রথম হইতে এই হার স্থির করিতে হয়। অন্যথায় ভবিষ্যতে অর্থাৎ নির্ধারণের সময় বিনিময় হার পরিবর্তন হইলে এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

(৪) **সরকারী অনুমতি পত্র :—**

যে পণ্য রপ্তানী করিতে হইবে তাহা যদি খোলা অনুমতিপত্রের অন্তর্গত না হয় তবে এ ব্যাপারে সরকারী অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে হয়। অন্যথায় ঐ পণ্য রপ্তানীতে সরকার বাঁধা দেয়।

(৫) **জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ের আবেদন :—**

পণ্য পাঠাইতে রপ্তানীকারী জাহাজ কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইবে। এই জাহাজেই পণ্য প্রেরিত হয়। এই রূপ চুক্তি না করিলে জাহাজে স্থানাভাবের জন্য পণ্য পাঠান বন্ধ হইতেও পারে।

(৬) **মোড়ক বাঁধাই ও জাহাজে বোঝাইয়ের জন্য প্রেরণ :—**

পণ্য যাহাতে নষ্ট না হয় সে জন্য প্রতিটি পণ্য মোড়ক বাঁধাই করিতে হইবে। অল্প পরিসরে অধিক পণ্য ধরিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ঐ মোড়কের উপর প্রাপকের নাম, ঠিকানা লিখিতে হয়।

এ সমস্তর পরে ঐ পণ্য জাহাজে বোঝাইয়ের জন্য জাহাজ ঘাটে প্রেরণ করিতে হয়। এ ব্যাপারে এজেন্টের সাহায্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৭) **শুল্ক বিভাগের নীতি অনুসরণ :—**

রপ্তানীর জন্য পণ্যর উপর শুল্ক দিতে হয়। শুল্ক বিভাগ রপ্তানীর বিভিন্ন কাগজ পত্র দেখিয়া শুল্ক নির্ধারণ করিয়া দেয়। ঐ শুল্ক পরিশোধ করিলে তাহার

জন্য রসিদ পাওয়া যায়। এবং ইহার পরে রপ্তানীকারীকে রপ্তানীর জন্য শুল্ক-বিভাগের অনুমতি দেওয়া হয়।

(৮) **ডক-রসিদ ও জাহাজের অধ্যক্ষের রসিদ :—**

রপ্তানীর জন্য পণ্য জাহাজে বোঝাই করিলে ডককতৃপক্ষ রপ্তানীকারীকে একটি ডক-রসিদ প্রদান করে। সেজন্য ডককর্তৃপক্ষকে জাহাজের বিল ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনুমতি পত্র দেখাইতে হয়। জাহাজের ক্যাপ্টেন অথবা সহকর্মী রপ্তানীকারীকে পণ্য জাহাজে বোঝাইয়ের জন্য অনুরূপ একটি রসিদ দেয়। উহাকে জাহাজের অধ্যক্ষের রসিদ বলে।

(৯) **চালানি রসিদ :—**

এই রসিদ রপ্তানীকারী নিজেই প্রস্তুত করে। ইহাতে ২৫ পয়সার টিকিট লাগাইতে হয়। জাহাজের নাম, পণ্য প্রাপকের নাম, ঠিকানা, পণ্যর বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে লেখা থাকে। ডক রসিদ ও জাহাজের অধ্যক্ষের রসিদ রপ্তানীকারী জাহাজী পরিবহণ কোম্পানীর নিকট দাখিল করে এবং জাহাজী কোম্পানী এই সময় মাশুলের হিসাব দেয়। এই মাশুল রপ্তানীকারী অথবা আমদানীকারী যে কেহ পরিশোধ করিতে পারে।

(১০) **বীমাপত্র :—**

পণ্যের পথিমধ্যে ঝুঁকি দূর করিবার জন্য রপ্তানীকারী পণ্যর জন্য বীমা গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে পণ্য নষ্ট হইলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়।

(১১) **রপ্তানীচালান :—**

এবার রপ্তানীকারী চারি-প্রস্থ পণ্যর রপ্তানীচালান প্রস্তুত করে। পণ্যর বিভিন্ন বিষয় ইহাতে লেখা থাকে। প্রয়োজনে রপ্তানীকারী পণ্যর 'প্রভব-লেখ' সংগ্রহ করে।

(১২) **বাণিজ্যিক হুণ্ডি ভাঙ্গানো :—**

এই হুণ্ডি ভাঙ্গানোর পর রপ্তানীকারীর আর কিছু করণীয় থাকে না। এই স্তরেই সমস্ত মূল্য পরিশোধ হইয়া যায় :—

উপরোক্ত বিষয় সমূহ রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে। যেমন ;

রপ্তানী পদ্ধতি :—

— পণ্যের ফরমাস প্রাপ্তি।
— ঋণের প্রত্যয়ণ পত্র।
— বিনিময় হার নির্ধারণ।
— সরকারী অনুমতি পত্র।
— জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ের আবেদন।
— মোড়ক বাঁধাই ও জাহাজে বোঝাইয়ের জন্য প্রেরণ।
— শুল্ক বিভাগের নীতি অনুসরণ।
— ডক-রসিদ ও জহাজের অধ্যক্ষের রসিদ।
— চালানি রসিদ।
— বীমাপত্র।
— রপ্তানী চালান
— বাণিজ্যিক হুণ্ডি ভাঙ্গানো।

ভারত সরকারের আমদানী নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Machinery of the Government of India to Control Imports) :—

ভারতীয় আমদানী বাণিজ্য সম্পূর্ণ ভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাকে আমদানী নিয়ন্ত্রণের নায়ক বলা যায়। আমদানী নীতি ইহারাই স্থির করে। এবং বৎসরে একবার ঐ নীতি ঘোষিত হয়। ইহাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বন্দরের উচ্চ পদস্থ কর্মীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইহারা ছাড়া আমদানী রপ্তানী উপদেষ্টা সমিতিও আছে।

পণ্য আমদানী করিতে হইলে বৈদেশিক মুদ্রা দরকার। এই মুদ্রা একমাত্র রপ্তানী দ্বারা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে এ ব্যবস্থা ঘাটতি চলিতেছে। অর্থাৎ আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর অপেক্ষা অনেক বেশী। সে জন্য দেখা দিয়াছে আমদানী নিয়ন্ত্রণ।

যে সকল পণ্য আমদানী জাতীয় স্বার্থের বিরোধী সে সকল পণ্য আমদানী করিতে দেওয়া হয় না। কারণ ইহাতে জাতীয় সঙ্কট আরও প্রকট হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া বিলাস দ্রব্য, ভোগ্য দ্রব্য প্রভৃতির আমদানীর অনুমতিও খুব সামান্য দেওয়া হয়। শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ও যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের বেকার সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পাইবে।

প্রতি বৎসর আমদানী নীতি পরিবর্তন করা হয়। আমদানী নীতি দুই প্রকারের হইতে পারে যেমন খোলা অনুমতি পত্র এবং সীমাবদ্ধ অনুমতি পত্র। খোলা অনুমতি পত্রে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পণ্য আমদানী করিতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমদানী করিতে পারে।

সুতরাং উপরোক্ত পদ্ধতিতে ভারত সরকারের আমদানী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচনা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার পদ্ধতি (Steps to encourage the Export Trade of India) :—

কোন দেশের আমদানী নির্ভর করে ঐ দেশের রপ্তানীর উপর। কারণ আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করিতে হয় রপ্তানীকৃত পণ্যের আয় হইতে। এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই রপ্তানী বাণিজ্যের গুরুত্ব অনেক বেশী। সে জন্য সরকার এই রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতে উৎসাহী। ভারত সরকার এই রপ্তানী বাণিজ্যকে বৃদ্ধি বা উৎসাহিত করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করিয়াছে।

(ক) **বাণিজ্য বোর্ড স্থাপন :—**

রপ্তানীর পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি করা যায় সেই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া এই সংস্থা সরকারকে ঐ ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। পরামর্শ প্রদানই এই বিভাগের অন্যতম কার্য।

(খ) **রপ্তানী উন্নয়ন সংস্থা :—**

বাণিজ্য বোর্ডের সুপারিশ এই বিভাগ কার্যকরী করিয়া থাকে। ইহারা আবার বাণিজ্যিক পরিসংখ্যাণ ও বাণিজ্য কমিশনারদের কার্যের মধ্যে সমতা রক্ষা করে।

(গ) **রপ্তানী উন্নয়ন উপদেষ্টা সমিতি :—**

সরকারকে এই সমিতিও পরামর্শ দিয়া থাকে। দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয়ও সরকারের নজরে লইয়া আসে। রপ্তানীর ক্ষেত্রে পণ্য খালাস, বোঝাই প্রভৃতি ব্যাপারও সমিতি পরীক্ষা করিয়া দেখে।

(ঘ) **রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ :—**

ভারতীয় আমদানীর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পক্ষান্তরে রপ্তানী যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। সেজন্য ঘাটতি বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত দেখাইতেছে।

ইহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে রপ্তানী বৃদ্ধি একান্ত দরকার। আর এই রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে।

(ঙ) **বাণিজ্যিক সভা :—**

বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সভায় অংশ গ্রহণ দ্বারাও রপ্তানী বৃদ্ধি করা যায়। কারণ বিভিন্ন দেশের জনগন পণ্য সম্পর্কে অভিহিত হয় এবং ধীরে ধীরে তাহারা পণ্যটি ক্রয় করে। ইহাতে রপ্তানী বৃদ্ধি পায়।

(চ) **পণ্যমণ্ডলী :—**

রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শিল্পের পৃথক পৃথক পণ্য মণ্ডলী স্থাপিত হইতে পারে।

(ছ) ভাড়ার ছাড় :—

সরকার যদি রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উপর ভাড়া প্রকৃত অর্থ অপেক্ষা কম গ্রহণ করে তবে তাহাতে রপ্তানী বাণিজ্য উৎসাহ বোধ করিবে এবং রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে।

(জ) গুণগত নিয়ন্ত্রণ :—

রপ্তানীযোগ্য সকল পণ্যের গুণগত মান যদি একই হয় তবে তাহাতে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। সেজন্য গুণগত মান নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

ইহা ছাড়াও রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য সরকার বাণিজ্যিক সালিশী ব্যবস্থা, রপ্তানী গ্যারান্টি ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক সেবা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার মাধ্যমে মোট রপ্তানীর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

রপ্তানী বাণিজ্য ও প্রয়োজনীয় অর্থ (Export and Necessary Finance) :—

রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উৎস হইতে পাওয়া যায়।

(১) **বিনিময় ব্যাঙ্ক :—**

রপ্তানী বাণিজ্যের বিভিন্নপ্রকার হুণ্ডি বা দলিল বিনিময় ব্যাঙ্ক ক্রয় করে। এবং তাহার পরিবর্তে অর্থ প্রদান করে। ইহারা বিনিময় হারের হ্রাস বৃদ্ধিও রোধ করে,

ইহাতে বিভিন্ন পক্ষ লাভবান হয়। এই ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক দেনা পাওনা মিটাইবার জন্য ধাতু ও সিকিউরিটিও আমদানী করে। এইরূপে ইহারা রপ্তানী বাণিজ্যে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে।

(২) **যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক :—**

ইহারাও বৈদেশিক বাণিজ্যকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। বিদেশে ইহাদেরও শাখা আছে কিন্তু বিনিময় ব্যাঙ্কের ন্যায় ইহারা ততটা অগ্রগতি দেখাইতে পারে নাই।

(৩) **স্বীকৃতিদানের প্রতিষ্ঠান :—**

কোন হুণ্ডি এরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বীকৃত হইলে পণ্যের মূল্য সম্পর্কে রপ্তানীকারী নিশ্চিন্ত হইতে পারে। ঐ হুণ্ডি বাট্টাও করা যায়। ব্যক্তি এবং যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কও এরূপ স্বীকৃতি প্রদানের কাজও করিতে পারে। এইরূপে ইহারা রপ্তানী বাণিজ্যে সাহায্য করিয়া থাকে।

(৪) **ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া :—**

আমদানী ও রপ্তানীকারীকে এই ব্যাঙ্ক ঋণের নিদর্শন পত্র দিয়া থাকে। বিনিময় হার নির্ধারণ, হুণ্ডিতে স্বীকৃতি প্রদান, প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে। অনেক সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের ঝুঁকিও গ্রহণ করে। পণ্য প্রেরণের জন্যও অনেক সময় ঋণ প্রদান করে।

(৫) **রপ্তানী ঋণ ও রপ্তানী বীমা কর্পোরেশন :—**

ইহা রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য ঝুঁকি বহন করে এবং রপ্তানী ঋণও তাহার গ্যারাণ্টি প্রদান করে। এই প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য জ্ঞাপনের বিভিন্ন নিয়ম (Different Kinds of Price Quotations in Foreign Trade) :—

বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্ন প্রকারে পণ্যের মূল্য জ্ঞাপন করা হয়। যেমন ;

(ক) উৎপাদন স্থানে পণ্য অর্পণ মূল্য :—

পণ্য মূল্যর সাথে এই কথা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা পণ্যের প্রকৃত মূল্য। অন্যপ্রকার ব্যয় বিক্রেতা বহণ করিবে না। ঐ মূল্যে ক্রেতাকে বিক্রেতার বিক্রয় স্থান হইতে পণ্য ক্রয় করিতে হইবে।

(খ) রেলগাড়ী পর্যন্ত :—

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে পণ্যর রেলগাড়ীতে পৌছানো পর্যন্ত মূল্য ইহাতে ধরা হইয়াছে। বিক্রেতা রেলগাড়ীতে বোঝাই পর্যন্ত খরচের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

(গ) জাহাজ পার্শ্ব পর্যন্ত :—

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে পণ্যর মূল্যের সহিত জাহাজঘাটায় খরচ পর্যন্ত যুক্ত হইয়াছে। বিক্রেতাই ঐ পণ্য জাহাজ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে।

(ঘ) জাহাজে উঠান পর্যন্ত :—

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে পণ্য মূল্যর সহিত জাহাজে উঠান পর্যন্ত সমস্ত খরচ ধরা হইয়াছে। এবং পণ্য উঠান পর্যন্ত সমস্ত খরচ বিক্রেতা বহন করিবে।

(ঙ) গুদাম পর্যন্ত :—

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে পণ্যর গুদাম পর্যন্ত পরিবহণ খরচও পণ্যর মূল্যে ধরা হইয়াছে। ঐ খরচ বিক্রেতা বহণ করিবে।

অবতরণ পর্যন্ত :—

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে পণ্যর অবতরণ পর্যন্ত অর্থাৎ জাহাজ হইতে নামা পর্যন্ত সকল ব্যয় পণ্যর মূল্যর সহিত ধরা হইয়াছে এবং ঐ ব্যয় বিক্রেতা বহণ করিবে।

(চ) মাশুল সহ :—

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে পণ্যর মূল্যের সহিত জাহাজে ওঠানো নামানো খরচ ও উহার মাশুল সবই ধরা হইয়াছে। এবং ঐ খরচ বিক্রেতা বহণ করিবে।

(ছ) মাশুল ও বীমাসহ :—

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে পণ্যর মূল্যের সহিত জাহাজের মাশুল ও বীমার প্রিমিয়ামের অর্থও যোগ করা হইয়াছে। এবং সমস্ত ব্যয় বিক্রেতা বহণ করিবে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসা এবং ইহার উদ্দেশ্য, সুবিধা-অসুবিধা (State Trading Corporation and its Function, merits and Demerits) :—

একটি প্রাইভেট কোম্পানী রূপে ১৯৫৬ সালের মে মাসে ইহার পত্তন হয়। অনুমোদিত পুঁজি ১ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত পুঁজি ৫ লক্ষ টাকা লইয়া ইহা কাজ শুরু করে। পরবর্তীকালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার পরিচালনার ভার সরকার নির্বাচিত সদস্যগণের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে।

বে-সরকারী মালিকানায় ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য এতদিন চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে জাতীয় অর্থনীতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই দুর্বলতা কাটাইয়া উঠার জন্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ ব্যবস্থায় ইহা একটি দৃঢ় পদক্ষেপ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইহা বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে স্থান অধিকার করিবে না। উপরন্তু উহাদের পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া সামগ্রিক দেশের কল্যাণ সাধন করিবে।

উদ্দেশ্য :—

১। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের ব্যয় সংকোচ করা।

২। প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ ইহা মজুত রাখে।

৩। বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা পণ্য বণ্টন করিয়া থাকে।

৪। নতুন বাজার সৃষ্টি করিয়া রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৫। সরকারী পর্য্যায়ে বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিয়া থাকে। এবং

৬। বৈদেশিক প্রতিনিধির সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য যোগাযোগ সৃষ্টি করে।

সুবিধা :—

এই প্রতিষ্ঠানের সুবিধা সমূহ নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

(১) এই সংগঠনের মাধ্যমে পণ্যের ফাট্‌কা কারবার বন্ধ হইয়া যায়।

(২) সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এইরূপ সংস্থা যথেষ্ট সহায়তা করে।

(৩) বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সরকারী মালিকানা এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা হয়।

(৪) এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা হইলে কারবারীগণ আর অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারে না।

৫। এই ব্যবস্থা চালু হইলে পণ্যের মূল্যস্থিরতা সম্ভবপর হয়।

৬। দেশের মূল্যবান সম্পদ সমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

৭। অর্থনৈতিক উন্নতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া এই ব্যবস্থা যথেষ্ট সহায়তা করে।

অসুবিধা :—

১। সরকারী অফিসের যে সকল দোষ-ত্রুটি দেখা যায় তাহা হইতে এই সংস্থা মুক্ত নহে।

২। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহার প্রয়োজনীয়তা খুব কম।

৩। অনভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগের ফলে এই প্রতিষ্ঠানে লাভের পরিবর্তে লোকসান হয়।

৪। সরকারী অফিসের নিয়মমাফিক কাজের পদ্ধতির জন্য এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ কাজ করিতে উৎসাহ পায় না।

৫। ইহার পরিচালনার খরচ খুব বেশী হয় এবং ক্রেতার ব্যক্তিগত রুচি ও স্বাধীনতা এই পদ্ধতিতে নষ্ট হইয়া যায়।

বাণিজ্য শুল্ক (Customs Duties) :—

কোন পণ্য আমদানীর জন্য ও রপ্তানীর জন্য যে শুল্ক দিতে হয় তাহাকে **বাণিজ্য শুল্ক** বলে। আমদানী পণ্যের উপর প্রদত্ত শুল্ককে আমদানী শুল্ক বলে, আর রপ্তানী পণ্যের উপর প্রদত্ত শুল্ককে রপ্তানী শুল্ক বলে।

এই বাণিজ্য শুল্ক আবার রাজস্ব শুল্ক ও সংরক্ষণ শুল্ক এই দুইপ্রকার হইতে পারে। সরকারী আয় বৃদ্ধির জন্য আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের উপর যে শুল্ক দেওয়া হয় তাহাকে **রাজস্ব শুল্ক** বলে, আর বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য যে শুল্ক ধার্য করা হয় তাহাকে **সংরক্ষণ শুল্ক** বলে।

আবগারী ও উৎপাদন শুল্ক (Excise Dutis) :—

যে সকল দেশী পণ্যের অত্যধিক ব্যবহার ক্ষতিকারক তাহার ব্যবহার কমাইবার জন্য তাহার উপর যে শুল্ক বসান হয় তাহাকে **আবগারী শুল্ক** বলে। যেমন মদ, গাঁজা, আফিং প্রভৃতির উপর শুল্ক।

অন্যদিকে যে সকল দেশীয় পণ্যের ব্যবহার খুব ব্যাপক তাহাদের উপর যখন শুল্ক

ধার্য করা হয় তখন তাহাকে উৎপাদন শুল্ক বলে। যেমন তামাক, তৈল, বনস্পতি প্রভৃতির উপর ধার্য শুল্ক।

বাণিজ্য শুল্ক ও উৎপাদন শুল্কের মধ্যে পার্থক্য (Distinction Between Customs Duties and Excise Duties) :—

১। শিল্প সংরক্ষণ, আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব সংগ্রহ প্রভৃতিই হইতেছে বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করার উদ্দেশ্য। কিন্তু অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব সংগ্রহ প্রভৃতি হইতেছে উৎপাদন শুল্কের উদ্দেশ্য।

২। আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের উপর হইতেই বাণিজ্য শুল্ক আদায় করা হয় কিন্তু দেশীয় পণ্যের উপর হইতেই উৎপাদন শুল্ক আদায় করা হয়।

গুদামজাত করণের অর্থ, শ্রেণীবিভাগ, ও উহার গুরুত্ব (Meaning, Classification, and Importance of Warehousing) :—

ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য যখন কোন পণ্য মজুত রাখা হয় তখন তাহাকে **গুদামজাতকরণ** বলে। মূল্যস্তর স্থির রাখিতে ইহা একান্ত দরকার। যে পণ্য বর্তমানে উৎপন্ন হইতেছে তাহা যদি সব বর্তমানেই শেষ হইয়া যায় তবে ভবিষ্যতে উহা আর পাওয়া যায় না ফলে অভাব সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পণ্যের গুদামজাতকরণ একান্ত দরকার।

দুইপ্রকারে পণ্য গুদামজাতকরণ করা যাইতে পারে যেমন ;

পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী এবং পণ্যের মালিকানা অনুযায়ী।

প্রকৃতি অনুযায়ী পণ্যের গুদামকে কাঁচামালের গুদাম ও প্রস্তুত পণ্যের গুদাম এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

অন্যদিকে মালিকানা অনুযায়ী গুদামকে ব্যক্তিগত বেসরকারী ও শুল্কাধীন গুদাম এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

গুরুত্ব :—

১। ইহার দ্বারা যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য রক্ষা করিয়া ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় সম্ভব হয়।

২। পণ্য গুদামজাত হইলে ভবিষ্যতে উহার অভাব দেখা দেয় না।

৩। গুদামঘর হইতে পণ্যের মালিক প্রয়োজনমত পণ্য বাজারে বিক্রয় করিতে পারে।

৪। অল্পব্যয়ে পণ্য এই গুদামে মজুত রাখা যায়।

৫। গুদামজাত পণ্যার রসিদ দেখাইয়া ব্যবসায়ী প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইতে পারে।

৬। এই গুদামজাতকরণ দেশের শিল্পায়ণে যথেষ্ট সহায়তা করে।

৭। শুল্কাধীন পণ্যার রপ্তানী বাণিজ্য ইহাতে বৃদ্ধি পায়।

৮। এই গুদামঘর বন্দরের নিকট অবস্থিত হওয়ায় রপ্তানী বাণিজ্যে পরিবহণ খরচ কম পড়ে।

শুল্কাধীন গুদামের অর্থ ও সুবিধা (Meaning and Advantages of Bonded Warehouse) :—

ভবিষ্যতে প্রদানের ভিত্তিতে যখন কোন পণ্য গুদামে মজুত রাখা হয় তখন তাহাকে শুল্কাধীন গুদাম বলে। পণ্যর মালিক এই ক্ষেত্রে গুদাম মালিকের নিকট প্রতিজ্ঞা করে যে ভবিষ্যতে পণ্যর গুদামজাত খরচ পরিশোধ করিয়া দিবে।

এই প্রকার গুদামে পণ্য মজুত রাখিতে হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন হয়। কর্তৃপক্ষ প্রথমে পণ্য পরীক্ষা করিয়া দেখে তাহার পরে উহা গুদামজাত করণের অনুমতি প্রদান করে। মালিককে এই ব্যাপারে যে রসিদ দেওয়া হয় তাহাকে wareant বলে।

সুবিধা :—

১। এই পদ্ধতিতে পণ্যর মালিক একসাথে সমস্ত শুল্ক প্রদান না করিয়া ধীরে ধীরে প্রদান করিয়া পণ্য ছাড়াইয়া লইতে পারে।

২। ইহা পুনঃরপ্তানী ব্যবসাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৩। পণ্যর মালিক এই জাতীয় গুদামঘর হইতে প্রয়োজন অনুসারে পণ্যর মিশ্রণ, মান প্রস্তুত করিতে পারে।

৪। যে সকল রপ্তানী পণ্যর উপর আবগারী শুল্ক ধার্য করা হয় তাহা প্রথমেই এই গুদামে রাখিয়া দিলে তাহার উপর আর আবগারী শুল্ক দিতে হয় না। শুধুমাত্র রপ্তানী শুল্ক প্রদান করিলেই হইয়া যায়।

৫। এই প্রকার গুদামে পণ্য মজুত ও সংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকায় ব্যবসায়ীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

বহণপত্র ও জাহাজ ভাড়ার চুক্তিপত্রের অর্থ ও উহাদের বৈশিষ্ট্য (Meaning and Feautures of Bill of Leading and Character Party) :—

পণ্যার বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ করিয়া জাহাজে মাল বহনের জন্য প্রস্তুত চুক্তিপত্রকে **বহনপত্র** বলে।

অপরদিকে পণ্য রপ্তানী ও আমদানীর জন্য জাহাজের কোন অংশ বা সমগ্র অংশ ভাড়া লওয়ার জন্য সম্পাদিত চুক্তিকে জাহাজ ভাডার **চুক্তিপত্র** বলে। এই চুক্তিকে পণ্যার বিবরণ, উভয় পক্ষের নাম, প্রভৃতি লেখা থাকে।

বহনপত্রের বৈশিষ্ট্য :—

১। ইহাকে জাহাজে পণ্য প্রেরণের জন্য মালপ্রাপ্তির স্বীকার পত্র বলে।

২। ইহাকে মালবহনের চুক্তিপত্র বলে।

৩। ইহাকে পণ্যর দলিল বলে কারণ ইহা যাহার কাছে থাকিবে সে লোক ঐ পণ্য খালাস লইতে পারে।

৪। ইহা হস্তান্তরযোগ্য দলিল না হইলেও বাস্তবে ইহা হস্তান্তরিত হইতে দেখা যায়।

৫। ইহাতে জাহাজের নাম, পণ্যর বিবরণ, প্রাপকের নাম, ঠিকানা প্রভৃতি লেখা থাকে।

৬। এই বহনপত্র নির্দোষ এবং ত্রুটিপূর্ণ উভয়প্রকার হইতে পারে।

৪। পণ্যর রপ্তানীকারী ইহা প্রস্তুত করে। পরে উহা পরীক্ষা করিয়া জাহাজ কোম্পানী উহাতে সহি দিয়া দেয়।

জাহাজ ভাড়ার চুক্তিপত্রের বৈশিষ্ট্য :—

১। যাত্রা স্বরুর সময় নদীর উপযুক্ত নাব্যতা ইহাতে উল্লেখ থাকে।

২। রপ্তানীকারী জাহাজের মালিকের বিনা অনুমতিতে বে-আইনী পণ্য জাহাজে বোঝাই করিতে পারে না।

৩। বিশেষ কোন প্রয়োজন ভিন্ন জাহাজ যাত্রাপথ পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

৪। পণ্য বোঝাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ বন্দরে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। এবং

৫। নির্দিষ্ট দিনে জাহাজ যাত্রা শুরু করিবে।

বহনপত্র ও জাহাজ ভাড়ার চুক্তিপত্রের মধ্যে পার্থক্য ('Distinction between Bill of Lading and Character Party):—

বহনপত্র	জাহাজ ভাড়ার চুক্তিপত্র
১। ইহাকে পণ্য বহনের রসিদ বলে।	১। ইহাকে জাহাজ ভাড়ার রসিদ বলে।
২। ইহা হস্তান্তর যোগ্য দলিল নহে, তথাপি বাস্তবে ইহা হস্তান্তর হইয়া থাকে।	২। ইহাকে হস্তান্তর যোগ্য দলিল বলে না এবং বাস্তবেও ইহা হস্তান্তরিত হয় না।
৩। পণ্য পরিবহণের জন্য ইহাতে জাহাজের একটি সামান্য অংশ ভাড়া লওয়া হয়।	৩। ইহাতে পণ্য পরিবহণের জন্য সমগ্র জাহাজটি অথবা উহার অধিকাংশ স্থানই ভাড়া লওয়া হয়।
৪। পণ্য বহন ইহার উদ্দেশ্য হইলেও জাহাজ ভাড়া ইহার সহিত জড়িত।	৪। শুধুমাত্র জাহাজ ভাড়া সংক্রান্ত ব্যাপার ইহাতে জড়িত। পণ্য বহনের কোন সম্পর্ক ইহাতে নাই।
৫। ইহাতে সম্পাদিত চুক্তির বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। জাহাজ ভাড়ার রসিদ পত্রের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।	৫। ইহাতে অন্য প্রকার চুক্তি করা হইয়া থাকে। বহনপত্রের চুক্তির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. পণ্য বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

(Describe the various methods of distribution of goods).

2. পণ্য বিক্রয়ে বিভিন্ন প্রকার মধ্যস্থ কারবারীর নাম উল্লেখ কর এবং পাইকারী ব্যবসায়ীর গুরুত্ব আলোচনা কর।

(Mention the different types of intermediaries that are found in the distribution of goods from the producers to ultimate Consumers; And discuss the importance of Whole Sale Traders).

3. পাইকারী ব্যবসা ও খুচরা ব্যবসা কাহাকে বলে? উহাদের কার্য ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(What is meant by Whole Sale and Retail Trade? Discuss their functions and importance).

4. ব্যবসায়ে মধ্যস্থকারবারীর সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Discuss the merits and demerits of business intermediaries).

5. বহুশাখা বিপণির অর্থ, সংগঠন, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What is multiple shop? What are its functions, merits and demerits?)

6. বিপণি শৃঙ্খল কাহাকে বলে? ইহার পরিচালনা, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What is chain store? Discuss its organisation, advantages and dis-advantages).

7. বিপণি শৃঙ্খল ও বহুশাখা বিপণির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

(Distinguish between chain store and multiple shop).

8. বিভাগীয় বিপণি কাহাকে বলে? ইহার পরিচালনা, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(Define departmental store. Discuss its organisation, merits and de-merits).

9. (a) বিভাগীয় বিপণি ও বহু শাখা বিপণির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

(b) ডাকযোগে বিক্রয় কাহাকে বলে? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(c) অধি-বিপণি কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(a) Distinguish between departmental store and multiple shop.

(b) What is mail-order-business? Discuss its merits and demerits.

(c) What is super market? What are its functions, merits and demerits?

10. কেবায়া ও কিস্তিবন্দী বিক্রয় কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। কেবায়া বিক্রয় ও কিস্তিবন্দী বিক্রয়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

(What is meant by hire purchases and instalment purchases? Discuss their features. Distinguish between hire purchase and instalment purchases).

12. বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সমূহ বর্ণনা কর। কি প্রকারে উহা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহা আলোচনা কর। ঐরূপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় বর্ণনা কর।

(Describe the control organisations of foreign trade. How it is actually operated? What'are the necessites of such control?)

13. বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

(Describe in stort, the various words used in foreign trade).

14. বিদেশ হইতে কোন পণ্য আমদানী এবং বিদেশে কোন পণ্য রপ্তানীর পদ্ধতি আলোচনা কর।

(Discuss the import and export procedure of foreign trade).

15. ভারত সরকার কি প্রকারে আমদানি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে তাহা আলোচনা কর। এবং রপ্তানী বাণিজ্যকে উৎসাহিত করিবার পদ্ধতিগুলিও বর্ণনা কর।

(Describe the steps that have been introduced by the Government of India to control her import. And also describe the steps taken by the Government to encourage the export of foreign trade).

16. রপ্তানী বাণিজ্যর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন কোন উৎস হইতে পাওয়া যায় তাহা আলোচনা কর।

(Describe the various sources that finance the export trade).

17. বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য জ্ঞাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

(Describe the various methods of price quotations in foreign trade).

18. রাষ্ট্রীয় কারবার সংস্থা কাহাকে বলে? ইহার উদ্দেশ্য, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What is state trading corporation? Discuss its functions, merits and demerits).

19. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(a) বাণিজ্যিক শুল্ক। (b) আবগারী ও উৎপাদন শুল্ক। (c) বাণিজ্য শুল্ক ও উৎপাদন শুল্কের পার্থক্য নির্ণয় কর।

(Write notes on : —

(a) Customs duties, (b) Excise duties, (c) Distinguish between customs duties and excise duties).

20. গুদামজাতকরণ বলিতে কি বুঝ? ইহার শ্রেণীবিভাগ ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

(What is meant by Warehousing? Discuss is classification and importance).

21. শুল্কাধীন গুদাম কাহাকে বলে? ইহার সুবিধা কি?

(What is meant by Bonded warehouse? What are its merits?).

22. (a) বহনপত্র ও জাহাজভাডার চুক্তিপত্র কাহাকে বলে? উহাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

(b) বহনপত্র ও জাহাজ ভাড়ার চুক্তিপত্রের পার্থক্য নির্ণয় কর।

(a) What is meant by Bill of Lading and Charter Party? What are their Functions?

(b) Distinguish between Bill of Lading and Charter Party).

প্রচার, বিজ্ঞাপণ ও বিক্রয় বিদ্যা

(Publicity, Advertisement and Salesmanship)

প্রচার ও বিজ্ঞাপনের অর্থ ও উহাদের মধ্যে পার্থক্য (Meaning of Publicity and advertisement, And distinction between the two) :—

কোন উৎপন্ন পণ্যকে নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী জনগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার প্রচেষ্টাকে **প্রচার বলে**। মনে করা যাক আমরা কোন নতুন কলম উৎপাদন শুরু করিয়াছি। সুতরাং ঐ সকল কলম জনগণের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। এখন যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জনগনকে সচেতন করিয়া ঐ কলম তাহাদের নিকট বিক্রয় করিব তাহাকে **প্রচার বলে**।

পক্ষান্তরে কোন পণ্যর সহিত উহার ক্রেতার পরিচয় ঘটানোর মাধ্যমকে **বিজ্ঞাপন বলে**। **যেমন** নতুন কোন পণ্য উৎপন্ন হইলে জনগণকে তাহা জানাইতে হয়। যে সকল পদ্ধতিতে উহা জানানো হয় তাহাকে বিজ্ঞাপন বলে।

এখন প্রচার ও বিজ্ঞাপণের মধ্য নিম্নলিখিত **পার্থক্যগুলি** আমরা সহজেই করিতে পারি :—

প্রচার	বিজ্ঞাপন
১। কোন পণ্যসামগ্রীর সহিত নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে জনগণকে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার পদ্ধতিকেই প্রচার বলে।	১। উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর সহিত উহার ক্রেতার পরিচয় করানোর পদ্ধতিকে বিজ্ঞাপন বলে।
২। প্রচারের কাজ অত্যন্ত ব্যাপক। বিজ্ঞাপন ইহার একটি অংশ মাত্র। বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বিজ্ঞাপন উহাদের অন্যতম।	২। বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি অংশ মাত্র। সুতরাং প্রচার ও বিজ্ঞাপনের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে সমগ্র ও অংশের মধ্য পার্থক্য।
৩। মুনাফাই প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। জনকল্যান মূলক বিভিন্ন কাজেও প্রচার দরকার হয়।	৩। বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা। জনকল্যানমূলক কাজে বিজ্ঞাপন থাকিলেও তাহা মুনাফা বর্জিত নহে।

প্রচার	বিজ্ঞাপন
৪। বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য প্রচার দরকার হয়। ইহা ব্যবসা সংক্রান্ত অথবা অন্য ব্যাপারেও হইতে পারে।	৪। বিজ্ঞাপন ব্যবসার সহিত জড়িত। বিজ্ঞাপন কথাটি থাকিলেই আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, ইহা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার।
৫। প্রচার মৌখিক ও লিখিত অর্থাৎ মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উভয় প্রকার হইতে পারে।	৫। সর্বত্র প্রায় বিজ্ঞাপন মুদ্রিত আকারেই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য (Objects and Importance) :—

জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ব্যবসায়ও উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রাচীন কালের ব্যবসা ও বর্তমানের ব্যবসার মধ্যে অনেক পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন কালে এই ব্যবসা ছিল কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। পন্যার ক্রেতাও ছিল তখন ঐ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। পন্যর ক্রেতারাই বিভিন্ন পন্যসম্পর্কে সজাগ থাকিত। সুতরাং তখন বিজ্ঞাপন বা প্রচারের কোন দরকার ছিল না। পন্য উৎপাদনের সাথে সাথে ক্রেতারা নিজেদের প্রয়োজন মত পন্য বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু বর্তমানে এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন ব্যবসা কোন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নহে। উহা বিশ্বব্যাপী। আর ঐ পণ্যর ক্রেতারাও বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া আছে। সে জন্য উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে তাহাদের প্রাচীনকালের মত সম্যক জ্ঞান নাও থাকিতে পারে। সেজন্য ক্রেতাগণকে জানাইতে বিজ্ঞাপন একান্ত দরকার। অন্যথায় ক্রেতারাও পণ্য ক্রয় করিবে না এবং কারবার লোকসানে পরিচালিত হইবে। সুতরাং এই রূপ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহার দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। এই সমন্বয় সাধনই বিজ্ঞাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। এই সমন্বয় সাধনের পরে পণ্যের বাজারেও ইহার অসীম গুরুত্ব রহিয়াছে। সেখানেও এই বিজ্ঞাপন দ্বারা পণ্যর গুণ বা উৎকর্ষ ক্রেতাগণকে জানানো যায়। ইহাতে ক্রেতাগণ মুগ্ধ হইয়া ঐ পণ্য ক্রয় করে এবং কারবার অতি সুন্দর ভাবে মুণাফার ভিত্তিতে চলিতে থাকে। সুতরাং বর্তমান যুগে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞাপনের তাৎপর্য অপরিসীম। সুতরাং

এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে সকল উদ্দেশ্য বা কাজ সম্পাদিত হয় তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

১। বিজ্ঞাপনের দ্বারা বাজারে প্রচলিত পণ্যের বিক্রয় আরও বৃদ্ধিপায়। কারণ ইহা দ্বারা ক্রেতাগণ আকৃষ্ট হয় এবং পণ্য ক্রয় করে।

২। বিজ্ঞাপন নূতন পণ্যের ক্ষেত্রে একান্ত দরকার। কারণ ক্রেতারা নূতন পণ্যের সংবাদ নাও রাখিতে পারে। সুতারাং বিজ্ঞাপন যদি ঠিকভাবে করা যায় তবে ক্রেতারা ঐ পণ্যের সম্পর্কে অভিহিত হইতে পারে এবং ঐ নূতন পণ্য ক্রয় করে। ইহাতে কারবার দৃঢ় পদক্ষেপে পরিচালিত হইতে পাবে।

৩। বিজ্ঞাপন দ্বারা কারবারের সুনাম বৃদ্ধি পায়। কারণ এই বিজ্ঞাপন হইতে ক্রেতারা পণ্য ক্রয় করিয়া উপকৃত হইলে ঐ পণ্য এবং কারবার সম্পর্কে তাহাদের একটি উচ্চ ধারণা সৃষ্টি হয়। এই ধারণাই কারবারের সুনাম। এই সুনাম কারবারের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

৪। বিজ্ঞাপন দ্বারা বেকারসমস্যা অনেকাংশে দূর হয়। কারণ এই বিজ্ঞাপণের দ্বারা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পায় আর অধিক লোক নিয়োগের দরকার হয়। সুতরাং এই লোক নিয়োগের মূল রহিয়াছে বিজ্ঞাপণ। সেজন্য বলা হয় বিজ্ঞাপণ দ্বারা বেকার সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

৫। বিজ্ঞাপনের দ্বারা পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কম হয় এবং মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞাপনের ফলে কারবার বৃহৎ হয় এবং এই বৃহৎ কারবার বৃহদায়তনের সকল প্রকার সুবিধা লাভ করে এবং এরই ফলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও ক্রেতাগণ লাভবান হয়।

৬। বিজ্ঞাপন দ্বারা পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্র কারবারও লাভবান হয়। কারণ অনেক সময় বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান সমস্ত পণ্য সময় মত প্রস্তুত করিতে পারে না। তখন ঐ পণ্যের কিছু উৎপাদন দায়িত্ব ছোট খাট প্রতিষ্ঠানের উপর চুক্তির মাধ্যমে অর্পণ করিতে পারে। ফলে পারিপাশ্বিক ছোট কারবারও লাভবান হয়।

৭। বিজ্ঞাপন শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিই সাধন করে না। পক্ষান্তরে উহার সহিত জড়িত সকলের উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। যেমন কোন কারবার বিজ্ঞাপনের দ্বারা বৃহৎ হইলে উহার আয় বৃদ্ধি পায় আর সাথে সাথে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন লোকেরও (যেমন, দালাল, পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী প্রভৃতি) আয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

৮। এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা বিভিন্ন সংবাদ সংস্থারও পত্র-পত্রিকারও আয় বৃদ্ধি পায়। কারণ ঐ বিজ্ঞাপনের জন্য তাহারা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায় করিয়া থাকে।

৯। যাহারা এই বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করেন তাহাদেরও একদিকে আয় বৃদ্ধি হয় ও অন্যদিকে কলানৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়।

১০। এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা পণ্যর চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং উহা দ্বারা জীবন-যাত্রার মান দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

১১। এই বিজ্ঞাপন হইতে যে কোন ক্রেতা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। কারণ সে সহজে বুঝিতে পারে যে, কি পণ্য ক্রয় কবিতে হইবে? কতটা ক্রয় করিলে অধিক লাভবান হইতে পারিবে, ঐ পণ্য কোথায় পাওয়া যাইবে? ঐ পণ্যর মূল্যই বা কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিজ্ঞাপন না থাকিলে ক্রেতাকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইত।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, এই বিজ্ঞাপনদ্বারা শুধু ক্রেতা-বিক্রেতাই উপকৃত হয় না। উহা দ্বারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকই উপকৃত হয় অর্থাৎ বিজ্ঞাপন সমাজকল্যাণ কর।

বিজ্ঞাপন ব্যয় কি অপ্রয়োজনীয় এবং অপচয়? (Is Expenditure on advertisement Unnecessary and Wasteful?):—

বিজ্ঞাপন কি ব্যবসায়ে অপ্রয়োজনীয়? অথবা বিজ্ঞাপনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহা একপ্রকার অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মতামত লইয়া অনেক মতবিরোধ আছে।

অনেকে মনে করেন বিজ্ঞাপন অপ্রয়োজনীয়। ইহার দ্বারা পণ্যর মূল্যই বৃদ্ধি পায়। ইহা ক্রেতাকে অনেক সময় খারাপ জিনিষ কিনিতে প্রলুব্ধ করে। ক্রেতার বিচার বুদ্ধিকে ইহা নষ্ট করিয়া দেয়। ইহা হইতে একচেটিয়া কারবারের পত্তন হয়। সুতরাং বিজ্ঞাপন ক্ষতিকর। ইহা সামাজিক ও ব্যক্তিগত উভয় দৃষ্টিকোণ হইতে বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে বিজ্ঞাপন বিভিন্নপ্রকার অসামাজিক ও ক্ষতিকর কাজ করিয়া থাকে। মিথ্যা ভাষণ দ্বারা ইহা সরল ক্রেতাগণকে প্রলুব্ধ করিয়া তোলে। সুচতুর ব্যবসায়ী তাহার খারাপ পণ্য এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা কৌশলে বাজারে বিক্রয় করিয়া শুধুমাত্র ক্রেতাকে প্রবঞ্চিত করে না উপরন্তু সমাজকেও বঞ্চিত করে। সুতরাং এই

বিজ্ঞাপন এখনই বন্ধ হওয়া উচিৎ। বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেক সময় ক্রেতা মনে করে ঐ স্নো, পাউডার না হইলে ফর্সা হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। ঐ মিলের জামা কাপড় না পরিলে 'স্মার্ট' হওয়া যায় না। এজন্য এই বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতাগণ বিশেষভাবে প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং ঐ প্রকার বিজ্ঞাপন সমাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষতিকারক এবং উহা বন্ধ হওয়াই দরকার।

প্রতিযোগিতার বাজারে বিজ্ঞাপন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কারণ এপ্রকার বাজারে বিজ্ঞাপনের কোন প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের অর্থ হইতেছে পণ্য মূল্যকে বৃদ্ধি করা। অপরপক্ষে যে বাজারে বিক্রেতার প্রাধান্য বেশী সে সকল বাজারে বিজ্ঞাপন দরকার হয় না। এই প্রকার বাজারে বিজ্ঞাপন অর্থহীন অর্থাৎ ইহার প্রয়োজন নাই কিন্তু যদি করা হয় তবে ইহার দ্বারা পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রেতাগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। সুতরাং বিজ্ঞাপন বর্তমান যুগের বাজারে অচল, অপ্রয়োজনীয় এবং একপ্রকার সামাজিক অপচয়। সেইজন্য ইহা এখনই বন্ধ হওয়া দরকার।

পক্ষান্তরে অনেক ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ আছেন যাহারা উপরোক্ত মতামত স্বীকার করেন না। তাহারা ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। ইহারা মনে করেন ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন অতি প্রয়োজনীয়। ইহা ছাড়া কোন ব্যবসা বিশেষ করিয়া নতুন ব্যবসা পরিচালনা সম্ভব নহে। বিজ্ঞাপনের যে খরচ হয় তাহা সমগ্র ব্যবসায়ের শতকরা একভাগও নহে। সেজন্য বিজ্ঞাপন খরচ লইয়া চীৎকারের কোন যুক্তি নাই। এইরূপ ব্যয়কে কোনপ্রকারে অপব্যয় বলা চলে না। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের সহিত নিবিড় বন্ধনে যুক্ত। এই বিজ্ঞাপণ না থাকিলে বিক্রয় হ্রাস পাইবে এবং বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। বিশেষ করিয়া বর্তমানে বিজ্ঞাপণ ব্যবসায়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা না থাকিলে দূরদেশের ক্রেতা অপর প্রান্তের পণ্যের খবর পাইবে না।

বিজ্ঞাপন দ্বারা পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি হয় না। উপরন্তু হ্রাস পায় কারণ এই বিজ্ঞাপণের ফলেই বৃহদায়তন শিল্পের সুযোগ সুবিধা ভোগ করা হয়। ইহার ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হয়। বিজ্ঞাপণ ক্রেতাকে প্রলুব্ধ করে ইহা সত্য নহে। কারণ জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রেতার চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। এই চাহিদার বৃদ্ধি ভুল বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিয়া হয় না। এই বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণই সাধিত হয়। সেজন্য বিজ্ঞাপন অনিষ্টকর বলিলে

ভুল হইবে। বাজারে পূর্ণ-প্রতিযোগিতা থাকিলেও এই বিজ্ঞাপন বর্তমান যুগে একান্ত প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন পদ্ধতি বা মাধ্যম (Methods or Media of Advertisement) :—

আধুনিক যুগে বিজ্ঞাপণ ব্যবসায়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বিজ্ঞাপন না থাকিলে বর্তমানে ব্যবসায়ের কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারিতাম না। এই বিজ্ঞাপন পুরাতন পণ্যের বাজার রক্ষা করে এবং অপরদিকে নতুন পণ্যর বাজারকে প্রসারিত করে। এই বিজ্ঞাপন না থাকিলে হয়তো ব্যবসায়ই বন্ধ হইতে বসিত। যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহা নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

১। **সংবাদপত্র :—**

কোন পণ্যর বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করা যায়। ইহা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ,প্রভৃতি হইতে পারে। জনগণ এই সংবাদপত্র নিয়মিত পড়ে এবং উহাতে বিজ্ঞাপণ থাকিলে সহজেই তাহা জনগণের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। ইহাতে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহাতে খরচ বেশী হয় কারণ প্রতিদিন কাগজে কোন বিজ্ঞাপন প্রচার সত্যই ব্যয়সাধ্য পদ্ধতি, নিত্যব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয় পণ্যর বিজ্ঞাপণ এই সংবাদপত্রের মাধ্যমেই দেওয়া হয়।

২। **সাময়িকী :—**

অনেক প্রকার পণ্যর ক্ষেত্রে এই সাময়িকী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবসর সময়ে জনগণ ইহা পাঠ করে বলিয়া বিজ্ঞাপনের প্রভাব কিছুটা স্থায়ী হয়। ইহাতে প্রতিদিন বিজ্ঞাপন দিতে হয় না। সাময়িক পত্র সংবাদ পত্র অপেক্ষা অনেক কম. খরচে বিজ্ঞাপন প্রচার করে। অনেক সময় পণ্যর গুনাগুণ ছাপিয়া এই সাময়িকীর মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করা যায়।

৩। **মুদ্রিত পুস্তিকা :—**

মুদ্রিত পুস্তিকার মাধ্যমেও বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে। উপরোক্ত দুইটি পদ্ধতি অপেক্ষা ইহা অনেক সুবিধাজনক। কারণ এই প্রকার পুস্তিকায় পণ্যর ছবি, গুনাগুণ, বর্ণনা প্রভৃতি ছাপিয়া জনগণকে জানানো যায়। ইহাতে পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা অধিক জ্ঞান লাভ করে এবং প্রয়োজনে তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় পণ্য

ক্রয় করে। অনেক সময় এই পুস্তিকা বিভিন্ন ক্রেতার ঠিকানায়ও প্রেরণ করা হয়। ইহাতে ক্রেতাগণ খুশীই হয়।

৪। **প্রাচীর পত্র :—**

রঙ্গীন ও আকর্ষণীয় প্রাচীর পত্রের মাধ্যমেও বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায়। ইহাতে পণ্যের গুণ, উৎকর্ষ, ব্যবহার, মূল্য, প্রাপ্তিস্থান, প্রভৃতি লিখিয়া ক্রেতাকে জানান হয়। এই প্রকার পত্র দেওয়াল, রেলষ্টেশন, বাস প্রভৃতির গায়ে লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহা অত্যন্ত কম খরচে করা যায়। কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না। কারণ লোকে ঐ প্রকার পত্র ছিড়িয়া ফেলিতে পারে। অনেক সময় এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রাচীর ফলক ব্যবহার করা হয়। জনগণের চলার পথে কোন বিশেষ স্থানে উঁচুতে একটি স্তম্ভে পণ্যের বর্ণনা, মূল্য প্রভৃতি দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহা হাজার হাজার জনগণের মনে রেখাপাত করে এবং দিনের পর দিন ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইহা ব্যয়সাধ্য পদ্ধতি।

৫। **পণ্য-সজ্জা :—**

ক্রেতাগণকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করিবার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় কোন্ কোন সময় পণ্যের সহিত উহার মূল্য লিখিয়া রাখা হয়। অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদর্শনীও দেখান হয়। ঘড়ি, সাইকেল, প্রভৃতির জন্য এই প্রকার প্রদর্শনী কক্ষ দেখা যায়।

৬। **বেতার ও টেলিভিশন :—**

পণ্য বিক্রয়ে উন্নত দেশগুলি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল কিন্তু ইহার প্রভাব সুদূর প্রসারী ও আন্তর্জাতিক। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকরী হয়। বর্তমানে কলিকাতা বেতারেও এই পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে।

৭। **ইস্তাহার :—**

ইহার মাধ্যমেও পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। অল্প ব্যয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ইহা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কিছু লোক নিয়োগ করিয়া সামান্য পারিশ্রমিক দিয়া তাহাদের দ্বারা এই প্রকার ইস্তাহার প্রস্তুত করাইয়া লওয়া যায়। বড় বড় শহরের রাস্তায় ঘাটে, সিনেমায়, হাটে-বাজারে এই প্রকার ইস্তাহারের মাধ্যমে পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারে পণ্যর বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় যেমন, জন-সংযোগস্থলে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে বিজ্ঞাপন, গ্রাহকের নিকট নমুনা প্রেরণ, সুন্দর ডাইরীর মাধ্যমে, চলচ্চিত্র প্রস্তুত করিয়া সিনেমা দ্বারা, প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও বর্তমানে বাণিজ্য-মেলার মাধ্যমেও পণ্যর বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায়। ইহা বর্তমানে খুব প্রচলিত।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন (Selection of Media for Advertisement) :—

বর্তমানে যে কোন পণ্যর বিক্রয় অনেকাংশে নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের উপর। বিভিন্ন প্রকার পণ্যর জন্য বিভিন্ন প্রকার মাধ্যম নির্বাচন করিতে হয়। এই মাধ্যম নির্বাচন করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে।

১। **দ্রব্যর প্রকৃতি** :—

মাধ্যম নির্বাচনে পণ্যর প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হইতে হইবে। এই পণ্যর প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। দুধ, বরফ মাছ প্রভৃতির প্রকৃতি একরকম। আবার লোহা, জামা কাপড় প্রভৃতির প্রকৃতি অন্যপ্রকার। সেজন্য বিভিন্ন দ্রব্যর প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া উহার বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করিতে হইবে। স্বল্পস্থায়ী পণ্যর জন্য পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতিই যথেষ্ট। অপর দিকে দীর্ঘস্থায়ী পণ্যর জন্য বিজ্ঞাপন হিসাবে মাসিক, দৈনিক প্রভৃতি পত্রই শ্রেয়।

২। **বাজারের পরিধি** :—

বাজারের পরিধির উপরও প্রচারের মাধ্যম নির্ভর করে। স্থানীয় চাহিদাসম্পন্ন পণ্যের জন্য যে প্রচার মাধ্যম দরকার হয় আন্তর্জাতিক বাজার সম্পন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে সেই মাধ্যম প্রয়োজন নাও হইতে পারে। যেমন, দুধ, শাক্ প্রভৃতির জন্য স্থানীয় পত্রিকাই যথেষ্ট। আবার সোনা, রূপা, প্রভৃতির জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন পত্র-পত্রিকার দরকার হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্থানীয় সংবাদপত্র যথেষ্ট নহে।

৩। **ক্রেতার প্রকৃতি** :—

ক্রেতার প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াও পণ্যর বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করা হয়। ক্রেতাদের সামর্থ ও বসতি বিচার করিয়া স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

৪। **ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস :—**

ক্রেতার রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত। উচ্চ শিক্ষিত লোকের নিকট হ্যাণ্ডবিল অপেক্ষা দৈনিক প্রচারপত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য বলা হয় ক্রেতার রুচি, ব্যবহার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করিতে হয়।

৫। **আবেদনের স্থায়িত্ব :—**

আবেদনের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করিয়াও বিজ্ঞাপন মাধ্যম নির্বাচন করা হয়। ক্রেতার উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে দৈনিক অপেক্ষা মাসিক পত্র পত্রিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অল্পস্থায়ী প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে হ্যাণ্ডবিলই যথেষ্ট। সুতরাং আবেদনের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করিয়া মাধ্যম নিবাচন করিতে হইবে।

(৬) **বিজ্ঞাপন ব্যয় :—**

বিজ্ঞাপন দাতাকে এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। বিজ্ঞাপন ব্যয় যদি অধিক হয় তবে ক্রেতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। চাহিদা হ্রাস পাইবে। সেজন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে মনে রাখিতে হইবে যে, অল্পব্যয়ে বিজ্ঞাপনই পণ্যর প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৭) **বিজ্ঞাপনের নীতি :—**

দুই প্রকার বিজ্ঞাপন হইতে পারে। যথা, কার্যকরী এবং সুদূর প্রসারী। প্রত্যক্ষ আবেদন দ্বারা পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকিলে উহাতে আতঙ্ক, ইঙ্গিত, কৌতুহল প্রভৃতি মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। অপরদিকে ভবিষ্যতে পণ্যর ক্রেতা সংগ্রহ উদ্দেশ্য হইলে বিজ্ঞাপনে জ্ঞানী, গুণী, প্রভৃতি লোকের সমর্থন পুষ্ট মতামত মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে সুদূর অথবা ভবিষ্যৎ চাহিদা সৃষ্টিতে সুবিধা হইবে।

(৮) **বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি :—**

ক্রেতাকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপিকে বিভিন্ন রংয়ে সজ্জিত করিয়া দেখান হয়। ইহা সংবাদপত্র অপেক্ষা পোষ্টারের মাধ্যমে প্রচার করাই বাঞ্ছনীয়। সেজন্য বলা হয় বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপিও বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

বিজ্ঞাপনের নীতি ও উহার সফলতা (Advertisement Policy and its Success) : –

প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাহার নূতন পণ্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে চাহে। পণ্যের মূল্য যদি বিজ্ঞাপনের জন্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ব্যবসায়ী আর

কারবারে টিকিয়া থাকিতে পারে না। কারণ লোকসান দেখা দেয়। সেইজন্য যে· পন্থা অবলম্বন করিলে অল্প খরচে পণ্য বাজারে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করা যায় তাহাকেই বিজ্ঞাপনের নীতি বলে। এই বিজ্ঞাপনের নীতি নির্ণয়ের সময় পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় প্রকার বাজারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই **নীতির। সফলতা** কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়েব উপব নির্ভর কবে। এই বিশেষ বিষয়গুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা কবা যাইতে পারে।

(১) **কৌতুহল :—**

যে কোন বিজ্ঞাপনেব সফলতা নিভর কবে ক্রেতাব মনের কৌতুহলের উপর। সেজন্য বিজ্ঞাপনেব ভাষা, ভাব, বং, চিত্র, প্রভৃতি যাহাতে ক্রেতাব মনে কৌতুহল সৃষ্টি কবিতে পাবে তাহাব উপব বিশেষ লক্ষ্য বাখিতে হইবে। এই কৌতুহল আবার নানা প্রকাবে সৃষ্টি হইতে পাবে। যেমন, পণ্যর বর্ণনা একেবাবে সবটা প্রকাশ না করিয়া ধীবে ধীবে কবা যাইতে পারে. কোন সংবাদ পত্রের একটি কলম খালি রাখিয়াও এই কৌতুহল সৃষ্টি কবা যায। সুতরাং বিজ্ঞাপন নীতিব সফলতা অনেকাংশে এই কৌতুহলেব উপব নির্ভব করে।

(২) **আবেদন :—**

ক্রেতাদেব নিকট কোন পন্য ক্রয়েব আবেদনও অনেক সময় কবা হয়। যেমন, চা, জুতা, প্রভৃতি। ইহাতে বিজ্ঞাপন অনেকটা সফলতা লাভ করিতে পারে।

(৩) **আতঙ্ক :—**

ক্রেতাদেব মনে অনেক সময় আতঙ্ক সৃষ্টি কবিয়াও পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি কবা হয়। ইহার উপরও বিজ্ঞাপনের সফলতা নির্ভর করে। বীমা, জীবাণুনাশক দ্রব্য, প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসবণ করা হয়। যেমন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা না করিয়া আজই জীবন-বীমা গ্রহণ করুণ। ইহাতে আপনার পরিবার আপনাব মৃত্যুর পর সুস্থভাবেই বাঁচিয়া থাকিতে পাবিবে, ইত্যাদি।

(৪) **ইঙ্গিত :—**

ক্রেতার অসুবিধাব কথা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইঙ্গিত করিয়াও পন্যর বিক্রয় বৃদ্ধি করা যাইতে পাবে। দেহেব ও মনের পুষ্টিসাধনেব ইঙ্গিত সাধবণত এইরূপ বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায়। যেমন, আপনাব চুলের প্রতি যত্নবান হউন। অন্যথায় অকালেই উহা হারাইবেন। এবং এই যত্ন লইতে হইলে, লক্ষ্মীবিলাস তৈল এখনই ব্যবহার করুণ, ইত্যাদি।

(৫) **সম্পাদকীয় সমর্থন :—**

ভবিষ্যৎ বাজার সৃষ্টিতে এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। কোন দৈনিক কাগজের সম্পাদককে অনুরোধ অথবা অর্থদ্বারা পণ্য সম্পর্কে কিছু মতামত সম্পাদকীয় স্তম্ভে তুলিয়া ধরার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সফল হয়।

(৬) **পরোক্ষ আবেদন :—**

এই পদ্ধতিব মাধ্যমেও পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। ক্যালেণ্ডাব, ডাইবী, পেন্সিল, প্যাড, প্রভৃতি এই পরোক্ষ আবেদনেব অন্যতম উপাদানসমূহ। এই সমস্ত দলিল হইতে ক্রেতাগণ পণ্য সম্পর্কে জানিতে পাবে এবং পরে ঐ পণ্য খবিদ করে।

(৭) **পরোক্ষ ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ :—**

অনেক সেবা প্রতিষ্ঠান অনেকসময় বিজ্ঞাপনের ব্যয় বহন করে এবং ইহা দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা কবে। এই প্রকার প্রতিষ্ঠান উহাদের নাম-ব্যয় বহনকাবী হিসাবে এক কোণে মুদ্রিত কবিয়া রাখে।

(৮) **শিক্ষামূলক বিজ্ঞাপন :—**

এই প্রকাব বিজ্ঞাপনে পণ্যেব উপকাবিতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়। ইহাতে ক্রেতাগণ ঐ পণ্য সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞান লাভ কবিতে পারে এবং ঐ পণ্য ক্রয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ কবে। যেমন, পুরাতন অ্যামব্যাসাডাব গাড়ী অপেক্ষা নূতন অ্যামব্যাসাডার গাড়ীর কি কি বিশেষ উপকারিতা আছে, তাহা ব্যাখ্যা করা হয়। ইহাতে ক্রেতাগণ নূতন মডেল ক্রয় করিতে উৎসাহিত হয়।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন এবং উহার সফলতা (Meaning and Success of Scientific Advertisement) :—

ক্রেতার রুচি, অভ্যাস, পছন্দ, মনস্তত্ত্ব, চাহিদা প্রভৃতি বিষয় বিচাব করিয়া কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহাকে **বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন বলে**। এইরূপ বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য থাকে কম ব্যয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদান এবং ক্রেতাদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান কবা। এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক স্তরে একটু খরচ বেশী হয় সত্য কিন্তু পরবর্তী স্তরে ঐ খরচ অনেকাংশে হ্রাস পায় এবং ক্রেতাগণ উপকৃত হয়। অতি সচেতনার সহিত এই প্রকাব বিজ্ঞাপনে ভাষা, ভাব ও বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। কোথাও কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি থাকিলে তাহা এই পদ্ধতিতে সহজেই পরিবর্তন করা যায়।

যে সকল বিষয়ের উপর এই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনেব সফলতা নির্ভর করে তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় : —

(১) **অনুসরণ পদ্ধতি :—**

ইহার উপর বিজ্ঞাপনের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। বিজ্ঞাপন দেখিয়া ক্রেতা প্রলুব্ধ হইয়া প্রয়োজনীয় পণ্যটি সহজেই ক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা ঐ বিজ্ঞাপন হইতে পণ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। বিজ্ঞাপনকে এই প্রকার বিজ্ঞানভিত্তিক করার সকল প্রকার চেষ্টাকে "অনুসরণ পদ্ধতি" বলে। এইরূপ কোন ক্রেতার পিছনে বিক্রেতা যদি বিজ্ঞাপনদ্বারা নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়া থাকে, তাহাতে ক্রেতা পণ্যর জন্য অর্ডার প্রদান করে। ফলে বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। আর এই বিক্রয় বৃদ্ধিই হইতেছে অনুসরণ পদ্ধতির সার্থকতা।

(২) **সূত্রসন্ধানী পদ্ধতি :—**

বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন বাস্তবে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা যায়। কোন একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন পদ্ধতি সকলপ্রকার কারবারের পক্ষে সুবিধাজনক নাও হইতে পারে। কারণ, উহা ব্যয়বহুল। যে পদ্ধতির দ্বারা বিজ্ঞাপনের এই সহজ, সরল পদ্ধতি নির্ণয় করা হয় তাহাকে সূত্র সন্ধানী পদ্ধতি বলে। এই জন্য সাধরণত নিম্নলিখিত একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে :—

(ক) **বিভিন্ন মাধ্যমের বিজ্ঞাপন :—**

বিজ্ঞাপনের উত্তরে যে-সকল অর্ডার পত্র পাওয়া যায় তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কোন্ মাধ্যমে সর্বাধিক উত্তর পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম জানিতে পারা যায় এবং ভবিষ্যতে একমাত্র ঐ মাধ্যমেই বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে।

(খ) **অনুসন্ধান পত্রের মাধ্যম :—**

এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে ঠিকানা হইতে অধিক উত্তর পাওয়া যায় বুঝিতে হইবে সেই মাধ্যম অধিক গুরুত্বপূর্ণ অথবা কার্যকারী।

(গ) **বিজ্ঞাপনের সহিত 'কুপন', বা ছক পদ্ধতি :—**

বিজ্ঞাপনের অর্ডার দাতাকে তাহার অর্ডারের সহিত কুপন বা ছক বা অর্ডার ফরম পাঠাইতে অনুরোধ জানাইয়াও কোন্ বিজ্ঞাপন পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ তাহা বুঝিতে পারা যায়।

(৩) **বাজার গবেষণা :—**

প্রাচীনকালের বিজ্ঞাপন পদ্ধতি এখন অচল। কারণ, তখন ক্রেতার রুচির প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হইত না। তাহারা শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া

বসিয়া থাকিত। ফলে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইত। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাবের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। যেমন :—

(ক) **ক্রেতার প্রতি লক্ষ্য :—**

এই পদ্ধতিতে ক্রেতার রুচি, চাহিদা, পণ্যের মূল্য প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। অনেক সময় ক্রেতার চাহিদার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যেমন, কোন মার্কার পণ্য, কি মূল্যের পণ্য, কি প্রকৃতির পণ্য, প্রভৃতি তাহারা পছন্দ করে। এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞাপন প্রদান করা হইয়া থাকে। এই কাজে বুদ্ধিমান, আলাপী, মিষ্টভাষী কর্মচারীর প্রয়োজন হয়।

(খ) **ব্যবসা-সংক্রান্ত গবেষণা :—**

ক্রেতার মতামত জানাই সবকিছু নহে। সেইমত পণ্য উৎপাদন করিতে হয়। অন্যথায় কোন লাভ হয় না। ব্যবসা টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করিতে হইবে এবং মধ্য ব্যবসায়ী নিয়োগ করিতে হইবে। কি প্রকারে পণ্য উৎপাদন করিলে কম মূল্যে সরবরাহ করা যাইবে, ক্রেতাগণ উপকৃত হইবে, ধারে ও নগদে ক্রয় করিতে পারিবে প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। পণ্যের কাঁচামাল ক্রয়ের জন্যও যথেষ্ট যত্নবান হইতে হইবে।

(গ) **বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থিরিকরণ :—**

বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মধ্যে কোন্‌টি গৃহীত হইবে তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। কারণ, উপযুক্ত বিজ্ঞাপন মাধ্যম ঠিক করিতে না পারিলে ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ সম্ভব নহে। মাধ্যম হিসাবে যদি সংবাদপত্র ঠিক হয় তবে ইহার পরে স্থির করিতে হইবে কোন্ সংবাদপত্র এ ব্যাপারে ব্যবহার করিতে হইবে? যেমন, আনন্দবাজার না বসুমতী? ইত্যাদি। যাহার পাঠক সংখ্যা বেশী সেই সংবাদপত্রই বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিলে উহা হইতে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। প্রাথমিক ব্যয় এই পদ্ধতিতে একটু বেশী হইলেও পরবর্তীকালে উহা অনেক হ্রাস পায়। এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা লাভবান হয়। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে।

বিজ্ঞাপন প্রতিলিপি ও উহার সফলতার বিষয়সমূহ (Copy of an advertisement and the factors on which its success depends) :—

বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি বলিতে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুগুলিকে বোঝায়। ক্রেতার

নিকট পণ্যর খবর পরিবহনই এই প্রতিলিপির মূল উদ্দেশ্য। যে যে বিষয়ের উপর এই প্রতিলিপির সফলতা নির্ভর করে তাহা নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

(১) ক্রেতাব দৃষ্টি আকর্ষণই এই প্রতিলিপির মূল বিষয়। সেজন্য এই প্রতিলিপিকে অধিক আকর্ষণীয় কবিতে হইলে উহার শিরোনাম, রং, শব্দ, প্রভৃতি এরূপভাবে নির্বাচন করিতে হয় যাহাতে উহা সহজেই ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এইজন্য বড় অক্ষর, ব্যঙ্গচিত্র, সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা, প্রভৃতি বিশেষ সহায়তা করে।

(২) শিক্ষামূলক ও অর্থপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রতিলিপির সফলতা নির্ধারণ করে। প্রতিলিপির ভাষা সহজ ও সবল হওয়া দরকার। ইহাতে সকল প্রকার ক্রেতাই উহার অর্থ সহজে বুঝিতে পারিবে। সহজ, সরল ভাষা ও পণ্যর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও বিজ্ঞাপনকে শিক্ষামূলক করিয়া তোলে।

(৩) ক্রেতার মনে বিশ্বাস ও স্থায়ী ধারণা এই প্রতিলিপিদ্বারা সৃষ্টি করিতে হয়। ইহাতে প্রতিলিপিব গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সে জন্য প্রতিলিপি এমন ভাষায় ও পদ্ধতিতে তৈয়ার করিতে হইবে যাহাতে ক্রেতাব মনে পণ্য সম্বন্ধে স্থায়ী বিশ্বাস সৃষ্টি হইতে পারে। কোন ব্যাপারকে অতি বঞ্জিত না করিয়া সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিলে উহাতে ক্রেতাব বিশ্বাস আবও দৃঢ় হয়।

(৪) প্রতিলিপি চিত্তাকর্ষক হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে ক্রেতা বেশী উৎসাহ বোধ করিবে। এবং উৎসাহবোধ হইতে ক্রেতাব ঐ পণ্যটি-পাইবার আকাঙ্খা জাগিবে আর এরই ফলে সে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত হইবে।

(৫) সজনশীলতার উপরও প্রতিলিপিব সাফল্য নির্ভর করে। পণ্যর অধিক বিক্রয় ছাড়াও সৃজনধর্মী বিজ্ঞাপনের উপরও প্রতিলিপির সাফল্য নির্ভর করে। ইহা পাঠকের মনে সৃজনধর্মী খোরাক যোগায় এবং বিশেষভাবে রেখাপাত করে। ইহার ফলে ঐ বিজ্ঞাপনের উপযোগিতা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে।

(৬) ক্রেতার ভাব-প্রবণতা ও প্রবৃত্তির উপরও বিজ্ঞাপনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভব করে। বিজ্ঞাপনেব মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন, আশা আকাজ্ক্ষা প্রভৃতি তুলিয়া ধরিয়া পণ্যর বিক্রয় বৃদ্ধি করা যায়। যেমন খারাপ তৈল ব্যবহার করিয়া অচিরেই আপনার অমূল্য চক্ষু দুটি নষ্ট করিবেন না। বাজারে একমাত্র খাটি তৈল বলিতে "সরিষাই" রহিয়াছে। আপনি যতটা খুশী স্থানীয় দোকান হইতে সংগ্রহ করুণ। ইহাতে আপনার কোন ক্ষতি হইবে না ইত্যাদি। অনেক সময় ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াও পণ্যর ক্রেতা সংগ্রহ করা হয়।

(৭) সবশেষে বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপির খরচের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। এই খরচ যতটা কম হয় সে জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ কমব্যয়ে পণ্যর প্রচারই বিজ্ঞাপনের মূলকথা। এবং এরই সাথে সাথে ক্রেতার আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সুতরাং উপরোক্ত প্রতিলিপির ধারণার উপব ভিত্তি করিয়া কোন প্রতিলিপি বচনায় অগ্রসব হওয়ার উচিত। ইহা না হইলে প্রতিলিপি রচনাব উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আমরা যদি উপরোক্ত বিষয়গুলি মনে রাখিয়া কোন প্রতিলিপি বচনায় অগ্রসর হই তাহা হইলে তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিবে।

(ক) সহজ, সবল ও সুন্দর ভাষা হইতে হইবে।

(খ) উহার আকৃতি সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাবণ, সুন্দব প্রতিলিপি সহজেই ক্রেতার মনে বেখাপাত কবিতে পারে।

(গ) ইহা উন্নত রুচিবোধ সম্পন্ন হওয়া দরকাব।

(ঘ) উপযুক্ত মাধ্যমে উহা প্রকাশিত হওয়া দরকার।

(ঙ) চাহিদা ও আবেদনেব প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(চ) বিজ্ঞাপন ব্যয়েব প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হইবে। কাবণ ইহা বেশী হইলে বিজ্ঞাপনেব মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। এবং

(ছ) প্রতিলিপি প্রকাশেব প্রকৃষ্ট সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, সময় অনুযায়ী বিজ্ঞাপন দিলে উহা সহজে সফলতা লাভ করিতে পারে।

বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা (Layout of an Advertisement) :—

বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপির বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন—বিষয় বস্তু, ট্রেডমার্ক, অক্ষব, চিত্র, তাহার আকৃতি প্রভৃতি ঠিকভাবে সাজানোব পদ্ধতিকে **বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা বলে**। বিজ্ঞাপনেব সাফল্য অনেকাংশে উহার অঙ্গসজ্জার উপর নির্ভর করে। অবশ্য এ কথা লিখিত বিজ্ঞাপনেব ক্ষেত্রে একমাত্র প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা যদি রেডিও মারফৎ বিজ্ঞাপনের কথা চিন্তা কবি তবে আব অঙ্গসজ্জার প্রশ্ন থাকে না। সেখানে বাক্য বিন্যাসই যথেষ্ট। যখন কোন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হয় তখনই এই অঙ্গসজ্জার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কোন পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়াব সময় অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে **নিম্নলিখিত বিষয়গুলি** বিবেচনা করিতে হয়। যেমন :—

(ক) **আয়তন :** বিজ্ঞাপনের আয়তন ছোট ও বড় উভয় প্রকার হইতে পারে। আয়তন বড হইলে বড় অক্ষরে পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধাবণা ক্রেতাগণকে সহজে বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু ইহা হইতে এই চিন্তা করিলে ভুল হইবে যে যত বড়

আয়তন হইবে ততই বিজ্ঞাপন সাফল্যলাভ করিবে। খুব বেশী আয়তন হইলে অনেক বেশী কথা পণ্য সম্বন্ধে লিখিতে হয়। অনেক সময় ক্রেতাগণ উহা আর মনোযোগ সহকারে পড়ে না। সুতরাং এ বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। সে জন্য কম খরচে অল্প আয়তনে পণ্যের বিষয় বস্তু লেখাই উচিৎ।

(খ) **আকার** :—বিজ্ঞাপনের আকার গোলাকার, ত্রিকোন, বর্গাকার, প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির হইতে পারে। ইহার মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় সে সম্পর্কে কোন বিজ্ঞাপন পারদর্শীর মতামত গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

(গ) **শিরোনামা** :—শিরোনামা দিয়া অনেক সময় ক্রেতাগণকে আকৃষ্ট করা যায়। কিন্তু এই শিরোনামার অক্ষরের গভীরতা যেন আকার ও বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের জন্য একই শিরোনামা ব্যবহার না করিয়া পৃথক পৃথক শিরোনামা ব্যবহার করা উচিৎ। কারণ, ইহাতে পাঠকগণ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়।

(ঘ) **বিষয় বস্তু** :—বিজ্ঞাপনের বিষয় বস্তুর গভীরতার উপর উহার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহা পাঠকের মনে রেখাপাত করে। সুতরাং কি প্রকারে বিষয়বস্তুকে আরও অধিক প্রকারে পরিস্ফুট করিয়া তোলা যায় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) **উদাহরণ** :—বিভিন্ন প্রকার ছবি, ফটো, চিহ্ন, প্রভৃতির সাহায্যে পণ্যের প্রতি ক্রেতার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা যায়। সে জন্য এই উদাহরণ দেওয়ার সময় বিশেষ মনোযোগ সহকারে করিতে হইবে এবং একথাও মনে রাখিতে হইবে যে এই উদাহরণ দেওয়ার সময় যেন কোন কু-রুচির পরিচয় প্রকাশ না পায়। ইহা হইলে ক্রেতাদের পণ্য সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা জন্মিবে এবং ব্যবসায়ের সফলতা নষ্ট হইবে।

(চ) **পশ্চাৎপট** :—ইহা বিজ্ঞাপনের একটি আকর্ষনীয় অংশ। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার রংয়ের সমন্বয়ে এই পশ্চাৎপট করা হয়। তবে যে রংই ব্যবহৃত হোক না কেন উহা যেন অক্ষর ও রংয়ের ভিতরে সামঞ্জস্য রাখিতে পারে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সুতরাং উপসংহারে আমরা বলিতে পারি বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জার ব্যাপারে উপরোক্ত বিষয় সমূহ বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে। অন্যথায় বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ হইবে।

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব ও ইহাদের ভূমিকা (Meaning and Role of Advertising Agency) :—

কোন লোকের বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইয়া বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া কাজ করাকে **বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব বলে**। প্রাচীন কালে এরূপ প্রতিনিধিত্ব ছিল না বলিলেই হয়। সুতরাং ইহাদের উৎপত্তি বর্তমান কালে। ইহারা মধ্যস্থ কারবারী হিসাবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইয়া ইহারা বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম করিয়া থাকে। প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করে এবং ইহার পরিবর্তে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে।

বর্তমান যুগে ইহাদের ভূমিকা অপরিসীম। সংক্ষেপে ইহাদের **ভূমিকা** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(১) বর্তমানে পণ্যের বাজার ব্যাপক। রুচি ও চাহিদাও বৈচিত্রপূর্ণ। প্রতি-পদক্ষেপে প্রতিযোগিতা। সে জন্য প্রাচীন পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনই যথেষ্ট নহে। অধিক উন্নত ধরনের বিজ্ঞাপন একান্ত দরকার। অন্যথায় পণ্যের বাজার পাওয়া যায় না; আর এই উন্নত ধরণের বিজ্ঞাপন দিতে হইলে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক দরকার। সেইকাজ আজ এই প্রতিনিধিরাই সম্পাদন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের গুরুত্ব বর্তমান যুগে অপরিসীম।

(২) অনেক ক্ষেত্রে ইহারা বিজ্ঞাপন দাতার নিকট হইতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না। কেবলমাত্র বিজ্ঞাপন গ্রহীতার নিকট হইতে ১০% হইতে ১৫% ভাগ দস্তুরি লইয়া থাকে। ইহাতে বিজ্ঞাপনদাতার কোন অসুবিধা হয় না।

(৩) এরূপ অভিজ্ঞ লোকের মধ্যে অনেকে শিল্পীও সাহিত্যিক থাকেন। তাহাদের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞাপনের অঙ্গসজ্জা সুন্দর হয়। ইহাতে অধিক পরিমাণ ক্রেতা আকৃষ্ট হয় এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

(৪) ইহারা বিজ্ঞাপন গ্রহীতার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে। ইহাতে অনেক সময় তাহাদের নিকট হইতে বিজ্ঞাপনীয় স্থান ভাড়া লইয়া বিজ্ঞাপনদাতাকে সাহায্য করিতে পারে। বিশেষ করিয়া কোন উৎসবের সময় এই প্রকার কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৫) ইহারা শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন প্রদান ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না। ঐ ব্যাপারে গবেষণা করিয়া বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতাকে সাহায্য করিয়া থাকে।

(৬) ইহারা বিজ্ঞাপনে অভিজ্ঞ হওয়া সহজেই বিজ্ঞাপন অভিযান পরিচালিত করিতে পারেন। উপযুক্ত মাধ্যম নিবাচন, অঙ্গসজ্জা, কতদিন বিজ্ঞাপন থাকিবে, প্রভৃতিও তাহারা নির্ধারণ করিয়া ব্যবসায়ীকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

(৭) প্রতিষ্ঠানের মালিক তাহার পণ্যর জন্য পৃথক বিভাগ খুলিয়া অভিজ্ঞ বিজ্ঞাপন ম্যানেজার নিয়োগ করিতে পারে। ইহা অতি ব্যয় বহুল পদ্ধতি। পক্ষান্তরে প্রতিনিধি থাকিলে এই ব্যয় আর বহন করিতে হয় না এবং কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা যায়।

ইহাদের উপরোক্ত সুবিধা বা সেবার জন্য ইহারা ব্যবসাক্ষেত্রে যথেষ্ঠ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। আর ইহার জন্যই ভারতবর্ষে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন, আলফা বিজ্ঞাপন সংস্থা, দি প্রেস সিণ্ডিকেট লিঃ, প্রভৃতি।

প্রতিযোগিতা মূলক কোন পণ্যর বাজার সৃষ্টির জন্য একটি বিজ্ঞাপন কর্মসূচীর পরিকল্পনা (An Advertisement Programme for a Competitive Product) :—

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের সম্যক বিবরণকে বিজ্ঞাপনের কর্মসূচী বলে। বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি, অঙ্গসজ্জা, অভিযান প্রভৃতি এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ একটি বিজ্ঞাপন কর্মসূচী পরিকল্পনার সময় **নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ** লক্ষ রাখিতে হইবে।

(ক) **প্রতিলিপি রচনা** :—এই প্রতিলিপি রচনার সময় কৌতুহল সৃষ্টি হইতে পারে, আতঙ্ক সৃষ্টি হইতে পারে; অনুরোধ বা আবেদনও সৃষ্টি হইতে পারে। এই সকল পদ্ধতি পণ্যর আশু-চাহিদা বৃদ্ধির জন্য অনুমিত হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে উহার চাহিদা বৃদ্ধি করিতে সৃজনশীল লেখা, মতামত, ক্যালেণ্ডার, ডায়েরী, প্রভৃতির সাহায্য লওয়া হয়। ঔষধ, খাদ্য, প্রভৃতি ব্যাপারে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া উহার প্রতিলিপি রচনা করা যাইতে পারে। ইহাতে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(খ) **মাধ্যমনির্বাচন** :—পণ্যর প্রকৃতি, বাজার, চাহিদা, ক্রেতার রুচি, স্বভাব প্রভৃতি বিচার করিয়া এই মাধ্যম নির্বাচন করিতে হয়। প্রয়োজনীয় পণ্যর জন্য মাধ্যম হিসাবে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র, রেডিও, প্রভৃতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কারণ, ক্রেতাগণ উহা হইতে পণ্যর সম্যক পরিচয় পাইয়া থাকে।

(গ) **অঙ্গসজ্জা** :—মাধ্যম নির্বাচনের পরেই দেখা দেয় অঙ্গসজ্জার প্রশ্ন। অঙ্গসজ্জার উপর বিজ্ঞাপনের সাফল্য অনেকাংশে নিভর করে। এজন্য বিজ্ঞাপনের আয়তন, আকার, শিরোনামা, চিত্র, স্থান নির্বাচন, প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হইবে।

(ঘ) **বিজ্ঞাপন অভিযান** :—

কোথায় এবং কিভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইবে তাহা স্থির করাই বিজ্ঞাপন অভিযানের মূল কথা। এই অভিযান তিন প্রকার হইতে পারে যেমন; আঞ্চলিক,

শ্রেণীবদ্ধ ও জাতীয়। আঞ্চলিক পদ্ধতিতে সমগ্র বাজারকে কয়েকটী অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বিজ্ঞাপন অভিযান চালান হয়। শ্রেণীবদ্ধ অভিযানে সমস্ত ক্রেতাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয় এবং ক্রমান্বয়ে তাহাদের মধ্যে অভিযান পরিচালনা করা হয়। আর জাতীয় অভিযানে সমস্ত বাজারে এক সাথে বিজ্ঞাপন পরিচালিত হয়। যেমন, ঔষধের বিজ্ঞাপন অধিকাংশই জাতীয় অভিযানেব অন্তর্গত।

সুতরাং কোন প্রতিযোগিতামূলক পণ্যর বাজার সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞাপন কর্মসূচীব পরিকল্পনা রুপায়নের সময় উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি যথেষ্ঠ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উত্তরপ্রদেশে একজন নূতন বিস্কুট ব্যবসায়ী যে উপায়ে উহার বিস্কুটের বিজ্ঞাপন দিতে পারেন তাহার বর্ণনা দাও। (Describe the methods which may be adopted by manufacturer of a new brand of biscuit in U.'P) :—

এই পণ্যর প্রকৃতি বিচার করিয়া বলা যায় যে উহা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। প্রতিদিন উহা প্রতিঘরে দরকাব হয়। ইহাব বাজাব বিস্তৃত। মূল্য কম হইলে অতি গরীব লোকও উহা ভোগ করিতে পাবে। ব্যবসায়ী যখন সমগ্র উত্তর প্রদেশে বিজ্ঞাপন দিতে বাজী তখন বুঝিতে হইবে তাঁহার যথেষ্ট মূলধন আছে। সেই জন্য বলা যায় উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে **নিম্নোক্ত** বিজ্ঞাপনের মাধ্যম উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ক) **সংবাদ পত্র** :—সংবাদ পত্রেব প্রচারের সাথে সাথে বিস্কুটেবও প্রচাব ঘটিবে। শুধুমাত্র একবার বা দুইবাব বিজ্ঞাপন যথেষ্ঠ নহে। সেজন্য দীর্ঘদিন ঐ বিজ্ঞাপন সংবাদ পত্রে দিতে হইবে। আর সম্ভব হইলে সাময়িক পত্র পত্রিকায় উহা দিতে পারিলে আরও ভাল ফল পাওয়া যাইবে।

(খ) **নমুনা** :—অধিক পরিমাণ ক্রেতা আকৃষ্ট কবিতে নমুনাব যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। দোকানদার মাধ্যমে যদি বিনামূল্যে এই বিস্কুট কিছু ক্রেতাদেব মধ্যে বিলি করা যায় তবে আরও ভাল ফল পাওয়া যাইবে। কারণ, ক্রেতারা ইহার গুণগত উৎকর্ষে আকৃষ্ট হইয়া উঠিবে এবং এই নূতন বিস্কুট ক্রয় করিবে।

(গ) **সিনেমা** :—উত্তর প্রদেশের সিনেমা হলগুলিতে স্লাইড দিয়া এই বিস্কুটের বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। ইহাতে প্রচার বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রেতারা উহা ক্রয় করিবে।

(ঘ) **মেলা ও প্রদর্শনী :—**

মেলা ও প্রদর্শনীতে বহু লোকের সমাগম হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এই বিস্কুট কিছুটা বিনামূল্যে প্রদান করিলে জনগণ উহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিবে এবং উহা আরও অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে উৎসাহ বোধ করিবে।

(ঙ) **প্রাচীর পত্র :—**

পৃথক পৃথক মোটা কাগজে কোম্পানীর নাম ও বিস্কুটের নাম ছবি সহ দোকানে দোকানে ঝুলাইয়া রাখিয়াও ইহার চাহিদা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহাতে ক্রেতাগণ ঐ বিস্কুট সম্পর্কে ভাল জ্ঞান লাভ করিবে এবং ক্রমে ক্রমে উহা খরিদ করিবে। ইহাতে বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং কোন নূতন বিস্কুট বিক্রয়ের জন্য উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনের নমুনা

(A copy of advertisement for the sale of National Defence Certificate) :—

নিজের দেশকে রক্ষার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করুণ। স্বাধীনতা আপনার অমূল্য সম্পদ। ইহাকে রক্ষা করুণ। ইহা রক্ষার একমাত্র উত্তম পথ **জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট ক্রয়।**

আপনার নিকটতম পোষ্ট-অফিসে পাওয়া যায়। আর দেরী না করিয়া আজই ক্রয় করুণ। ইহা হইতে প্রাপ্ত সুদের উপর আয়কর দিতে হয় না। ইহা ক্রয়ের দ্বারা মাতৃভূমিকে রক্ষার শপথ নিন এবং শত্রুমুক্ত দেশে স্বাধীনতা ভোগ করুণ।

ভারতীয় হস্তশিল্পজাত পণ্যর বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপন (An advertisement for increasing the sale of Indian Handicrafts) :—

জানেন কি আপনি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সকলপ্রকার **ভারতীয় হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদিকে ?**

ইহা আধুনিক শিল্পমনের খোরাক যোগায়। নক্সা ও আধুনিকতাই ইহার বৈশিষ্ট। বিদেশেও ইহা বিশেষ সমাদৃত। আপনার রুচিমত সকলপ্রকার পণ্য কম মূল্যে আপনি আপনার স্থানীয় দোকানেই পাবেন। আজই আপনার প্রয়োজনীয় পণ্য খরিদ করুণ।

হস্তশিল্প বোর্ড

(কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, এলাহবাদ।)

একখানা শিশুখাদ্যর বিজ্ঞাপন (An advertisement for the selling of a baby food)

সুস্থ ও সবল সকল শিশুই গৃহের **আনন্দ ও সম্পদ**। এই সুস্থতা রক্ষার জন্য আজই আপনার শিশুকে **'বিনাটোন'** খাওয়ান

কারণ

যে সকল গুণে ইহা আদরনীয় ও জনপ্রিয় তাহা হইতেছে :—

(ক) ইহাতে প্রথম শ্রেণীর ভিটামিন আছে।

(খ) অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা মূল্য খুব কম।

(গ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহা প্রস্তুত।

(ঘ) শিশুরা অতি আনন্দসহকারে পান করে।

প্রতিদিন সকালে আপনার শিশুকে ইহা দিতে ভুলিলে চলিবে না।

হ্যাপি ফুড প্রোডাক্টস্

বোম্বাই-২

কোন সেভিংস ব্যাঙ্ক জনপ্রিয় করার জন্য একটি বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি (Advertisement copy for a Bank to popularise its Savings Bank Account) :—

প্রশ্ন :— এই যে দত্ত মশাই, শুনলুম, আপনি নাকি আপনার বড় ছেলে দীপককে জাপান পাঠাচ্ছেন ?

উত্তর : ঠিকই শুনেছেন বোসবাবু। অবশ্য, আমার মত সামান্য চাকুরী জীবিব পক্ষে এতগুলি টাকা একসাথে বার করা অসম্ভবই হত।

প্রশ্ন :— তাহলে আপনি এত টাকা কোথায় পেলেন ?

উত্তর :—টাকা অবশ্য কোথাও পাইনি। আমারই। তবে জানেন কি, আমি ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজাবের পরামর্শমত ৫ টাকা দিয়ে ওঁদেব ব্যাঙ্কে একটা একাউন্ট কবেছিলাম। সে অনেক দিনেব কথা। তারপর থেকে নিয়মিত জমিয়ে আজ এই টাকা পেয়েছি। বিস্তারিত বিবরণে উৎসাহ থাকিলে আজই আপনিও একটা একাউন্ট খুলুন ; এবং ম্যানেজাবের সহিত যোগাযোগ করুণ।

বিনীত

এ. মুখার্জী

(ম্যানেজার, ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক, দিল্লী)

বিক্রয়কলার অর্থ ও উহার মৌলিক বিষয়সমূহ (Meaning and Fundamentals of Salesmanship) :—

কোন পণ্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় করার ক্ষমতাকে বিক্রয়কলা বা বিক্রয় বিদ্যা বলে। কিন্তু অধিক পরিমাণ পণ্য বিক্রয় কবার ক্ষমতাকেই প্রকৃত বিক্রয় বিদ্যা বলা যায় না। ঐ পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাগণের মনে কৌতুহল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে অধিক পরিমাণ আকৃষ্ট করিয়া ঐ পণ্য বিক্রয়কে প্রকৃত অর্থে বিক্রয়কলা বা বিক্রয়বিদ্যা বলে।

ক্রেতাকে বিক্রেতা দুইভাবে পণ্য ক্রয় করিতে আকৃষ্ট করিতে পারে। কাগজে অর্থাৎ পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনদ্বারা এবং প্রতিনিধি নিয়োগ দ্বারা। প্রতিনিধি নিয়োগ দ্বারা বিক্রয়কার্য পরিচালনা অধিক খরচবহুল পদ্ধতি। সেজন্য বড় বড় প্রতিষ্ঠান ভিন্ন এই পদ্ধতি অন্যকেহ সহজেই গ্রহণ করিতে রাজী হয় না। যদিও প্রতিনিধি নিয়োগ পদ্ধতি ব্যয়বহুল তথাপি ইহা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ক্রেতাগণ পত্র-পত্রিকা পাঠ

করিয়া পণ্য সম্পর্কে যতটা আকৃষ্ট হয় তাহা অপেক্ষা প্রতিনিধি হইতে আরও অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সেজন্য বর্তমানে এই প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া পণ্য বিক্রয় পদ্ধতি অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে।

যেসকল কার্যদ্বারা বিক্রেতা ক্রেতাকে অধিক পরিমাণ আকৃষ্ট করিতে পারে এবং ঐ পণ্য ক্রেতাকে বিক্রেতা তাহার স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করিতে পারে তাহাকেই বিক্রয় বিদ্যার মৌলিক বিষয় বা কলাকৌশল বলা হয়। এই বিষয় বা কৌশলকে অধিক পরিমাণে কার্যকরী করিতে হইলে বিক্রেতা বা বিক্রেতার প্রতিনিধিকে কতকগুলি নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। এই নিয়ম মানিয়া চলিলে সহজেই বিক্রয় বাজারে সফলতা অর্জন করা যায়। আমরা সংক্ষেপে ঐ নীতি বা কৌশলসমূহ নিম্নরূপে আলোচনা করিতে পারি :—

(১) **বিক্রয় রীতি :—**

কোন পণ্যর বিক্রয়কার্য পরিচালনা করিতে হইলে বিক্রেতাকে অতীতের অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হয়। ভবিষ্যতের দিকেও তাহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্পণ করিতে হয়। অন্যথায় ভবিষ্যত ও অতীতকে বাদ দিয়া কোন বিক্রয়রীতি কার্যকরী করা যায় না। প্রয়োজনবোধে এই নীতি পরিবর্তনের সুযোগও রাখিতে হইবে। এই নীতি বিশেষ মূলতত্ত্ব ও কলাকৌশলের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠা উচিত।

(২) **বিক্রয়কার্যক্রম ও পদ্ধতি :—**

বৈজ্ঞানিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া এই কার্যক্রম ঠিক করা উচিৎ। এই পদ্ধতিকে অধিক পরিমাণ কার্যকরী করিতে হইলে সমস্ত ক্রেতাকে ভৌগলিক নিয়ম অনুযায়ী বিভক্ত করিতে হয়। ইহাতে বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। কারণ, এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ক্রেতার উপর মনোযোগ দেওয়া যায়। ক্রেতার রুচি, আয়, ব্যবহার, সুবিধা, অসুবিধা, বাজারের অবস্থা, পণ্যর প্রকৃতি, উৎপাদন ক্ষমতা, পরিবহন পদ্ধতি, প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এই পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হয়। সুতরাং উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী বিক্রয়কার্য পরিচালিত না হইলে বিক্রয় বাজারে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হয় না।

(৩) **বিক্রয় সংগঠন :—**

বিক্রয়রীতি, বিক্রয় কার্যক্রম ও পদ্ধতি, প্রভৃতি কার্যকরী করিতে হইলে দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিক্রয় সংগঠনের একান্ত প্রয়োজন হয়। এই সংগঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বিক্রয় সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নূতন ও পুরাতন কর্মীকে প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন ব্যাপারে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। এইজন্য তাহাকে শিক্ষিত ও উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি হইতে হইবে।

এই পদ্ধতিদ্বারা প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে একটি পৃথক বিক্রয় সংগঠন থাকা দরকার এবং ইহাকে বিক্রয়বিদ্যার মূলনীতি বা কৌশল বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

(৪) **বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ :—**

বিক্রয়রীতি, বিক্রয় কার্যক্রম ও পদ্ধতি, বিক্রয় সংগঠন ঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহার তদারক কার্যই এই নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কার্য। এই নিয়ন্ত্রণ একান্ত দরকার। কারণ এইরূপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোন কার্য ঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা বোঝা যায় না। এবং ইহার ফলে ইপ্সিত ফললাভ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। সেজন্য বিক্রয়-নিয়ন্ত্রণকে বিক্রয় বিদ্যার মূল ও অন্যতম কৌশল বলে।

এই বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ সাধারণত **নিম্নলিখিত** পদ্ধতিতে করা হইয়া থাকে :—

(ক) পণ্যের বিক্রয়, হিসাব, লক্ষ্য, কার্যক্রম প্রভৃতি নির্ধারণদ্বারা।

(খ) বিভিন্ন কর্মীর কাজের হিসাব পরীক্ষাদ্বারা।

(গ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মীদের সভা আহ্বানদ্বারা তাহাদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগদ্বারা।

(ঘ) কোন বিষয় পরিবর্তন হইলে তাহা করা এবং ঐ ব্যাপারে নূতন নীতি নির্ধারণ করা এবং

(ঙ) যেসকল কর্মী তাহাদের কার্য ঠিকভাবে সম্পন্ন করিয়াছে অথবা আরও অধিক কার্য সম্পন্ন করিয়াছে তাহাদের বিশেষ পুরস্কারদ্বারা সম্মানিত করা প্রভৃতি।

ফলপ্রসূ ও সফলকাম বিক্রয় উদ্যোগীর অত্যাবশ্যক গুণাবলী (The essential qualities of an effective and successful salesman) **:—**

যে কোন অফিসের কারিগর, সাধারণ কর্মচারী প্রভৃতি নিয়োগ অতি সহজ ব্যাপার। কিন্তু একজন সফলকাম বিক্রয় উদ্যোগী নিয়োগের কাজ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করিয়া এইরূপ বিক্রয় উদ্যোগী নিয়োগ করিতে হয়। এই বিক্রয় উদ্যোগীর উপরই কারবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাহার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পরিকল্পনা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতিই কারবারকে উন্নতির শিখরে পৌঁছাইয়া দেয়।

বিভিন্ন প্রকার সাক্ষাৎকারদ্বারা এই প্রকার কর্মী নিয়োগ করা হয়। ইহা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অনেক গুণাবলী তাহাদের মধ্যে থাকে না। সেজন্য কোম্পানী উহা পূরণ করিবার জন্য বিশেষ ট্রেনিংএর ব্যবস্থাও করিয়া থাকে।

এইসমস্ত ট্রেনিং হইতে ঐ কর্মচারীরা ঐ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ধরণের শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। এই শিক্ষা পরবর্তীকালে তাহাদিগকে উন্নতি লাভ করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই বিশেষ ধরণের ট্রেনিংকে বাদ দিলে বলা যায় যে, প্রত্যেক বিক্রয়-কর্মী সাধরণ কিছু কিছু গুণের অধিকারী থাকিবে। অন্যথায় তাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই সাধরণ গুণকেই সফলকাম বিক্রয়-কর্মীর **গুণাবলী** বলা হয়। এই গুণাবলীগুলি নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

(১) **সুন্দর চেহারা :—**

সফলকাম বিক্রেতা হইতে হইলে সুন্দর চেহারা একান্ত দরকার। কারণ সুন্দর চেহারার অধিকারী বিক্রেতা সহজেই ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিতে পারে। তাহার সুন্দর চেহারা, সুন্দর পোষাক, প্রভৃতি ক্রেতামনে দীর্ঘ রেখাপাত করিয়া থাকে।

(২) **সুন্দর স্বাস্থ্য ও অভ্যাস :—**

ইহাকেও গুণাবলী বলে। প্রত্যেক কর্মীকে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করিতে হয়। প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। সেজন্য তাহাকে কঠোর পরিশ্রমী হইতে হইবে এবং সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে। দুর্বল চিত্ত ও রুগ্ন বিক্রয়কর্মী সাধরণত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

(৩) **মার্জিত স্বভাব ও আদব কায়দা :—**

সাফল্যলাভের ইহা মূলমন্ত্র। স্বভাব যদি মার্জিত না হয় অথবা ভদ্রতা, সভ্যতা, যদি কোন বিক্রয়কর্মী না জানে তবে তাহার পক্ষে উন্নতি করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রতিদিন তাহাকে প্রচুর ক্রেতার সংস্পর্শে আসিতে হয়। আদব কায়দাদ্বারা তাহাদিগকে প্রভাবিত করিতে না পারিলে বিক্রয়কর্মী সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

(৪) **মিশুক স্বভাব ও বুদ্ধিমত্তা :—**

বিভিন্ন পরিবেশে তাহাকে বিভিন্ন লোকের সহিত মিশিতে হয়, সেজন্য মিশুক স্বভাব একান্ত দরকার। ক্রেতাদের সহিত মিশিতে না পারিলে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করা যায় না। সুতরাং প্রত্যেক বিক্রয় কর্মীকে মিশুক স্বভাব সম্পন্ন হইতে হইবে। শুধু মিশুক স্বভাব হইলেই চলিবে না। তাহাকে অনেক বুদ্ধিমান হইতে হইবে। কারণ, কিভাবে লোকের মন জয় করা যায় সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকিতে হইবে। সময় ও সুযোগমত সমস্ত অর্ডার সংগ্রহ করিতে হইবে। সেজন্য বিক্রয়কর্মীকে খুব বুদ্ধিমান হওয়া দরকার।

(৫) **অধ্যবসায় :—**

বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতা থাকে। কিছু কিছু ক্রেতা খুব চালাক হয়। তাহারা বিক্রয় কর্মীর বাচণভঙ্গীতে সহজেই ধরা দিতে চাহে না। সেজন্য এইসকল

ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করিতে খুব ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের দরকাব হয়। ইহাদের সহিত গভীর ভাবে মেলামেশা করিয়া ইহাদের স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করিতে হয়। সুতরাং ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সফলকাম বিক্রয় কর্মীর অন্যতম বৈশিষ্ট।

(৬) **পণ্য সম্পর্কে জ্ঞান :—**

পণ্য সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান তাহার থাকিতে হইবে। নতুবা কোন ক্রেতা পণ্য সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তব দিতে পারিবে না। ইহাতে ক্রেতা নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য পণ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সূক্ষ্মজ্ঞান প্রত্যেক বিক্রয়কর্মীর থাকা বাঞ্ছণীয়।

(৭) **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা :—**

বর্তমানযুগে ইহাকেও সফলকাম বিক্রযকর্মীব অন্যতম গুণ বলিয়া অভিহিত কবা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানেব প্রসারের সাথে সাথে লোকেব জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতবাং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কবিতে হইলে শিক্ষা একান্ত দবকার। শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নহে ইহার সাথে অতীত অভিজ্ঞতাও একান্ত প্রয়োজন। কারণ, অভিজ্ঞতা থেকে কাজ করিলে ভুলভ্রান্তিব সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। সেজন্য দেখা যায় অভিজ্ঞ লোকেব চাকুবী পাইবাব সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকে। প্রত্যেক কারবারী অভিজ্ঞ কর্মীই বেশী পছন্দ করে।

(৮) **মনস্তত্ত্বের জ্ঞান :—**

ক্রেতার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকিলে কোন বিক্রয় কর্মীই কৃতকার্য হইতে পারে না। ক্রেতার মনস্তত্ত্ব বিচার করিয়াই তাহাকে পণ্য বিক্রয়ের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে নতুবা সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

(৯) **নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাস :—**

প্রত্যেক বিক্রয় কর্মীকে ক্রেতা ও নিয়োগকর্ত্তাব নিকট নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হইতে হইবে। ইহা না হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হইবে।

(১০) **আনুগত্য ও প্রফুল্লতা :—**

নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রত্যেক বিক্রয়কর্মীকে আনুগত্য রাখিতে হইবে। নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠানের সত্তার সহিত এক করিয়া দিতে হইবে। এবং প্রফুল্লতা ও উৎসাহ সহকারে তাহাকে কাজ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য না বাখিলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয় এবং ইহাব ফলে ঐ বিক্রয়কর্মী নিজেও চাকুবী জীবণে সফলকাম হইতে পারে না।

বিভিন্ন প্রকারের বিক্রয়-উদ্যোগী (Different types of Salesman) :—

বিভিন্ন প্রকার বিক্রয়-উদ্যোগ বর্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে উহাদিগকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(১) প্রথমেই আমরা এই বিক্রয়-উদ্যোগকে **সৃজনক্ষম** ও **সেবা** এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। নূতন বাজার সৃষ্টি, নূতন পণ্য উৎপাদন, নূতন ক্রেতাসংগ্রহ, প্রভৃতি কাজ সৃজনক্ষম উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত, অপরদিকে ক্রেতাদের প্রয়োজনমত পণ্য কমদামে ঠিক সময়ে সরবরাহ করার কাজকে সেবারত বিক্রয় উদ্যোগ বলে।

(২) পণ্যর প্রকৃতি অনুযায়ী বিক্রয় উদ্যোগকে আবার **বাস্তব** এবং **অবাস্তব** এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

যে সকল পণ্যর অস্তিত্ব আমরা স্পর্শ করিয়া অনুভব করিতে পারি তাহাদের বিক্রয়-উদ্যোগকে বাস্তব বিক্রয় উদ্যোগ বলে। যেমন, জামা-কাপড়, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু, প্রভৃতি। আর যে জিনিসের অস্তিত্ব আমরা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিতে পারি না, তথাপি বিক্রয় করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে হয় তাহাদিগকে অবাস্তব বিক্রয় উদ্যোগ বলে। যেমন, আমোদ-প্রমোদ, সিনেমা, থিয়েটার, প্রভৃতি।

(৩) বিক্রয় উদ্যোগকে আবার **পাইকারী** ও **খুচরা** এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। উৎপাদকের নিকট হইতে খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় পর্যন্ত যে উদ্যোগ দেখা যায় তাহাকে পাইকারী বিক্রয়-উদ্যোগ বলে। আর পাইকারী বিক্রেতার নিকট হইতে প্রকৃত ভোক্তার হাতে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগকে খুচরা বিক্রয় উদ্যোগ বলে।

সুতরাং সমগ্র বিক্রয়-উদ্যোগকে উপরোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

পণ্য বিক্রয়ে অর্থনৈতিক, কারবারী এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক (Economic, Business and Psychological aspect of Selling) :—

প্রাচীন কালে পণ্য বিক্রয় ও বর্তমানের বিক্রয়ের মধ্যে দিনরাত্রির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন কালে ক্রেতা এবং বিক্রেতার সংখ্যা ছিল সামান্য। তাহারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করিত। ক্রেতারা তাহাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সোজাসুজি বিক্রেতার নিকট হইতে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করিত। বিক্রেতারা যে দাম ধার্য করিত উহা দিয়াই পণ্য বিক্রয় হইত। অর্থাৎ, বাজারের উপর বিক্রেতার আধিপত্য ছিল প্রচুর। কিন্তু বর্তমানে ঐ দিন আর নাই। ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিক্রেতার সংখ্যাও প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেজন্য পণ্য বিক্রয় করা বর্তমানে একটা

সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। ক্রেতা এখন সহজেই কোন পণ্য ক্রয় করিতে চাহে না। বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করার পরে তবেই পণ্যক্রয় করিতে রাজী হয়। সুতরাং এই সমস্ত কথা চিন্তা কবিয়া বিক্রতাকে অগ্রসর হইতে হয়। বর্তমান বাজারে ক্রেতার আধিপত্য অধিক। সে জন্য বিক্রয় কার্য্যকে অধিক ফলপ্রসূ করিতে হইলে বিক্রেতাকে বিশেষ করিয়া **তিনটি প্রক্রিয়ার** প্রতি লক্ষ বাখিতে হয়। এই প্রক্রিয়া সমূহ নিম্নরূপ :—

অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া :—

বর্তমানে পণ্য বক্রয় সত্যই এক সমস্যা। পণ্যব উৎপাদন হইতে উহাকে বিক্রয় স্তরে নিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত অনেক খরচ বিক্রেতাকে বহন কবিতে হয়। যেমন, কাঁচাপণ্য ক্রয়, পবিবহন, আনুসঙ্গিক খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, প্রভৃতি। এই সকল খরচ কবিবাব সময় বিক্রেতাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হয়। নতুবা পণ্যর মূল্যও বেশী হইবে এবং বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। ফলে ব্যবসা লোকসানে পরিচালিত হইবে। সুতবাং পণ্যর মূল্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক ভাল করিয়া বিচার না করিলে পণ্য বিক্রয় সম্ভব হইবে না। পণ্যর মূল্য কম হইলে প্রতিযোগিতায় দাডানো যায় এবং পণ্য বিক্রয় কবিয়া প্রচুব লাভ কবা যায়। ইহাই বিক্রয়ের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া এবং বিক্রয় প্রচেষ্টাকে সফল কবিবাব অন্যতম কৌশলও।

কারবারী প্রক্রিয়া :—

ইহাকে দ্বিতীয় প্রক্রিয়া বলা হয়। অর্থনৈতিক দিক দেখাব পরে এই দিকটাও দেখিতে হইবে। কাঁচা মাল সংগ্রহ, সময়মত পণ্য উৎপাদন, উপযুক্ত পবিবহন ব্যবস্থা এবং উহাদিগকে বাজারে বিক্রয় করাকেই কারবারী প্রক্রিয়া বলে। কারবারেব উন্নতি বা সফলতা অনেকাংশে এই কারবারী প্রক্রিয়ার উপব নির্ভব করে।

মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া :—

বিভিন্ন প্রকার পণ্য একই মূল্যে বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু দেখা যায় কোন একটি পণ্য অন্যটি অপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ঐ পণ্য বিক্রেতার বিক্রয়ের উন্নত পদ্ধতি। এই উন্নতি অনেকটা ক্রেতার মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়াব উপর নির্ভব করে। সুতরাং পণ্য বিক্রয়ের উপর ক্রেতার মনস্তাত্বিক ভাবনা অনেকাংশে দেখা যায়। যে বিক্রেতা তাহা বুঝিয়া সময় মত ও ঠিকভাবে ক্রেতার নিকট আবেদন রাখিতে পারে তাহার পণ্যই অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইবে। সুতরাং পণ্যর বিক্রয়ের পরিমাণ অধিক করিতে হইলে বিক্রেতাকে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হইবে।

পণ্য বিক্রয়ের কার্যক্রম রচনা (Planning Programme for Marketing products) :—

উৎপাদিত পণ্য বাজারে অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে হইলে তাহার জন্য একটি বিক্রয় কার্যক্রম রচনা বা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ইহার উদ্দেশ্য থাকে সম্ভাব্য ক্রেতাকে প্রকৃত ক্রেতায় অধিক পরিমাণে পরিণত করা। এই কার্যক্রম প্রস্তুত করিবার সময় যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

(ক) প্রত্যেকটি পণ্যর মান ঠিক করিয়া প্রথমে উহাকে বাজারের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। এজন্য মোড়াই বা প্যাকিং, গুদামজাত করণ প্রভৃতি ঠিকভাবে করিতে হইবে। ইহার উপরও পণ্যর বিক্রয় অনেক অংশে নির্ভর করে।

(খ) ইহার পরে বাজার সম্পর্কে গবেষণা করিতে হইবে। ইহা হইতে কোন্ পণ্য কোন্ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বিক্রয় করা যাইবে তাহা সহজে বোঝা যাইবে। এই বাজার গবেষণা হইতে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস, আয়, ক্রয়ক্ষমতা, বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা, কমিশন এজেন্ট নিয়োগ, নূতন খরিদ্দার সংগ্রহের পদ্ধতি, প্রভৃতি বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা হইতে বিক্রয় কার্যক্রম প্রস্তুত করা অনেক সহজ হইবে।

(গ) উপরোক্ত প্রকারে বাজার গবেষণা দ্বারা পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সমূহ গৃহীত হইতে পারে :—

(১) পণ্যর মান নির্ধারণ ও মূল্য স্থিরিকরণ।

(২) চাহিদার সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞাপন প্রদান, বাতায়ন সজ্জা, নমুনা বিতরণ, মূল্য পুস্তিকা প্রনয়ণ, প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) ক্রেতাগণ যাহাতে তাহাদের স্থানীয় বাজারে পণ্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ। এজন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা মারফৎ ঐ সকল বাজারে পণ্য প্রেরণ, এবং প্রয়োজন হইল খুচরা বিক্রেতা নিয়োগ।

(৪) বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ। বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় হইতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নীতি। বিভিন্ন প্রতিনিধির নিকট হইতে বিক্রয় বিবরণী সংগ্রহ করিয়া এই বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। প্রয়োজনে বিভিন্ন কর্মীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কার প্রদানও এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৫) জন সংযোগ দ্বারাও বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রেতার সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। তাহাদের অভাব দূর করিবার সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ, উৎসব প্রভৃতিতে চাঁদা প্রদান, প্রভৃতিও ইহার অন্তর্ভূক্ত। ইহাতে জনগণ সন্তুষ্ট হয় এবং অধিক পরিমাণে ঐ প্রতিষ্ঠানের পণ্য খরিদ করে। ইহাতে ব্যবসায়ীর লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

কোন একটি সিগারেট কোম্পানীর পক্ষ হইয়া ঐ সিগারেট ভারতের কোন এক দূরতম অঞ্চলে পৌঁছাইয়া দেওয়ার পরিকল্পনা (A programme on behalf of cigarate manufacturing company for marketing the product keeping in view the remotest corners of India) :—

এই পরিকল্পনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করিতে হইবে। এরই সাথে ব্যয়-নীতি, বিক্রয়-নীতি, প্রভৃতি ঠিকভাবে নির্বাচন কবিতে হইবে। এই বিক্রয় নীতি-নির্বাচনের সময় বিক্রয় সহায়ক নীতি সমূহেব উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হইবে। বিক্রয় সহায়ক নীতি বলিতে প্রতিনিধিকে সুন্দব দেখিতে হওয়া চাই, মার্জিত রুচি সম্পন্ন ও আদব কায়দা জানিতে হইবে, মিশুক স্বভাব, বুদ্ধিমান, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, পণ্য সম্পর্কে জ্ঞান, মনস্তত্ত্বেব জ্ঞান, বিশ্বাসী, প্রভৃতি হইতে হইবে।

ইহার পবে বিক্রয় নিযন্ত্রন কবিতে হইবে। এজন্য বিক্রয়েব লক্ষ্য, পদ্ধতি, নীতি, প্রভৃতি দেখিতে হইবে। মালিক বিভিন্ন কর্মীকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগ করিতে পারে এবং সময মত তাহাদেব বিবরণী পাঠ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে পারে। বিভিন্ন জটিল বিষয প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন কর্মীকে মালিক আলোচনার মাধ্যমেও বুঝাইতে পারে।

ইহার পরে ঐ সিগারেট বিক্রয় অভিযানেব সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে :—

(১) এই সিগারেটেব গুণ ও বৈশিষ্ট, (২) উৎপাদকের পরিচালন ক্ষমতা, (৩) বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচুব অর্থ, (৪) চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন অধিক হইবে কিনা? (৫) প্রকৃত মাধ্যম নির্ণয়।

এই অভিযান আবাব আঞ্চলিক, শ্রেণীবদ্ধ এবং জাতীয় হইতে পারে। আঞ্চলিক অভিযান হইলে উহা কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিবে। শ্রেণীবদ্ধ হইলে কয়েক শ্রেণীর ক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থকিবে আর জাতীয হইলে আঞ্চলিক ও শ্রেণীবদ্ধ উভয়ই ইহাব অন্তর্ভূক্ত হয়। সেজন্য এই সিগারেট বিক্রয়ে জাতীয় অভিযানই গ্রহণ যোগ্য। কারণ, ইহাতে জনমত নির্বিশেষে সকলেই ঐ সিগারেট পান করিতে শুরু করিবে, এবং লাভের পবিমাণও দিনের পব দিন বৃদ্ধি পাইবে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. প্রচার ও বিজ্ঞাপন বলিতে কি বুঝ? উহাদেব মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কব।

   (What do you mean by Publicity and Advertisement ? What are the differences between the two).

2. বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

(Discuss tne Objects and Significance of Advertisement).

3. বিজ্ঞাপন লাভ জনক। তুমি কি সমর্থন কর ? আলোচনা কর।

(It pays to advertise. Do you agree ? Discuss)

4 "বিজ্ঞাপন অপব্যয়"—তুমি কি ইহা সমর্থন কর ? কারণ দেখাও।

("Advertisement is a wasteful expenditure,"—do you agree with the argument ? give reasons for your answer).

5. বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন মাধ্যম সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(Discuss the various kinds of advertisement media).

6. বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনা কর।

(Discuss the various factors to be considered for the selection of advertisement media.)

7 বিজ্ঞাপনের নীতি বলিতে কি বুঝ ? উহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা লিখ।

(What is meant by advertisement policy Discuss the factors on which it depends)

8. বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন কাহাকে বলে ? উহার সফলতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

(What is meant by Scientific Advertisement ? Discuss the factors on which its success depends).

9. বিজ্ঞাপন প্রতিলিপি কাহাকে বলে ? উহার সফলতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(What is Copy of an Advertisement ? Discuss the factors on which its success depends).

10. বিজ্ঞাপনে অঙ্গসজ্জার ব্যাপারে কি কি বিষয় বিবেচনা করিতে হয় তাহা আলোচনা কর।

(Discuss the factors to be taken into consideration in preparing the lay out of an advertisement)

11. বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিত্ব কাহাকে বলে ? ইহাদের ভূমিকা আলোচনা কর। প্রতিযোগিতামূলক কোন পণ্যর বাজার সৃষ্টির জন্য একখানি বিজ্ঞাপন কর্মসূচী প্রস্তুত কর।

(What is Advertising Agency ? Discuss its role and prepare an advertising programme for a competitive product).

12 পশ্চিমবঙ্গের কোন একজন বিস্কুট ব্যবসায়ী যে প্রকারে উহার বিস্কুটের বিজ্ঞাপন দিতে পারেন তাহার বর্ণনা দাও।

(Describe the methods which may be adopted by a manufacturer of a new brand of biscuit in West Bengal).

13. জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট বিক্রয়, হস্তজাত পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি, শিশুখাদ্য বিক্রয় ও কোন সেভিংস ব্যাঙ্ক জনপ্রিয় করার জন্য একটি করিয়া বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি করিয়া দেখাও।

(Prepare an advertisement copy to sell the National Defence Certificate, for increase the sale of handicrafts, for the sale of a baby food and to popularise a Savings Bank Account)

14 বিক্রয় বিদ্যা কাহাকে বলে ? ইহার মৌলিক বিষয়সমূহ আলোচনা কর।

(What is Salesmanship ? What are the Fundamentals and the Techniques of Salesmanship ?).

15. তোমার মতে ফলপ্রসূ ও সফলকাম বিক্রয় উদ্যোগীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী কি কি ?

(What, in your opinion, are the essential Qualities of an effective and successful Salesman ?)

16 বিভিন্ন প্রকারের বিক্রয়-উদ্যোগী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

(Write short notes on different types of salesmanship)

17, "একজন বিক্রয়-উদ্যোগীকে প্রথমে মনস্তত্ত্ববিদ এবং পরে বিক্রয়-উদ্যোগী হইতে হইবে।"—আলোচনা কর।

("A Salesman needs to be a Psychologist first and Salesman after words "—Discuss).

18. পণ্য বিক্রয়ের কার্যক্রম রচনার উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

(Write short notes on Planning Programme for marketing the Products).

19. কোন একটি সিগারেট কোম্পানীর পক্ষ হইয়া উহার সিগারেট ভারতের কোন এক দূরতম অঞ্চলে পৌঁছাইয়া দেওয়ার একটি পরিকল্পনা রচনা কর।

(Prepare a programme on behalf of a cigaret manufacturing company for marketing the product keeping in view the remotest corners of India.)

বাজারসমূহ
(Markets)

বাজারের অর্থ ও উহার শ্রেণীবিভাগ (Meaning and Classification of Market) :—

সাধারণ অর্থে যে স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলিত হইয়া পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন করে তাহাকে বাজার বলে। কিন্তু বাজার শব্দটি অর্থনীতিতে বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যে বাজার শব্দটির অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। সেইজন্য উহার শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন। এই শ্রেণীবিভাগ হইতে বাজারের প্রকৃত অর্থ সহজেই বোঝা যাইবে। বাজারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

(১) যে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে তাহাকে **স্থানীয় বাজার** বলে। যেমন, দুধ, শাক, সব্জি, মাছ, প্রভৃতির বাজার। যে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহাকে **জাতীয় বাজার** বলে। যেমন, ভারতের বিভিন্ন পণ্যের বাজার। আর যে পণ্যের বাজার কোন একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বিদেশেও বিস্তৃতি লাভ করে তাহাকে **আন্তর্জাতিক বাজার** বলে। যেমন, সোনা, রূপা, প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর বাজার।

(২) পণ্য ক্রয়ের সাথে সাথে যে বাজারে বিক্রেতা পণ্য ক্রেতার নিকট উহা সরবরাহ করে তাহাকে **সত্ত্বাজার** বলে। কিন্তু যে বাজারে পণ্য বিক্রয়ের দিনে ঐ পণ্য ক্রেতাকে সরবরাহ না করিয়া ভবিষ্যতে কোন একদিনে সরবরাহ করার চুক্তি হয় তাহাকে **ফাট্‌কা বাজার** বলে।

(৩) বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্শাল বাজারকে **স্বল্পকালীন, অতি-স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন** এবং **অতি-দীর্ঘকালীন** বিভাগে ভাগ করিয়াছেন।

(৪) বাজারকে আবার **পাইকারী** ও **খুচরা** এই দুই শ্রেণীতে ভাগকরা যায়। যে বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় উৎপাদক ও ব্যবসাদারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহাকে পাইকারী ব্যবসা বলে। আর যে বাজারে পণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিক্রেতা, ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে তাহাকে খুচরা বাজার বলে।

(৫) কাঁচামাল ও উৎপন্ন পণ্য যে বাজারে বিক্রয় করা হয় তাহাকে **পণ্যের বাজার** বলে। আর কোম্পানীর শেয়ার, ঋণপত্র, প্রভৃতি যে বাজারে বিক্রয় হয় তাহাকে **শেয়ার বাজার** বলে।

(৬) যে বাজারে প্রচুরসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে তাহাকে **প্রতিযোগিতা-মূলক বাজার** বলে। আর যে বাজারে একজন বা স্বল্পসংখ্যক পণ্যের বিক্রেতা থাকে, কিন্তু প্রচুর ক্রেতা থাকে তাহাকে **একচেটিয়া কারবার** বলে।

(৭) যে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহাকে **বৈদেশিক মুদ্রার বাজার** বলে। আর যেসকল উৎস হইতে মূলধন পাওয়া যায় তাহাকে **মূলধনের বাজার** বলে।

(৮) যে বাজারে কতকগুলি নিয়মকানুন যত্নসহকারে মানিয়া চলা হয় তাহাকে **সুসংগঠিত বাজার** বলে। আর যে বাজারে সরকারী নিয়ন্ত্রিত নিয়মকানুন মানিয়া কাজ হয় তাহাকে **নিয়ন্ত্রিত বাজার** বলে।

পণ্যবাজার, মূলধনবাজার ও টাকার বাজারের কার্য্যাবলী (Functions of Commodity Market, Capital Market and Money Market) :—

যে বাজারে পণ্য, কাঁচামাল, উৎপাদিত দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য, প্রভৃতি বিক্রয় হয় তাহাকে পণ্যবাজার বলে। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে এ বাজারে পণ্য ক্রেতার নিকট সরবরাহ করিতে হয় না। ভবিষ্যতের কোন একদিনে করিলেও চলিতে পারে। এ বাজারের প্রধান প্রধান কার্য্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

(১) বিভিন্ন পণ্যের শ্রেণীবিভাগ, নমুনা, স্তরবিভাগ, প্রভৃতি এই বাজারের অন্যতম কাজ। ইহার ফলে পণ্যের সরবরাহ ঠিকমত চলে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উপকৃত হয়।

(২) এই বাজারের অন্যতম কাজ হইতেছে পণ্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি বন্ধ করা। ইহাতে ক্রেতাগণকে ঠিকমূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে পারে এবং শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতি সহজ সাধ্য হয়।

(৩) ইহা চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতারক্ষার চেষ্টা করে। ইহাতে ঠিকমত পণ্য বাজারে বিক্রয় হইতে পারে। কেহ কাহাকেও ঠকাইতে পারে না। এইভাবে এই বাজার পণ্যের সরবরাহের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করে।

(৪) ভবিষ্যতে পণ্যের মূল্যর হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে ক্রেতা-বিক্রেতাকে রক্ষা করার জন্য এই বাজারে সংরক্ষণনীতির সাহায্য লওয়া হয়। ফলে বর্তমানের লাভ লোকসানদ্বারা পূরণ হইয়া যায়।

(৫) পণ্যগুণাগুণ এই পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়। এই বিষয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দিলে এখানে তাহার মীমাংসা করা হয়। এই

আলোচনা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, দেশেব অর্থ নৈতিক উন্নতিতে পণ্যবাজারের অশেষ অবদান রহিয়াছে।

কারবার পরিচালনার জন্য যেসকল উৎস হইতে মূলধন পাওয়া যায় তাহাকে মূলধনের বাজার বলে। এই বাজারে সাধবণত নিম্নলিখিত কার্যাই দেখিতে পাওয়া যায় :—

(১) ইহা একটি লগ্নীসংস্থা। সেজন্য বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদান করে এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, প্রভৃতি ব্যাপাবে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে।

(২) ইহা জনগণের নিকট হইতে আমানত সংগ্রহ কবে এবং ঐ অর্থ বেশী লাভজনক শেয়ার ক্রয়ে নিয়োগ কবে। ইহাতে দেশের শিল্পেব আর্থিক অবস্থা আবও অধিক দৃঢ় হয়।

(৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের প্রয়োজনীয় মূলধন ইহা সরবরাহ করে। সরকাবী ও বে-সবকাবী সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠান এই বাজার হইতে মূলধন পাইয়া থাকে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণই এই বাজাব হইতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী ও চলতি উভয় প্রকাব মূলধনই এই প্রতিষ্ঠান সরবরাহ কবিয়া থাকে। ইহা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়েব প্রবণতা বৃদ্ধি করে এবং শেয়ারেব প্রকৃত মূল্যও নির্ধাবণ করিয়া থাকে।

যেসকল প্রতিষ্ঠান আমাণত গ্রহণ ও ঋণদানের কাজে ব্যস্ত থাকে তাহাদিগকে একত্রে টাকাব বাজার বলে। যেসকল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়া থাকে তাহাকে **মূলধনের বাজার** বলে। আব যেসকল প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়া প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য কবিয়া থাকে তাহাদিগকে **টাকার বাজার** বলে।

এই টাকাব বাজারের কার্য্যাবলী সাধরণত নিম্নরূপে বর্ণনা কবা যায়।

(১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেব নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া ইহাবা স্বল্প মেয়াদী ঋণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করে।

(২) জনগণেব নিকট হইতে প্রাপ্ত আমানতের উপরও ইহারা সুদ দেয়।

(৩) বিল ভাঙ্গানো, চেকের টাকা আদায় করা, প্রভৃতিও ইহাব কার্য্যাবলী।

(৪) আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থসংস্থানও ইহা কবিয়া থাকে।

(৫) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণপ্রদানের সময় ইহা সম্পত্তি ও অলঙ্কারাদি গচ্ছিত রাখে।

(৬) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই ইহার নিয়ন্ত্রক। প্রয়োজনে ঐ ব্যাঙ্ক ইহার উপর বিভিন্ন বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারে। এবং

(৭) আমদানীকারীর পক্ষ হইয়া ইহা শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করে।

ফাট্‌কা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা, বৈধ ও অবৈধ ফাট্‌কা বাজারের অর্থ, ফাট্‌কা বাজারের শ্রেণীবিভাগ, ফাট্‌কা বাজারের গুরুত্ব এবং ফাট্‌কা বাজারের দোষত্রুটি। (Meaning, legitimate and illegitimate Speculation, Classification, Importance and Evils of Speculation) :—

পণ্যের মূল্য চাহিদার পবিবর্তনের সহিত ইহার দর উঠা নামা করে। কখনও বেশী হয় আবার কখনও কম হয়। যখন পণ্যের মূল্য কমিয়া যায় তখন পণ্য ক্রয় করিয়া উহার মূল্য বৃদ্ধিব সময় বিক্রয় কবিলে তাহাতে প্রচুব মুনাফা হয়। এবং ঐ রূপ উদ্দেশ্যে যখন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কবা হয় তখন তাহাকে **ফাট্‌কা কারবার বলে।** আর যে ব্যক্তি উহা কবে তাহাকে **ফাট্‌কা কারবারী বলে।**

এই ফাট্‌কা কাববাব আবার দুই প্রকাব হইতে পাবে, যেমন, **বৈধ** এবং **অবৈধ**। ভবিষ্যতে পণ্যমূল্যেব পবিবর্তন পূর্বেই সঠিক আন্দাজ করিয়া মুনাফা অর্জ্জনের জন্য অভিজ্ঞতার সহিত যে কাববার কবা যায় তাহাকে **বৈধ ফাট্‌কা কারবার বলে**। আর যখন ঐরূপ কারবাব অসৎ, অনভিজ্ঞ, প্রভৃতি লোকদ্বারা সাময়িকভাবে পরিচালিত হয় তখন তাহাকে **অবৈধ ফাট্‌কা কারবার বলে**। ইহাকে একপ্রকারের **জুয়া বলা** যাইতে পারে।

উপরোক্ত দুই প্রকার ফাট্‌কা কারবাব ছাড়াও উহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি **শ্রেণীতে** ভাগ কবা যাইতে পারে, যেমন,

(ক) **তেজীওয়ালা** (Bull) :—

যে ফাট্‌কা ব্যবসায়ী ভবিষ্যতে পণ্য মূল্যেব অধিক উর্দ্ধগতিব আশায় বর্তমানে ক্রয় কবে তাহাকে **তেজীওয়ালা ফাট্‌কা** কাববার বলে। ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে কমমূল্যে ক্রীত পণ্যগুলি এই সময় বিক্রয় করিয়া অনেক মুনাফা অর্জ্জন করে।

(খ) **মন্দীওয়ালা** (Bear) :—

ইহা উপবোক্ত পদ্ধতির ঠিক বিপরীত। এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে পণ্যমূল্য হ্রাস পাইবাব সম্ভাবনায় ব্যবসায়ী বর্তমানের মূল্যে শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বিক্রয় করিয়া দেয় অথবা বিক্রয়েব চুক্তি সম্পাদন করে। ভবিষ্যতে মূল্য কমিলেও ব্যবসায়ীর কোন লোকসান হয় না। কারণ, ব্যবসায়ী তাহাব পণ্য আগেই বিক্রয় করিয়া রাখিয়াছে।

(গ) **অধিমূল্য শিকারী** (Stog) :—

যে ফাট্‌কা ব্যবসায়ী কোন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য ভবিষ্যতে উহার বিলিকৃত মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবে এ আশায় ঐ শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করে তাহাকে

অধিমূল্য শিকারী বলে। ইহারা ভবিষ্যতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। এবং ইহারা মুনাফা শিকারী বলিয়া বাজারে পরিচিত। (Known as premium hunter)।

(ঘ) **খেলাপী মন্দীওয়ালা** (Lame Duck) :—

ভবিষ্যত বাজারে অল্পমূল্যে পণ্য ক্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায়ী যখন ঐ পণ্য বিক্রয়ের আগাম চুক্তি সম্পাদন করে এবং ভবিষ্যত বাজারে কমমূল্যে ঐ পণ্য ক্রয় করিতে না পারিয়া ঐ ব্যবসায়ী যখন পরবর্তী বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে না তখন তাহাকে খেলাপী মন্দীওয়ালা বল হয়।

ফাট্‌কা কারবারের **গুরুত্ব** আমরা নিম্নরূপে বর্ণনা করিতে পারি।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ফাট্‌কা বাজারের অশেষ গুরুত্ব আছে। কি প্রকারে এই বাজার অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়তা করিয়া থাকে তাহা আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করিতে পারি।

(১) এই কারবার হইতে উৎপাদকের ঝুঁকি হ্রাস পায়। বিক্রয়ের চিন্তা আর থাকে না। সে জন্য সহজে ও নিশ্চিন্ততা সহকারে পণ্য উৎপাদন করা যায়। এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা যায়।

(২) ইহা চাহিদা ও যোগানের সমতা রক্ষা করে। ফলে অধিক পণ্যমূল্য ক্রেতাগণকে দিতে হয় না এবং ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে না। প্রয়োজনে এই সমতা রক্ষার জন্য ফাট্‌কাব্যবসায়ীগণ রক্ষণ ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়া থাকে।

(৩) ফাট্‌কা কারবার হইতে শিল্পে সঞ্চয় বিনিয়োগ হয় এবং দেশের মূলধন গঠন কাজ সহজ হয়।

(৪) কোন পুরাতন ও নূতন কোম্পানী তাহাদের প্রয়োজনীয় মূলধন শেয়ার বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে পারে।

(৫) কৃষির ক্ষেত্রেও দরিদ্র কৃষকগণ পণ্যমূল্য স্থির করিয়া এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হইতে পাবে। এবং

(৬) এই বাজারের মারফৎ শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে সুবিধা থাকায় বিনিয়োগকৃত অর্থ বহুকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না, প্রভৃতি।

কিন্তু বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ফাট্‌কা কারবার কতকগুলি ত্রুটি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেনি। যেমন;

(১) ফাট্‌কা ব্যবসায়ীগণ সামগ্রিক সুবিধা অপেক্ষা ব্যক্তিগত সুবিধাকে বড় করিয়া দেখে।

(২) অসৎ, স্বার্থপর, ফাট্‌কাকারবারীরা অনেকসময় দেশের শিল্পোন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করে। বাজে গুজব রটাইয়া তাহারা নিজেদের স্বার্থে কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহাতে শিল্পের উন্নতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সেইজন্য বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইনস্ (Keynes) বর্তমানের চঞ্চল অর্থনীতির মূলে এই ফাটকা কারবারীব হাত আছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পণ্য বাজারের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট (Nature or Features of Commodity or Product exchange):

যে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়, ব্যাপক অর্থে তাহাকে পণ্য বাজার বলে। এই পণ্য বাজাব সুসংগঠিত বা সংগঠনহীন বাজাবও হইতে পারে। এই রূপ কোন একটি সুসংগঠিত পণ্যব বাজাবের বৈশিষ্ট-গুলি আমবা নিম্নরূপে আলোচনা কবিতে পারি।

(১) এইরূপ একটি সুসংগঠিত পণ্য বাজার একটি বোর্ড দ্বাবা পরিচালিত হয়।

(২) কোন দালাল, ব্যবসায়ী, পাইকারী ও খুচবা ব্যবসায়ী যে কেহ এই রূপ বাজারেব সভ্য হইতে পাবে।,

(৩) প্রত্যেক বাজাব এই প্রকাব বাজাবকে কতকগুলি নিয়মকানুন অনুযাযী চলিতে হয়। যেমন,

(ক) ক্রয় বিক্রয়েব জন্য কোন একটি স্থান নির্ধারণ কবিতে হয়। এই স্থানে ক্রেতা-বিক্রেতারা চুক্তি সম্পাদন করিতে পাবে।

(খ) পণ্যব গুণাগুণ অনুসাবে উহাদিগকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

(গ) কোথাও কোন প্রকাব অসুবিধা বা গণ্ডগোল দেখাদিলে তাহার মীমাংসা করা হয় এবং প্রয়োজন মত পণ্যের বাজার দাম স্থিব করা হয়।

(৪) প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন পণ্যেব জন্য বিভিন্ন বাজার ঠিক করিতে হইতে পাবে। এরূপ হইলে তাহাকে বিশেষ বাজার বলে। কিন্তু উহা না হইলে ইহাকে সাধবণ বাজাব বলে।

(৫) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এই রূপ বাজারে ঐ পণ্য উপস্থিত করিতে হয় না। উহাব নমুনা ও শ্রেণীবিভাগেব উপর নির্ভর করিয়া উহার ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়।

(৬) এই বাজারে সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হইতে পারে। যদি মনে হয যে, কোন পণ্যেব মূল্য ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার যোগান আশানুরূপ হইবে না তবে পূর্ব্বেই উহা সংরক্ষণ করিয়া রাখা হয়। ইহাতে উহাব মূল্য খুব বেশী পরিবর্তীত হইতে পাবে না।

(৭) এই বাজারে দুই প্রকার লেনদেন দেখা যায়। যথা,

(ক) 'নগদ লেনদেন' এবং (খ) 'ভবিষ্যৎ লেনদেন'। নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহ ও সাথে সাথে উহার মূল্য প্রদান করা হয়। এইরূপ লেনদেনে ভবিষ্যতে পণ্যের দাম হ্রাস বৃদ্ধি হইলে কোন পক্ষের কিছু বলার থাকে না। ইহা সুসংগত পণ্য বাজারে দেখা যায়। এবং কখন কখন সংগঠনহীন পণ্য বাজারেও ইহা দেখা যায়।

ভবিষ্যত বাজার অনুরূপ। এখানে পণ্যমূল্য ও পণ্যসরবরাহ সাথে সাথে করা হয় না। ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহের সর্তে চুক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্যকথায় ইহাকে ভবিষ্যতে দেয় চুক্তিও বলা যায়। এই পদ্ধতিতে বিক্রেতা যথেষ্ট সময় পায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে পণ্য উৎপাদন করিয়া সরবরাহ করিতে পারে। ক্রেতাও ভবিষ্যতে পণ্যের সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা লাভ করে।

পণ্য বাজারের গুরুত্ব বা অবদান (Importance or Services of produce exchange) :

কোন একটি সুসংগঠিত পণ্যবাজারের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব বা অবদান নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

(১) সততার সহিত ফাটকা কারবার পরিচালিত হইলে পণ্যমূল্যের স্থিতি আসে। ইহাতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই উপকৃত হয় এবং সর্বত্র উৎপাদন ব্যবস্থা সুন্দর ভাবে পরিচালিত হয়।

(২) পণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এরূপ বাজার হইতে বিস্তারিত ভাবে সংগ্রহ করা যায়।

(৩) এই বাজারের সভ্যগণ কোন একস্থানে মিলিত হইয়া পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পন্ন করে। ইহাতে তাহারা নিজেদের ভিতরে আলাপ আলোচনার সুযোগ পায় এবং ইহাতে বাজারের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয়।

(৪) ক্রমাগত ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এই পণ্য বাজারে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থাকে আরও উন্নত করিয়া তুলিতে সহায়তা করে। ইহা ভবিষ্যতের পণ্যমূল্য ও উহা প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়া থাকে।

(৫) সমস্ত পণ্য বাজারে টানিয়া আনিতে হয় না। নমুনার উপর ভিত্তি করিয়া পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়।

(৬) এই বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা সর্ব্বদা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেদের ভিতরে সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ গড়িয়া তোলে।

(৮) ক্রেতা বিক্রেতাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করিবার জন্য এই বাজারে সংরক্ষণ নীতিও অনুসৃত হইতে দেখা যায়। ইহাতে পণ্য মূল্যে অস্থিরতা দেখা দেয় না।

সেজন্য আমরা বলিতে পারি যে, উপরোক্ত কার্য সম্পাদনের দ্বারা পণ্যবাজার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

শেয়ার বাজারের অর্থ, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব (Meaning, Features and Importance of Stock Exchange):

যে বাজারে কোন কোম্পানীর শেয়ার, স্টক ডিবেঞ্চার এবং সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাকে **শেয়ার বাজার বলে**। পৃথিবীর সকল শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট একরূপ নহে। কিন্তু বিভিন্ন শেয়ার বাজারের প্রকৃতি আলোচনা করিলে নিম্নলিখিত **বৈশিষ্টগুলি** দেখা যায়।

(১) এই শেয়ার বাজার সাধরণত বোর্ড অব ডিরেকটরস্ দ্বারা পরিচালিত হয়।

(২) এই বাজারে ক্রয় বিক্রয় নগদ অথবা বাকীতে হইতে পারে। নগদে হইলে ক্রেতাগণ সাথে সাথে পণ্যর মূল্য পরিশোধ করিয়া দেয় এবং বিক্রেতাগণ সাথে সাথে পণ্য সরবরাহ করিয়া থাকে।

(৩) এই প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট গৃহ থাকে। সভ্যগণ সময়মত এই স্থানে মিলিত হয়। সভ্য ভিন্ন অন্যকেহ ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

(৪) দালালের মাধ্যমে এই বাজারের লেনদেন করা হয়। কাহারও শেয়ার ক্রয় অথবা বিক্রয়ের প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে দালালের উপর নির্ভর করিতে হয়। এবং দালালই সব কার্য সম্পন্ন করিয়া দেয়।

(৫) অনেক সময় ক্রেতা বিক্রেতা প্রকৃত অর্থে চুক্তিসম্পাদনে যায় না। এক্ষেত্রে একপক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তি অনুযায়ী টাকা বা শেয়ার দিতে না পারিলে খেসারত প্রদান করিতে হয়।

শেয়ার বাজার নিম্নলিখিত **গুরুত্বপূর্ণ** কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া দেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

(১) শেয়ার বাজার দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতারক্ষা করে।

(২) দেশের মূলধন গঠনে ইহা সাহায্য করে। কারণ, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয় কার্য সম্পাদন করিয়া ইহা জনগণের মধ্যে সঞ্চয় ইচ্ছা প্রবল করিয়া তোলে।

(৩) শেয়ার ক্রয় বিক্রয় দ্বারা শেয়ার বাজার দেশের মূল্যস্তরের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

(৪) জনগণকে ইহা বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার, প্রভৃতির মূল্য জানিতে সহায়তা করে, কারণ উহার মূল্য শেয়ার বাজারের নোটিশ বোর্ডে টাঙাইয়া রাখা হয়।

(৫) শেয়ার বাজাবেব মাধ্যমে বড় বড় কোম্পানী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে এবং সঞ্চিত অর্থ উপযুক্ত স্থানে বিনিয়োগ করিতে পাবে। বিশেষ কবিয়া ছোট ও নূতন কোম্পানী এই বাজার মারফৎ তাহাদের শেয়ার বিক্রয় করিতে পাবে।

(৬) বিভিন্ন প্রকাব শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রযেব পথকে এই শেয়ার বাজার প্রশস্ত কবিয়া দেয়। ফলে দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতি ব্যহত হয় না।

(৭) এই বাজার মাবফৎ যে সকল কোম্পানীর শেয়াব, ডিবেঞ্চার, প্রভৃতি বিক্রয় হয় তাহাদেব সুনাম বৃদ্ধি পায়।

(৮) শেয়ার বাজারেব বিনিয়োগকে বাজারে নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা যায়।

(৯) শেয়ার বাজার না থাকিলে বীমা, ব্যাঙ্ক, প্রভৃতি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আজ এতটা উন্নতি লাভ করিতে পাবিত না।

(১০) শেয়াব বাজার দ্বারা যৌথ মালিকানা কোম্পানীব মালিকানা সহজে হস্তান্তরিত করা যায়। ফলে ধনী সম্প্রদায় এই প্রতিষ্ঠানেব শেয়ার ক্রয় দ্বাবা বাণিজ্য ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিতে পাবে। সেজন্য অনেকে বলেন যে, শেয়ারেব মূল্য ও উহার ক্রয়-বিক্রয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেশেব অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি ও গতিবিধি সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই কারণে ইহাকে দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে কবা হয়। ইহার মাধ্যমে জনগণের ও প্রতিষ্ঠানের অর্থ নিরাপদে ও সহজে বিনিয়োগ কবা যায়। সুতরাং অসাধু ব্যবসায়ীদেব হাত হইতে সাধু ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগকে রক্ষা করার ইহা একটি মূল্যবান হাতিয়ার।

শেয়ার বাজারের লেনদেনের পদ্ধতি ও শেয়ারের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ (Procedure of dealing in the stock exchange and causes of fluctuation in the prices of shares in the market) :—

এই বাজারের সভ্য ব্যতীত কেহ এই বাজাবে শেয়াব, ডিবেঞ্চার, প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে না। বাহিরের ক্রেতা বিক্রেতাব প্রতিনিধি হইয়া ঐ বাজারের সভ্যগণ কার্য্য সম্পাদন করে। এই দালালেরা ক্রেতা বিক্রেতার আর্থিক সুবিধা অসুবিধা, সততা, প্রভৃতি বিচার করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি রূপে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে।

সিকিউরিটি বিক্রয়কারী দালালের সহিত সিকিউরিটি ক্রয়কারী পক্ষের দালাল যোগাযোগ করে এবং দালালেরা বিক্রেতা ও ক্রেতার মতানুযায়ী চুক্তি সম্পাদন করিয়া

থাকে। সেজন্য ইহাতে, অর্থাৎ এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে মুখ্য ক্রেতা বিক্রেতার নাম উল্লেখ করা থাকে না। এই কারণে দালালদের মধ্যে সম্পাদীত চুক্তিকে **মুখ্য ব্যক্তির চুক্তি** বলে। নগদ লেনদেন হইলে পণ্য মূল্য সাথে সাথে অথবা তিনদিনের ভিতরে এবং ভবিষ্যতে পরিশোধ্য দেনা সাত দিনের ভিতরে পরিশোধ করিতে হয়। শেয়ার বাজারের নিয়ম অনুসারে এই চুক্তি লট হিসাবে সম্পাদন করিতে হয়। লণ্ডন শেয়ার বাজারে দালাল ও সিকিউরিটি কারবারী এই দুই শ্রেণীর সভ্য দেখা যায়। সিকিউরিটি কারবারীগণ মুনাফা অর্জনের জন্য নিজেদের নামেই চুক্তি সম্পাদন করে। কোন ক্রেতা বিক্রেতা ইহাদের নিকট আসিলে ইহারা ক্রয় ও বিক্রয় উভয় প্রকার দরই তাহাদের নিকট উল্লেখ করে। এই দর পছন্দ হইলে তাহারা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইহাতে প্রকৃত ক্রেতা বিক্রেতার নাম উল্লেখ করা হয় এবং ঐ রূপ লেনদেনকে **দালালের চুক্তি** বলে। নগদ ছাড়াও এইরূপ চুক্তি আগাম ভিত্তিতে সম্পাদিত হইতে পারে। পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্রেতা মূল্য প্রদানে অক্ষম হইলে পরবর্ত্তী নিষ্পত্তির দিন পর্যন্ত ঐ লেনদেন বা চুক্তি স্থগিত রাখা যায় এবং ইহার জন্য ক্রেতা বিক্রেতাকে কিছু অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে। এই অতিরিক্ত অর্থকে **ব্যাজ** বলে। অপর পক্ষে, বিক্রেতা যদি নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ সিকিউরিটি ক্রেতাকে সরবরাহ করিতে না পারে তবে বিক্রেতা ক্রেতাকে কিছু অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে। ইহাকে **হরজানা** বলে। এই ভাবে লেনদেন চলে।

ফাটকাকারবার ও বিনিয়োগ এই দুই উদ্দেশ্যে শেয়ার বাজারে লেনদেন পরিচালিত হয়। বিভিন্ন প্রকার নিয়ম কানুন এই বাজারে থাকা সত্ত্বেও এই বাজার ঠিক ভাবে পরিচালিত হইতে পারিতেছে না। কারণ, এই বাজারে জুয়াড়ীদের আধিপত্য অত্যধিক। এই বাজারের লেনদেন নিকাশ ঘরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এই নিকাশ ঘর দ্রুত লেনদেন সম্পাদিত করিয়া ও হিসাব নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি করিয়া সভ্যদের প্রচুর সহায়তা করিয়া থাকে।

সাধরণ বাজারে যেমন পণ্যের **মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি** হয় তেমনি শেয়ার বাজারেও সিকিউরিটির **মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি** পাইতে দেখা যায়। এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধির মূলে রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও সামাজিক বিভিন্ন কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

(১) **যোগান ও চাহিদা :**—সিকিউরিটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে আবার চাহিদা হ্রাস পাইলে উহার মূল্য কমিয়া যাইবে। এই চাহিদা নির্ভর করে কোম্পানীর বণ্টিত লভ্যাংশের হারের উপর। যে কোম্পানী অধিক

লভ্যাংশ ঘোষণা করে সকলে ঐ কোম্পানীর সিকিউরিটি ক্রয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। সিকিউরিটির যোগান এই সময় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না, আর সেই জন্য উহার মূল্যও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, সিকিউরিটির চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করিয়া উহার মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি পাইতে পারে।

(২) **কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার** :—এই বাট্টার হারের উপর নির্ভর করিয়াও কোম্পানীর সিকিউরিটির মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি পাইতে পারে। বাট্টার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে সিকিউরিটির দাম কমিয়া যায়, পক্ষান্তরে বাট্টার হার কমিয়া গেলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

(৩) **দায়গ্রাহকগণের কার্যকলাপ** :—অনেকসময় দায়গ্রাহকগণ নূতন কোম্পানীর শেয়ার বেশীদামে বিক্রয় করিবার জন্য কৃত্রিমভাবে ক্রয় করে। ইহাতে বাজারে ঐ কোম্পানীর সিকিউরিটির মূল্য বৃদ্ধি পায়।

(৪) **তেজীওয়ালা এবং মন্দীওয়ালা কার্য** :—তেজীওয়ালা অধিকদামে সিকিউরিটি বিক্রয়ের জন্য গোপনে ক্রয় করিয়া রাখে। ইহাতে সিকিউরিটির কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করিয়া উহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া রাখে। অপরদিকে মন্দীওয়ালা ভবিষ্যতে শেয়ারের মূল্য কমিবার আশায় শেয়ার বিক্রয়ের চুক্তি বর্তমানে করিয়া থাকে। ইহার ফলে বর্তমানে বাজারে ঐ শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়।

(৫) **বীমা কোম্পানী** :—বীমা বা অন্যান্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান যখন তাহাদের প্রচুর অর্থ বাজারে শেয়ার ক্রয় করিতে বিনিয়োগ করে তখন বাজারে সিকিউরিটির মূল্য বৃদ্ধি পায়। এবং ইহারা যখন ভবিষ্যতে ঐ সকল সিকিউরিটি বাজারে বিক্রয় করিতে শুরু করে তখন আবার উহার মূল্য হ্রাস পায়।

(৬) **সুনাম** :—কোন কোম্পানীর সিকিউরিটির মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে ইহার সুনামের উপর নির্ভর করে। কারণ, সুনামী কোম্পানীর সিকিউরিটি সবাই আগে ক্রয় করিতে চাহে। এজন্য ইহার সিকিউরিটির মূল্য বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য খারাপ কোম্পানীর সিকিউরিটির মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে।

(৭) **জাতীয় আয় ও সঞ্চয়** :—জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শেয়ারের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে আয় হ্রাস পাইলে বাজারে শেয়ারের মূল্য কমিয়া যায়।

(৮) **কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ ও মুদ্রানীতি ঃ**—কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রানীতি শেয়ার বাজারের মূল্যস্তরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সহজ মুদ্রানীতি শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি কবে ও সংরক্ষণশীল মুদ্রানীতির ফলে শেয়ারের চাহিদা হ্রাস পায়।।

(৯) **মুদ্রাস্ফীতিও সংকোচণ ঃ**—দেশে মুদ্রাস্ফীতি হইলে জনগণের হাতে প্রচুর অর্থ আসে। ইহাতে তাহাদের সিকিউরিটি ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে শেয়ারের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মুদ্রাসংকোচনের সময় শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়। কারণ, এ সময় চাহিদা থাকে না।

(১০) **অন্যান্য কারণ সমূহ ঃ**—আকস্মিক কোন ঘটনা, যেমন, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সরকার পরিবর্তন, গুজব, ঘটনা প্রবাহ, প্রভৃতি কারণেও শেয়ারের মূল্য উঠা-নামা কবিতে পারে।

কলিকাতার শেয়ার বাজারের সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational set up of the Calcutta Stock Exchange) :—

ভারতীয় শেয়ার বাজারের মধ্যে কলিকাতার শেয়াব বাজার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৯০৮ সালে "রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে" শেয়ার লেনদেন কারিগণ একটি নূতন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ সালে ইহা তিনশত সভ্য লইয়া নিবন্ধীকৃত হয়। তখন ইহাব মূলধন ছিল তিন লক্ষ টাকা, তিনশতটি ১ হাজাব মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত। সিকিউরিটি চুক্তি আইন বলবৎ হওয়ার পর একমাত্র কোন ব্যক্তিই এই বাজাবের সভ্য হইতে পারে। বর্তমানে ইহাব শেয়ারের সংখ্যা ১২০০, প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ২৫০ টাকা। সভ্যপদ লাভ কবিতে হইলে প্রত্যেককে এক খানা শেয়ার এবং প্রবেশমূল্য বাবদে ৫০০০ টাকা নগদ দিতে হয়। প্রত্যক সভ্যই প্রতিনিধি বা অংশীদার গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু প্রত্যেক সভ্যকেই ২০,০০০ টাকা আমানত রাখিতে হয়। বর্তমানে এই বাজারের সভ্য হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপাব। অংশীদার বা প্রতিনিধিকে এই বাজারে প্রবেশ করিবার জন্য ৫০০ টাক' প্রদান করিতে হয় এবং প্রতিমাসে ৪ টাকা করিয়া মাসিক চাঁদা দিতে হয়।

এই বাজারের গঠন কার্য পদ্ধতি নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

(১) **নাম ঃ**—ইহার নাম কলিকাতা শেয়ার বাজার।

(২) **মূলধন ঃ**—ইহার মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ২৫০ টাকা। ১৯৫৬ সালে লগ্নীপত্র চুক্তি আইন অনুসারে ইহা সরকারী অনুমোদন লাভ

করে। এই অনুমোদনের আগে ইহার শেয়ারের মূল্য ছিল ১ হাজার টাকা। অনুমোদনের পর হইতে কেবলমাত্র ব্যক্তিই (individual) ইহার সভ্য হইতে হইবে।

(৩) **সভ্য ঃ**—ইহাতে দুই প্রকার সভ্য দেখা যায়। যেমন, সাধারণ সভ্য এবং প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। পূর্ণ সততার ভিত্তিতে এই সভ্যগণ বাজারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রন বিধি প্রনয়ণ করে। ক্রেতা বা বিক্রেতা কোন চুক্তি কার্যকরী করিতে অসমর্থ হইলে সভ্যগণ তাহাদের আরও ৭ দিন সময় দেয়। ইহাতেও না পারিলে ঐ চুক্তি নাকচ হইয়া যায়। ইহাতে যদি কোন পক্ষের কোন ক্ষতি হয় তবে চুক্তি খেলাপী পক্ষ উহা পূরণ করিতে বাধ্য থাকে। ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ ১৬ টাকা জমা দিয়া সমিতির নালিশ সভার নিকট চুক্তি খেলাপের নালিশ করিতে পারে।

এই বাজারে সভ্য হইতে হইলে শেয়ার ক্রয় করিতে হয়। ইহা ছাড়াও প্রবেশ মূল্য হিসাবে ৫ হাজার টাকা এবং আমানত হিসাবে ২০ হাজার টাকা জমা দিতে হয়। কার্যকরী সমিতি সভ্যপদ দেওয়ার পূর্বে প্রার্থীর আর্থিক সঙ্গতি, ব্যবসায়ের সুনাম সততা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া সভ্য পদ মঞ্জুর করেন। কোন সভ্য প্রতিনিধি লইতে চাহিলে এইরূপ প্রত্যেক প্রতিনিধির জন্য ৫০০ টাকা জমা দিতে হয় এবং প্রতিনিধির জন্য দেয় মাসিক চাঁদার হার ৪ টাকা।

(৪) **পরিচালনা ঃ**—নির্বাচিত ও মনোনীত ১৯ জন সদস্য লইয়া এই বাজারের কার্যকরী সমিতি গঠন করে। এই ১৯ জনের মধ্যে ৩ জন ভারত সরকারের প্রতিনিধি। প্রতি বৎসর অর্ধেক পরিচালক অবসর গ্রহণ করিয়া থাকে। অবসর প্রাপ্ত পরিচালক পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারে। প্রতি বৎসর ইহা পরিচালনার জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচন করিতে হয়। এই সমিতিই বাজার পরিচালনার বিভিন্ন নিয়ম কানুন জন্য তৈয়ার করে। কোন কারণে সভ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ হইলে তাহাদিগকে এই সমিতির বিচার মানিয়া লইতে হয়।

(৫) **লেনদেন পদ্ধতি ঃ**—এই বাজারের অধিকাংশ লেনদেনই নগদ ভিত্তিতে সম্পাদন হয়। আগাম কারবারও হইয়া থাকে। বাজার দর ও চুক্তি সম্পাদনের সময় দরের মধ্যে পার্থক্য প্রদান এখানে অনুমোদিত নহে। কিন্তু ইহা সত্বেও অধিকাংশ কারবার এই বাজারে ফাট্‌কা ভিত্তিতে হয় বলিয়া ইহাকে অনেকে ফাট্‌কা বাজারও বলিয়া থাকে।

বাহিরের কোন ব্যক্তি এ বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না। কেহ শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিতে চাহিলে তাহাকে দালালের মাধ্যমে করিতে হয়। সেজন্য এই চুক্তিকে

মুখ্য ব্যক্তির চুক্তি বলে। এই দালালেরা শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের সময় বাহিরের লোকের নাম উল্লেখ করে না। ফলে সভ্যগণ অর্থাৎ দালালেরা শেয়ার বাজারের দর অপেক্ষা বাহিরের লোকের নিকট হইতে অধিক দর আদায় করিতে পারে। এই প্রকার লেনদেনে কমপক্ষে তিনটি চুক্তি সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। যেমন, দালালের সহিত ক্রেতার একটি চুক্তি, এই দালালের সহিত বাজারের ভেতরে অপর একজন দালালের চুক্তি এবং দ্বিতীয় দালালের সহিত বাহিরের ক্রেতার বিক্রেতার একটি চুক্তি। অভ্যন্তরের এক দালালের সহিত অন্য দালালের যে চুক্তি হয় তাহা বাজারের বোর্ডে লেখা হয় এবং সরকারী মূল্য তালিকায় উহা মুদ্রিত হইয়া থাকে। চুক্তি সম্পাদনের দ্বিতীয় দিনে মূল্য প্রদান ও সিকিউরিটি হস্তান্তরিত হয় এবং ফাট্‌কা কারবারের ক্ষেত্রে ১৫ দিনের মধ্য নিকাশ ঘরের মারফৎ ঐ মূল্য প্রদার প্রভৃতি কাজ শেষ হইয়া থাকে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এই নিকাশ ঘরের কাজ করিয়া থাকে।

অন্যান্য কয়েকটি প্রধান প্রধান শেয়ার বাজার (Some Principal Stock Exchanges) :—

বোম্বাই শেয়ার বাজার (Bombay Stock Exchange) :—

ইহা ভারতের বৃহত্তম আগাম কারবারের বাজার। ইহা একটি সংগঠিত বাজার। ইহার পূর্বে নাম "Native and Stock Broker's Association" কিন্তু বর্তমানে ইহার নাম Indian and Share and Stock Brokers Association, ইহা কলিকাতার বাজারের ন্যায় কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধীকৃত নহে। ইহা বোম্বাইয়ের Security Control Act অনুযায়ী পরিচালিত। ইহার সভ্য সংখ্যা ৪৫১ জন; প্রয়োজনে কেরানীগণ সভ্যদের সাহায্য করিতে পারে। প্রত্যেক সভ্যকে লেনদেন করার জন্য এই বাজারে ২০,০০০ টাকা জমা রাখিতে হয়। প্রত্যেক সভ্যের মাসিক চাঁদা ৬ টাকা তাহার মধ্যে ১ টাকা দাতব্য হিসাবে দিতে হয়। যাহার জামিনের টাকা জমা রাখেন তাহাদিগকে Active সভ্য বলা হয়।

১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট এক পরিচালক মণ্ডলীর হাতে এই বাজার পরিচালনার ভার ন্যস্ত। কোন বিরোধ দেখাদিলে এই সভা তাহার বিচার করিয়া থাকে। খেলাপী অর্থ আদায়ের জন্য ৬ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি খেলাপী বোর্ড আছে এবং সভ্যদের তালিকা প্রনয়ণের জন্যও ৬ জন সভ্য বিশিষ্ট একটি তালিকা প্রস্তুত কারী কমিটি আছে।

এই বাজারে নগদ লেনদেন সাধরণত ৭ দিনের মধ্যে শেষ হয়। কিন্তু প্রয়োজনে সদস্যগণের অনুমতি লইয়া উহা ১৫ দিন পর্যন্তও চলিতে পারে। ইহাতে কোন অসুবিধা হয় না। আগাম কারবার এই বাজারে ১ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়।

তবে অনেক সময় চুক্তির ব্যাপারে দীর্ঘকাল ধরিয়া দরাদরি হইতেও দেখা যায়। এই বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে যে-টাকা আদায় করিয়া দেওয়া হয় তাহাকে **বদলা** বলে।

এই বাজারেও সিকিউরিটির মূল্য প্রদান ও উহার হস্তান্তর নিকাশ ঘর মারফৎ সম্পন্ন হয়। এখানে সব রকমের চুক্তিই মুখ্য চুক্তি শ্রেণীভুক্ত। সেজন্য দালাল ছাড়াও বাহিরের ক্রেতা-বিক্রেতা এই বাজারে চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে।

লণ্ডন শেয়ার বাজার (London Stock Exchange) :–

ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম, বৃহত্তম, সুসংগঠিত এবং গৌরবময় শেয়ার বাজার। ইহা ১৮৮৬ সালে স্বীকৃতি লাভ করে। ইহা আমেরিকান বাজার, কনসোল বাজার, প্রভৃতির সমষ্টি।

ইহা প্রথমে দুইটি কমিটি যথা "Board of Trustees and Managers" এবং "Committee for General Purposes" দ্বারা পরিচালিত হইত। কিন্তু বর্তমানে ঐ পুরাতন কমিটি তুলিয়া দিয়া ঐ বাজার পরিচালনার জন্য Council of the London Stock Exchange নামে একটি পর্ষদ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার সর্ব নিম্ন সভ্য হইতেছে ৩০ জন এবং সর্ব্বাধিক সভ্য সংখ্যা হইতেছে ৩৬ জন।

ইহা সীমাবদ্ধ কোম্পানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা একটি ঐচ্ছিক ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান মাত্র। প্রতি বৎসর নির্বাচনের মাধ্যমে সভ্য নির্বাচিত হয় এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন কমিটির দ্বারা এই বাজারের কাজ পরিচালিত হয়।

এই বাজারের সমস্ত সভ্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন, দালাল এবং সিকিউরিটি কারবারী (জবার)। দালালগণ কমিশনের ভিত্তিতে বাহিরের ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য কাজ করে। কিন্তু সিকিউরিটি কারবারী ইহা করে না। তাহারা শুধু তাহাদের নিজেদের নামে কেনা-বেচা করিয়া থাকে। বাহিরের বিক্রেতা সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে আসিলে সে ঐ সিকিউরিটির ক্রয় দর ও বিক্রয় দর উভয়ই দালালকে জানায়। ক্রয় দর বিক্রয় দর অপেক্ষা কম হইলে এই সব **জবার** দালালের সহিত চুক্তি করে। এখন দালাল প্রকৃত ক্রেতার নাম প্রকাশ করে। এই ধরনের চুক্তিকে দালালী চুক্তি বলে। এই বাজারে নগদ ও বাকি উভয় প্রকার লেনদেন হয়। এই বাকি কারবার সাধারণত ১৪ দিনের মধ্য নিষ্পত্তি হইয়া যায়। কিন্তু Consol-রা এ ব্যাপারে ১৪ দিনের জায়গায় ১ মাস সময় পায়। নিষ্পত্তি ৪ দিন পর্যন্ত থাকে।

এই লেনদেন দ্রুত নিষ্পত্তি হইবে না জের টানিবে তাহা উভয় পক্ষ স্থির করে। এই সময়কে Making up day বলে।

সিকিউরিটি ক্রয় কবিলে ক্রেতা-বিক্রেতাকে যে অর্থ বা মুদ্রা প্রদান করে তাহাকে ব্যাজ বলে। কিন্তু বিক্রেতা সিকিউরিটি সরবরাহে অক্ষম হইলে ক্রেতাকে যে অর্থ ক্ষতি পূরণ হিসাবে প্রদান করে তাহাকে হরজানা বলে। এবার দালালেবা লেনদেন নিষ্পত্তির দ্বিতীয় দিনে ক্রেতা-বিক্রেতার নাম, সিকিউরিটির মূল্য প্রভৃতি জবাবের নিকট প্রদান করে। এই দিনকে Name day বলে। এবং তৃতীয় দিনটিকে Interme-diate day বলে। কারণ, এই দিনে দলিল পত্র প্রস্তুত হয়। এবং চতুর্থ দিনকে settlement day বলে। এই দিনে মূল্য প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হয়। ব্যাজ ও হরজানা পদ্ধতি এই বাজাবে প্রচলিত থাকায় অবাধ ফাটকা কারবাব এই বাজারে চলিতে পারে না। ইহাতে সিকিউরিটির মূল্য অল্প উঠানামা করে, অর্থাৎ মোটামুটি স্থিতিশীল।

নিউইয়র্ক শেয়ারের বাজার (New York Stock Exchange) :—

ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শেয়ার বাজাব এবং ইহা Wall Streetএ অবস্থিত। Wall Streetএ অবস্থিত হওয়ার জন্য ইহাকে Wall Street বাজাব বলা হয়। ইহা খব সুসংগঠিত নহে এবং একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান।

৬০০ কারবারী প্রতিষ্ঠান, দালাল, পুঁজিপতি লইয়া ইহার সভ্যসংখ্যা প্রায় ১৫০০ জনের মত। এই সদস্যগণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিত্তশালী ও সাধু প্রকৃতির লোক। ৪২ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া "গভর্নিং কমিটি" দ্বারা ইহা পরিচালিত হয়।

এই বাজাবের একটি বৈশিষ্ট এই যে একই সদস্য কোথাও দালাল আবার কোথাও কারবারী হিসাবে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু সেজন্য একই লেনদেনে তাহারা দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না। দালালের কাজ করিলে তাহারা কমিশন বা দালালী পাইবেন আর কারবারী হইয়া কাজ কবিলে ভোগ করিবেন মুনাফা কিন্তু দুইই একত্রে নহে।

এই বাজারে একজন দালাল অপর একজন দালালের হইয়া কাজ করিতে পারেন। ইহাকে Two-Dollar-Broker পদ্ধতি বলে। আর যেসকল সদস্য শুধুমাত্র নিজেদের কাজ করিয়া থাকেন তাহাদিগকে Room-Traders বলে। ইহাতে ফাটকা কারবার চলিলেও প্রায় সমস্ত কারবার দৈনন্দিন দায় নিষ্পত্তির ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। এই বাজারে কাজের সময়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রত্যহ ১০টা হইতে ৩টা পর্যন্ত

লেনদেন সম্পাদিত হয়। ঐ সময়ের বাহিরে কেহ কাজ সম্পাদন করিলে তাহাকে ৫০ ডলার জরিমানা দিতে হয়।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের ত্রুটি দূর করার অবলম্বিত ব্যবস্থা (Steps taken to remove the defects of Indian Stock Exchange) :—

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ভারতীয় শেয়ার বাজারের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কিন্তু এই গুরুত্ব বা অবদান থাকা সত্ত্বেও ইহা আজ ত্রুটি মুক্ত নহে। দেশের আরো মঙ্গলের জন্য এই সকল ত্রুটি দূর করা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে রূপ দেওয়ার কাজ আগাইয়া চলিয়াছে। এই সকল প্রচেষ্টার মূল কথা হইতেছে শেয়ার বাজারকে দুর্নীতি বা ত্রুটি মুক্ত করা।

এই বাজারের ত্রুটি সম্বন্ধে ভারত সরকার ১৯৪৬ সালে প্রথম চিন্তা করে এবং ডাঃ পি, জি, টমাসের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে এই কমিটি তাহার সুপারিশ পেশ করেন কিন্তু তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। পরে ঐ সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫১ সালে মিঃ গোরওয়ালার নেতৃত্বে আর একটি কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে ভারতে প্রথম The Securities Contracts (Ragulation) Act পাশ হয়। এই আইনে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

(ক) প্রত্যেক শেয়ার বাজারকে কতকগুলি শর্তপালনের মধ্য দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইতে হইবে।

(খ) শেয়ার বাজারসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা থাকিবে এবং বিনিয়োগকারীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া এই ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে।

(গ) প্রত্যেক শেয়ার বাজারকে সরকারের নিকট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য পেশ করিতে হইবে।

(ঘ) সর্ব-প্রকার হিসাব পত্র প্রত্যেক শেয়ার বাজারকে রাখিতে হইবে এবং ৫ বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন হিসাব পত্রও রক্ষা করিতে হইবে। এবং প্রয়োজনে সরকারকে দেখাইতে হইবে।

(ঙ) ঐচ্ছিক কারবার (option dealings) কেহ এই বাজারে করিতে পারিবে না। এমন কি প্রয়োজনে সরকার অগ্রিম কারবারও বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

(চ) প্রত্যহ বাজারের কার্য্যকলাপ কাগজে প্রকাশ করিতে হইবে।

(ছ) এই বাজারেব সমস্ত আইন কানুন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে।

(জ) কোন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার এই বাজারেব তালিকায় তুলিতে চাহিলে বিনা কারণে তাহা সদস্যগণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

(ঝ) প্রয়োজন হইলে এই শেয়াববাজারের সমস্ত কাজ সবকার নিজ হাতে গ্রহণ করিতে পারেন।

(ঞ) এই বাজারের বিভিন্ন প্রকাব উন্নতি সাধনের জন্য Stock-Exchange Commission নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে।

(ট) ঠিকমত কাজ করিতে না পারিলে এই বাজারের সদস্যরা জরিমানা অথবা কারাদণ্ড অথবা উভয় প্রকাব শাস্তি পাইতে পাবে।

এখন উপসংহাবে আমরা বলিতে পারি যে, উক্ত বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার মাধ্যমে শেয়ার বাজারের ত্রুটি অনেকটা দূব হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাই কি সব ? অর্থাৎ, এই ব্যবস্থা দ্বাবা সকল প্রকার ত্রুটি কি শেয়ার বাজার হইতে দূর হইবে ? কারণ, পরিচালনার ত্রুটিব উপব এই আইন যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও ইহা ঐ বাজারেব কার্যকলাপের যথোচিত গুরুত্ব দিতে পারে নি। বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম, ফাট্‌কা, প্রভৃতি কারবাব ঠিকমত চালিত হইলে উহা জনকল্যাণকব, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু, উহা যদি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তাহা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে ঐ সকল কারবারের ফলে যে সকল বিপদ দেখা যায় তাহা যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে আর কাহারও আপত্তি থাকিতে পাবে না।

বিনিয়োগ ট্রাস্ট, ইহার কার্য্যাবলী ও ত্রুটি (Meaning, Functions and Defects of Investment Trust) :—

যে সকল প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র আয় বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিব নিকট হইতে ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ কবিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিত আয়ের উদ্দেশ্যে ঐ অর্থ বিনিয়োগ করে তাহাকেই **বিনিয়োগ ট্রাস্ট বলে**। উচ্চ লভ্যাংশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের লগ্নিপত্রেই সাধবণত এই ট্রাস্ট ইহাব অর্থ বিনিয়োগ করে। ইহা সাধবণত যৌথ মূলধনী কোম্পানী হিসাবে গড়িয়া উঠে। অনেক সময় ইহারা নূতন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্যও দায় গ্রহণ (underwriting) করিয়া থাকে। বিভিন্ন কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত দস্তুরি এবং বিনিয়োগের উপর লভ্যাংশই ইহার আয়। পরিচালন ব্যয় এই আয় হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ লভ্যাংশ হিসাবে বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে

ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র আয় বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই বিনিয়োগ সংস্থা সত্যই একটি কার্য্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানে খুব অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকে ; যাহারা বিনিয়োগ সম্পর্কে অত্যন্ত সুবিবেচক। ইহারা একমাত্র নিরাপদ ও লাভ-জনক প্রতিষ্ঠানেই এই ট্রাস্টের অর্থ বিনিয়োগ করে।

এই ট্রাস্ট জনগণের মনে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি করে। এই প্রকার ট্রাস্ট হইতে প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়ার আশায় সকলেই এই প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া ইহারা দেশের শিল্পোন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

এই ট্রাস্ট **বিভিন্ন প্রকারের** হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা ট্রাস্ট (Mangement Trust) ও ইউনিট ট্রাস্টই (Unit Trust) উল্লেখ যোগ্য। ব্যবস্থাপনা ট্রাস্টকে পরিবর্তনশীল ট্রাস্ট বা বিনিয়োগ কোম্পানীও বলে। এইরূপ ব্যবস্থাপনা ট্রাস্ট বিভিন্ন কোম্পানীর লগ্নীপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে তাহার ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যদিকে ইউনিট ট্রাস্টকে নির্দিষ্ট লগ্নী ট্রাস্টও (Fixed Trust) বলা হয়।

বিভিন্ন প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিলেও ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট সম্পূর্ণ **ত্রুটি মুক্ত নহে**। সে সকল ত্রুটির কথা এই ট্রাস্ট সম্পর্কে সর্বদা বলা হয় তাহার মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন, **প্রথমত** ক্ষুদ্র আয় সম্পন্ন বিনিয়োগকারীরা তাহাদের বিনিয়োজিত অর্থ এই ট্রাস্ট কোথায়, কিভাবে বিনিয়োগ করিয়া থাকে তাহা জানিতে পারে না। অনেক সময় এই ট্রাস্টের পরিচালকবৃন্দ তাহাদের নিজেদের স্বার্থে এই অর্থ ব্যবহার করিতে পারে। আর **দ্বিতীয়ত** অনেক সময় এই পরিচালকগণ সমস্ত অর্থ তাহাদের স্বার্থজড়িত কোম্পানীতে বিনিয়োগ করে। ইহাতে লভ্যাংশ কম হইতে পারে, বা বিনিয়োগ নষ্ট হইতে পারে।

ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় ৬২০টি ট্রাস্ট কোম্পানী আছে। উহাদের মধ্যে টাটা ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট, জে, কে, ইনভেস্টমেণ্ট ট্রাস্ট, দি ডালমিয়া ইনভেস্টমেণ্ট কোঃ লিঃ, দি ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইউনিট ট্রাস্টের অর্থ, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা (Meaning, Features, Merits and Demerits of Unit Trust of India) :—

একক অথবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এইরূপ ট্রাস্ট গঠিত হইতে দেখা যায়। যৌথ কোম্পানীরূপেও ইহা গঠিত হইতে পারে। ১৯৬৩ সালে ৫ই ডিসেম্বর (The

Unit Trust of India Act আইনানুযায়ী Unit Trust of India) গঠিত হয়। এবং ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই ইহার কার্য্য শুরু হয়। মূলধনের পরিমাণ প্রথমে ৫ কোটি টাকা ছিল। এই অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কর্পোরেশন, ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। একজন সদস্য বিশিষ্ট একটি পবিচালকমণ্ডলী এই ট্রাস্টের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে।

এই ট্রাস্টের **বৈশিষ্টগুলির** মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) এই প্রতিষ্ঠানকে ইহার সিকিউরিটি সার্টিফিকেটগুলি ট্রাস্ট পর্ষদের নিকট প্রদান করিতে হয়।

(২) এই ট্রাষ্ট পর্ষৎ স্থাপন বা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোন ব্যাঙ্ক বা সুপ্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ, সুপ্রতিষ্ঠিত পর্ষৎ হইলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকটা সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

(৩) এই পদ্ধতিতে প্রবর্তকগণ সর্বদাই বিনিয়োগ পরিবর্তন করিতে পারে কারণ, ট্রাষ্টিগণের হাতেই শেয়ার সার্টিফিকেট থাকে। ইহাতে কোন অসুবিধা হয় না।

(৪) প্রয়োজনে এই ট্রাষ্ট যৌথ কোম্পানী রূপেও গঠিত হইতে পারে।

(৫) এই ট্রাষ্ট জনগণের সুবিধার্থে ট্রাষ্ট সার্টিফিকেট বাজারেও বিক্রয় করিতে পারে। এবং

(৬) একক ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থ বিনিয়োগকাবী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদেব তহবিল পৃথক পৃথক করিয়া রাখিতে পারে।

সুবিধা :—এই ট্রাষ্টের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপে আলোচনা করা যাইতে পারে :—

(১) অনেক সময় এই ট্রাষ্ট ঠিকভাবে পরিচালিত না হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, প্রাপ্ত লভ্যাংশ ইহাতে কমে না।

(২) স্বল্প আয় সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান তাহাদের সামান্য অর্থ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বড় বড় কোম্পানীতে বিনিয়োগ করিতে পারে এবং নির্দ্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ ভোগ করে।

(৩) এই ট্রাষ্টে বিনিয়োজিত অর্থের উপর প্রাপ্ত আয় নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং, চিন্তার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

(৪) বিনিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তা এই প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত দৃঢ় হয়, কারণ, অর্থ নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

(৫) ট্রাষ্টী প্রতিষ্ঠান সমূহ এই ব্যবস্থায় দক্ষ ও দায়িত্বশীল হওয়ায় লগ্নীর উপর তাহাদের যথেষ্ট প্রভাব থাকে।

অসুবিধা : এই প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(১) Loading charge এর উপর ভিত্তি করিয়া উপ এককের মূল্য ইহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ইহা বাঞ্ছনীয় নয়।

(২) এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতের জন্য কিছু মজুত রাখা হয় না। সমস্ত মুনাফা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যবসায়িক সুবিবেচনার কাজ নহে।

(৩) এই ট্রাষ্ট সার্টিফিকেট কোন সংগঠিত বাজারে বিক্রয় হয় না।

(৪) লগ্নীর পরিমাণ এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট থাকায় মূলধন ও আয়েব পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পায়।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (**Short notes on**) **:—**

(ক) **বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক** (Investment Banks) **:—**

যে ব্যাঙ্ক জনগণের নিকট হইতে দীর্ঘমেয়াদী আমানত গ্রহণ করে এবং নিজেব সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে তাহাকে বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। ইহাকে শিল্প ব্যাঙ্কও বলা হয়। এই প্রকার ঋন সংগ্রহ করিয়া উহা আবার শিল্পবাণিজ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় লগ্নী করা হয়। শুধু মাত্র এই ব্যাঙ্ক জনগণের জমা টাকাব উপর নির্ভর করে না। অনেক সময় ইহাব সঞ্চিত অর্থও শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগ করিতে পারে। এই ঋণদান কার্য্য ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান অনেক সময় অনেক কোম্পানীর সিকিউবিটি বিক্রয়ের দায়ও গ্রহণ করিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার নূতন কোম্পানীতেও ইহা অর্থ বিনিয়োগ করিয়া থাকে এবং তাহাদের সিকিউরিটি বিক্রয়েব দায় গ্রহণ করিয়া থাকে এবং প্রয়োজনবোধে নূতন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দিয়াও সাহায্য করে। সংগঠনিক ও পবিচালনার বিভিন্ন প্রকার অসুবিধার জন্য এই জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রথমে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ইহা বর্তমানে আমাদেব দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিব সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কবিতেছে।

(খ) **বাস্তু নির্ম্মাণ সমিতি** (Building Society) **:—**

যৌথ মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে ইহা গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান নিজের শেয়ার. ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ অর্থ দিয়া বাড়ীঘর, রাস্তা, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে। পরে ঐ বাড়ীঘর অল্পদামে জনসাধরণের মধ্যে বিক্রয় করে। ক্রেতাদের রুচি, আয়, প্রভৃতির কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া এই প্রতিষ্ঠান গৃহ তৈয়ার করে এবং বিক্রয়

করে। দেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার গুরুত্ব এখন আর শুধুমাত্র শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ নহে। সুদূর গ্রামাঞ্চলেও ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সাধরণ লোকের পক্ষে বাড়ী তৈয়ার সম্ভব নয়। সেজন্য তাহারা সামান্য কিছু অর্থ প্রথমে প্রদান করিয়া ও বাকি অর্থ পরে কিস্তিতে প্রদান করিয়া এই সমিতির মাধ্যমে বাড়ীর মালিক হইতে পারে। কিস্তির টাকা ঠিক ভাড়ার মতই প্রদান করাও যাইতে পারে। নির্দিষ্ট সময় ও কিস্তি পরিশোধের পরে ঐ বাড়ীর মালিকানা পাওয়া যায়। সর্ব্বশেষ কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত অবশ্য বাড়ীর মালিক হওয়া যায় না। সুতরাং উপসংহারে আমরা বলিতে পারি দরিদ্রদেশে দরিদ্রলোকের নিজস্ব বাড়ী পরিকল্পনায় এই সমিতি সত্যই একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

(গ) **ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশন** (Industrial Finance Corporation) :—

অনুমোদিত ১০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া ইহা ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়। ঐ মূলধন সংগ্রহের জন্য ইহা ইহার শেয়ার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক, কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানই ইহার অন্যতম কাজ। অনেক সময় ইহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জামিনদার হিসাবেও কাজ করে। বিভিন্ন প্রকার ভারী শিল্প, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, ভিত্তিমূলক শিল্প প্রভৃতিকে ঐ প্রকার অর্থ-সাহায্য করাই ইহার অন্যতম কাজ।

মোট ২২ জন পরিচালক লইয়া ইহা গঠিত। এই পরিচালক মণ্ডলীকে সাহায্য করিবার জন্য একটি কার্য-নির্বাহক মণ্ডলী আছে। বিভিন্ন প্রকার নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ পালন করে।

এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আছে, যেমন, (১) ইহা ঋণ প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করে। (২) অনেক নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ পায় না। (৩) বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান সময় মত এই প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ পায় না। (৪) প্রদত্ত ঋণের উপর এই প্রতিষ্ঠান অত্যধিক সুদ আদায় করে।

অবশ্য ১৯৫২ সালে শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীর নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহার সুপারিশ অনুযায়ী অসুবিধা অনেক সংশোধন হইয়াছে।

(ঘ) রাজ্য শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশান (State Finance Corporation):

দীর্ঘ মেয়াদী ঋণপ্রদানের ভিত্তিতে ইহা গঠিত হয়। কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্য করা ও ঋণদান সম্পর্কে ১৯৫১ সালে এই আইন পাশ হয়। প্রায় ১৫টি রাজ্যে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রতিষ্ঠানের আদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটি টাকা।

একই সময় ইহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ২০ বৎসরের জন্য ঋণ প্রদান করিতে পারে। ইহা জনগণের নিকট হইতে ইহার আদায়ীকৃত মূলধন অপেক্ষা অধিক আমানত গ্রহণ করিতে পারে না এবং ইহার মূলধনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা হইতে ৫ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইয়া ইহা গ্যারাণ্টার হিসাবে কাজ করিতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি বিক্রয়ের দায়িত্ব ইহা গ্রহণ করে। জনগণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগ করিতে পারে।

কিন্তু ইহার কার্যে নিম্নলিখিত **ত্রুটি সমূহ** বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, যেমন,

(ক) নূতন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইহার নিকট হইতে কোন ঋণ পায় না। (খ) সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া এই প্রতিষ্ঠান ঋণদান করে। সে জন্য ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কারণ, সম্পত্তি বন্ধক রাখিলে তাহাদের অগ্রগতি অনেকাংশে হ্রাস পাইতে পারে। (গ) এই প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে উপযুক্ত ঋণ সরবরাহ করিতে পারে না এবং অনেক সময় প্রয়োজনে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে উপদেশ দিয়া সাহায্য করিতে পারে না।

(ঙ) জাতীয় শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (National Industrial Development Corporation):—

১৯৫৪ সালে অনুমোদিত ১ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত ১০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিল্প ও প্রতিষ্ঠানকে ইহা ঋণপ্রদান করিয়া থাকে। ইহার সাহায্যে রাঁচীর নিকট হাতিয়াতে একটি ভারী শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন বলিতে জনগণের নিকট হইতে গৃহীত আমানত, শেয়ার, ডিবেঞ্চার হইতে বিক্রীত অর্থ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণকে বোঝায়।

নিউজপ্রিন্ট শিল্প, পাট শিল্পের আধুনিকীকরণ, কৃত্রিম দ্রব্য উৎপাদনে ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান পাট ও বস্ত্রশিল্পের আধুনিকীকরণের জন্য প্রায় ৩৯ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভাব কমপক্ষে ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট এবং সর্বাধিক ২৫ জন সদস্যের মধ্যে গঠিত একটি বোর্ডের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। সরকারী প্রতিনিধি এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণকে লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানে ইহার ক্ষমতা অনেক কম। আশা কবা যায় নিকট ভবিষ্যতে এই অসুবিধা দূর হইবে।

(চ) **জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান** (National Small Industries Corporation) :—

স্রফ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে ঋণপ্রদানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে ইহা প্রতিষ্ঠা করে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের শুরু হইতে আরম্ভ করিয় উহার উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার কাজে ঋণপ্রদান করাই ইহার অন্যতম কাজ। ইহার মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। প্রয়োজনে ভারত-সরকারেব অনুমতি লইয়া ইহার মূলধন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

সবকারী অনুমতি সাপেক্ষে ক্ষুদ্রায়তণ প্রতিষ্ঠানেব উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহা ঋণপ্রদান করে। বৃহদায়তন শিল্পের সাহায্যকারী ক্ষুদ্রায়তণ শিল্পে উন্নতির জন্য ঋণপ্রদান করে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠাণের শেয়ার ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দায়িত্বও ইহা গ্রহণ করে।

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬৬ কোটি টাকামূল্যের পণ্য সরবরাহের জন্য সরকারী অর্ডার পাইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে কিস্তিভিত্তিক ১০ মিলিয়ন ডলারের দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ এই প্রতিষ্ঠান আমেরিকা হইতে পায়। এই প্রতিষ্ঠানেব সহায়তায় প্রায় ৫০০০ নূতন ক্ষুদ্রশিল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ছ) **শিল্পঋণ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান** (Industrial Credit and Investment Corporation) :—

১৯৫৮ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আমেরিকার সহায়তায় ভারত-সরকার এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। দেশের শিল্পের উন্নতি ও সম্প্রসারণই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা। ইহার মোট বিলিকৃত অর্থ জনগণের নিকট হইতে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ বিনিময় ব্যাঙ্ক, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

১১ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালকমণ্ডলী ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে। বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন, উহাদের পরিচালনা, সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ, ব্যক্তিগত মালিকানার সম্প্রসারণ, দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপ্রদান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্যারাণ্টার হিসাবে কাজ করা, শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে উপদেশ প্রদান, প্রভৃতি ইহার অন্যতম কাজ।

ইহা বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ১ কোটি ডলার ও P. L. 480 চুক্তিতে আমেরিকা হইতে প্রায় ১০ কোটি টাকা ঋণ পায়। ইহা ছাড়াও অন্যান্য উৎস হইতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করিয়াছে।

চিনি, বস্ত্র, রাসায়নিক শিল্প, ঔষধ, সিমেণ্ট, প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠান হইতে আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩০০টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৪৫ কোটি টাকা ঋণপ্রদান করিয়াছে। ইহা ছাড়াও যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকির পরিমাণ খুব বেশী, সে সকল প্রতিষ্ঠানকেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণ ঋণপ্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।

(জ) **পুনঃ ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান** (Re-Finance Corporation) :—

মাঝারি শিল্পকে ঋণপ্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। যৌথ কোম্পানীর ভিত্তিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা। এই অর্থের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, কিছু জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ৩ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে ঋণপ্রদান করিয়া থাকে এবং সর্বাধিক পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইহা ঋণ দিতে পারে। ২ কোটি টাকার উর্দ্ধে মূলধন সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানকে ইহা ঋণ দিতে পারে না। কেবলমাত্র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত শিল্প-প্রতিষ্ঠানই ইহা হইতে ঋণ পাইতে পারিবে। এই প্রতিষ্ঠান অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান এর নিকট হইতে ঋণের উপর শতকরা ১ টাকা হইতে ১-৫০ পঃ সুদ আদায় করিতে পারিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা, ও শেয়ার হোল্ডারগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি কমিটি ইহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছে। ইহার কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান ভারত-সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র কারিগরী কমিশনের নিকট আবেদন জানাইয়াছে।

ভারতীয় টাকার বাজারের অর্থ ও ইহার বৈশিষ্ট্য (Meaning and Features of Indian Money Market) :—

যে সকল উৎস হইতে বিভিন্ন সময় শিল্পের ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদী ঋণ পাওয়া যায় তাহাদিগকে একত্রে ভারতীয় টাকার বাজার বলে। প্রধানত শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদানই এই বাজারের অন্যতম কাজ।

এই বাজারের বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(১) দুই প্রকার টাকার বাজার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটি সুসংগঠিত আর অপরটি অসংগঠিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, শিল্পব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই সুসংগঠিত বাজারের অন্তর্গত। অপরদিকে মহাজন শ্রেণীকে লইয়া অসংগঠিত বাজার প্রতিষ্ঠিত। সুসংগঠিত বাজার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে অসংগঠিত বাজার ইহার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে।

(২) এই দুই প্রকার বাজার থাকার জন্য ভারতীয় টাকার বাজারে বিভিন্ন সুদে টাকা পয়সার লেনদেন হইতে দেখা যায়।

(৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও ভারতের টাকার বাজারে কোন উন্নত শ্রেণীর বিলবাজার গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

(৪) ভারতীয় টাকার বাজার এখনও গ্রামাঞ্চলে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কার্যাবলী শুধু মাত্র শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলিবার প্রচেষ্টা করিলেও এখনও প্রয়োজনীয় বা আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারে নাই।

(৫) উন্নত দেশের মত ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা উন্নত নহে। এখানে মাথাপিছু আমানতের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প।

(৬) ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গতি খুব কম। কারণ, বাজারে ইহার এখনও সুসংবদ্ধভাবে ব্যাপক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। একারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট রি-ডিসকাউন্ট সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়।

(৭) বৈদেশিক প্রভাবও এই ভারতীয় ব্যাঙ্ক বাজারে কম নহে। বৈদেশিক ব্যাঙ্কসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রায় একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করিয়াছে এবং ইহা আভ্যন্তরীণ বাজারেও প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট হইতে বলা যায় যে ভারতীয় টাকার বাজারে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা রহিয়াছে। সুসংগঠিত টাকার বাজার ভিন্ন অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না।

সে জন্য ভারতীয় টাকার বাজারকে সুসংগঠিত-করা একান্ত প্রয়োজন। আর বৈদেশিক প্রভাব যাহাতে ভারতীয় টাকার বাজারে আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে সে দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় টাকার বাজারের প্রধান প্রধান সদস্যবৃন্দ (Chief Constitutions of the Indian Money Market) :—

নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান সদস্যগণকে লইয়া ভারতীয় টাকার বাজার গঠিত :—

(১) **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক** (Reserve Bank) :—

সমস্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কের শীর্ষে এই ব্যাঙ্ক অবস্থিত। ইহা ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। বাজারের টাকার মূল্যমান বজায় রাখার দায়িত্ব এই ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহা দেশের টাকা-কড়ির বাজারকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রন করে যাহাতে অর্থ নৈতিক উন্নতি ব্যাহত না হয়। দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রামূল্য স্থির রাখা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাজ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজ ইহাকে করিতে হয়।

উপরোক্ত কাজসমূহ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক **নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন** করিয়া থাকে :

(ক) ইহা দেশের কাগজীমুদ্রার প্রচলন তদারকী করে। ধাতব মুদ্রাও এই ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করে। এই মুদ্রার উপর মূল্যস্তর নির্ভর করে, সেজন্য প্রয়োজনে মুদ্রা সংকোচ ও মুদ্রাবৃদ্ধি দ্বারা এই ব্যাঙ্ক দেশের মূল্যস্তর ঠিক রাখিতে চেষ্টা করে।

(খ) ঋণ ও মুদ্রা দুইটি কথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ঋণ ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব না দিয়া মুদ্রা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান অর্থহীন। সেজন্য দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণও এই ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দুই প্রকারে করিয়া থাকে, যেমন বাট্টার হার পরিবর্তন করিয়া এবং কোম্পানীর কাগজ বাজারে বিক্রয় করিয়া। যখন মুদ্রা সংকোচনের দরকার হয় সেই সময় এই ব্যাঙ্ক বাট্টার হার বৃদ্ধি করে এবং বাজারে কাগজ বিক্রয়ের দ্বারা বাজার হইতে টাকা তুলিয়া লয়। ইহাতে মুদ্রাসংকোচন সম্ভব হয়। ইহা ছাড়াও বর্তমানে অন্যান্য পদ্ধতির দ্বারাও এই ঋণ সংকোচন করিতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত দুইটি বিষয় খুব মূল্যবান পদ্ধতি।

(গ) ইহা সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে এবং প্রয়োজনে সরকারকে স্বল্প মেয়াদী ঋণও ইহা দিয়া থাকে।

(ঘ) এই ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং হাউসের কাজও করিয়া থাকে ইহাতে টাকার বাজারের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

(ঙ) বৈদেশিক মুদ্রার সহিত দেশের মুদ্রার পরিবর্তন হার নির্ণয়ও ইহার অন্যতম কাজ। বৈদেশিক বাণিজ্যেব ক্ষেত্রেও ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবিতে হয়।

(চ) কৃষি, শিল্প, প্রভৃতি খাতে অনেক সময় ইহা ঋণ যোগান দেয়। কৃষির ব্যাপারে ইহার একটি পৃথক বিভাগ আছে।

(ছ) দেশেব অর্থনৈতিক বিভিন্ন ব্যাপারেও ইহা সরকারকে পরামর্শ প্রদান কবিয়া থাকে।

(২) **ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক** (State Bank of India) :—

বিশেষ প্রয়োজনে ও আইনেব বলে এই ব্যাঙ্কটিকে সরকার বিধিবদ্ধ ব্যাঙ্কেব তালিকায় রাখিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ঋণদান ও শিল্পের প্রসার ঘটানোই ইহার প্রধান কাজ। সেজন্য গ্রামাঞ্চলে ইহার প্রচুব শাখা দেখা যায়। যে সকল গ্রামাঞ্চলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন শাখা নাই, সেখানে ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদন করে। ফলে গ্রামের লোকেদেব ঋণ পাইতে কোন অসুবিধা হয় না।

১৯৫৫ সালে ১লা জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে বিশেষ আইন বলে স্টেট ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত, করা হইয়াছে। সেজন্য এই ব্যাঙ্কটিকে আমরা এখন সবকারী ব্যাঙ্ক বলিতে পাবি। যে সকল বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা কবা হইয়াছিল তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইহাকে আমরা স্টেট ব্যাঙ্কের **কার্যাবলী**ও বলিতে পাবি :—

(ক) ইহা শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া থাকে।

(খ) গ্রামীন অর্থনীতিকে উন্নয়ন করাও ইহার অন্যতম কাজ। সেজন্য ইহা প্রতি বৎসব শাখা খুলিযা চলিয়াছে। ১৯৬৯ সালের মধ্যে ইহা প্রায় ৪০০ শত শাখা অফিস গ্রামাঞ্চলে খুলিবার প্রস্তাব গ্রহণ কবিয়াছিল।

(গ) বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থাও ইহা করিয়া থাকে। এই কারণে কেন্দ্রীয় গুদামঘরের শেয়ারও ইহা ক্রয় করিয়াছে।

(ঘ) জমি বন্ধকী ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও ইহা যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে ইহা দ্বারা দেশের অর্থনীতি উন্নত হয়।

(ঙ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ঋণদ্বারা উন্নতি সাধনও ইহার অন্যতম কাজ। এই ব্যাপারে এই ব্যাঙ্ক ১৯৫৬ সালে একটি (Pilot Scheme) গ্রহণ কবে। ইহা দ্বারা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি সহজেই এই ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পাইতে পারিবে।

(চ) যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন শাখা নাই তথায় ইহা ঐ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

(ছ) ইহা বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং টাকার বাজারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যাঙ্ক হইতেও টাকা ধার করিতে পারে।

(৩) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক** (Commercial Bank) :—

তফসিল এবং অতফসিল এই দুই প্রকার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দেখা যায়। যে সকল ব্যাঙ্কের নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকায় আছে তাহাদিগকে তফসিল ব্যাঙ্ক বলে ; আর যাহাদের নাম এই তালিকায় থাকে না তাহাদের অতফসিল ব্যাঙ্ক বলে। ৫ লক্ষ টাকা মূলধন হইলে এই ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত হইতে পারে। এইরূপ তালিকাভুক্ত হইলে ইহাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ইহার **আমানতের** শতকরা **৩ ভাগ** জমা রাখিতে হয়। সংক্ষেপে ইহাদের **কার্যাবলী** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(ক) জনগণের নিকট হইতে ইহারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার আমানত গ্রহণ করে।

(খ) ইহারা শিল্প বাণিজ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া উহাদিগকে সাহায্য করে।

(গ) ইহারা দেশের অর্থনীতিকে আরও উন্নত করিতে সাহায্য করে।

(ঘ) এই ব্যাঙ্ক সরাসরি ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দিতে পারে এবং টাকা ধার দিয়া অনেক ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে অর্থ সৃষ্টি করিতে পারে।

(ঙ) জনগণের বিভিন্ন সম্পত্তি নিরাপদে রাখার দায়িত্ব পালন করে এবং ব্যাঙ্ক অপরের সম্পত্তির অছি (Trustee) হিসাবেও কাজ করে।

(চ) আমানতকারীদের হইয়া ইহা অন্যান্য কাজ করে, যেমন, লভ্যাংশের টাকা আদায়, বিল-চেক প্রভৃতি আদায়, শেয়ার বিক্রয়, প্রভৃতি।

(৪) **বিনিময় ব্যাঙ্ক** (Exchange Banks) :—

এই ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপার লইয়াই বেশী ব্যস্ত থাকে। ইহা রপ্তানীকারীর নিকট বাণিজ্যিক হুণ্ডি ক্রয় করে এবং অন্য ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয় অথবা আমদানীকারকের নিকট হইতে ঐ অর্থ আদায় করিয়া লয়। এই হুণ্ডির বাট্টাই এই ব্যাঙ্কের প্রধান আয়। ইহা আগাম কারবারেও টাকা ধার দিতে পারে। ভারতীয় বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলিও এই ধার দেওয়ার কাজ করিতে পারে কিন্তু ইহাদের আমানতের স্বল্পতার জন্য বিনিময় ব্যাঙ্কের সহিত

প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। ফলে এই বিনিময় ব্যাঙ্ক একচেটিয়াভাবে কারবার করিয়া চলিয়াছে।

(৫) **শিল্পব্যাঙ্ক** (Industrial Banks) :—

বিভিন্ন শিল্পে ইহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এবং দীর্ঘমেয়াদী আমানতও গ্রহণ করে। ইহার মূলধনের পরিমাণও যথেষ্ট। সেজন্য জনগণের আমানতের টাকা ছাড়াও এই ব্যাঙ্ক নিজের মূলধন হইতেই যথেষ্ট ঋণ প্রদান করে। এইজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আমাদের দেশে অত্যন্ত কম। সরকার এই প্রকার প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বা উন্নতিতে যথেষ্ট আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইনান্স করপোরেশান, স্টেট ফাইনান্স করপোরেশন, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) **কৃষি ব্যাঙ্ক** (Agricultural Banks) :—

অল্প সুদে কৃষকদিগকে ঋণপ্রদানই এই ব্যাঙ্কের অন্যতম কাজ। শুধুমাত্র ঋণপ্রদান নয়, দরিদ্র কৃষককে তাহার ঋণ হইতে মুক্ত করিবার জন্যও ইহা কাজ করিয়া থাকে। এই কৃষকগণ মহাজন দ্বারা সর্বদা পীড়িত। কারণ, মহাজন শ্রেণীর লোক তাহাদের উপর অধিক সুদ চাপাইয়া দেয় এরই ফলে চতুর মহাজন শ্রেণী তাহাদের নিকট হইতে কমদামে সমস্ত ফসল লইয়া লয়। ইহাতে কৃষকগণ আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। সেজন্য এই দরিদ্র কৃষকগণকে একমাত্র এই কৃষি ব্যাঙ্কই রক্ষা করিতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এই ব্যাঙ্ক এখনও বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে এই কাজ করিতে দেখা যায়। তথাপি ইহা যথেষ্ট নহে। কারণ, ইহা উপযুক্ত সার, বীজ, লাঙ্গল, বলদ, প্রভৃতি কৃষকদিগকে সরবরাহ করিতে পারে না। সম্প্রতি সরকার এই কৃষি ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে। আশা করা যায় নিকট ভবিষ্যতে এই ব্যাঙ্ক আরও উন্নত হইবে এবং অধিক পরিমাণে কাজ করিতে পারিবে।

(৭) **সমবায় ব্যাঙ্ক** (Co-operative Banks) :—

এই ব্যাঙ্ক স্বল্প মেয়াদের ভিত্তিতে কৃষকদিগকে ঋণ দিয়া থাকে। জনগণের নিকট হইতে ইহা আমানতগ্রহণ করে। ঐ টাকা অল্পসুদে কৃষকদিগকে ঋণ হিসাবে দেয়। শহর ও গ্রামাঞ্চলে এই ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার প্রতিষ্ঠান দ্বারা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষক, শিল্পী প্রভৃতি উপকৃত হয়। কারণ তাহারা অল্প সুদে ঋণ পাইয়া থাকে। ঠিকভাবে এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইলে দেশের অর্থনীতিতে ইহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

(৮) **ভূমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক** (Land Mortgage Banks) :—

কৃষকগণকে ইহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করে। ইহা কৃষকের জমি বন্ধক রাখিয়া তাহার উন্নতি সাধন দ্বারা অধিক ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে। সরকারের নিকট ইহা ঋণপত্র বিক্রয় করে এবং জনগণের নিকট হইতেও আমানত গ্রহণ করে। কৃষকদের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন, কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্ক তাহা দিতে পারে না। সেজন্য এই ভূমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। এই প্রকার ব্যাঙ্কের অধিক পরিমাণ অগ্রগতি একান্ত প্রয়োজন। এই ব্যাঙ্কের টাকা নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, জমি বন্ধক রাখিয়াই এই ব্যাঙ্ক ঋণপ্রদান করে। যতদিন আমাদের দেশে এই প্রকার ব্যাঙ্কের উন্নতি না হইবে ততদিন কৃষকগণকে অসুবিধার মধ্যে দিনপাত করিতে হইবে।

(৯) **সাধারণ আমানত** (Public Deposits) :—

জনগণের নিকট হইতেও অনেক কোম্পানী আমানত গ্রহণ করিয়া তাহাদের কারবার পরিচালনা করে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহা পরিষ্কার হইবে। বোম্বাই, আমেদাবাদ, প্রভৃতি অঞ্চলে এই প্রকার সাধারণ আমাণত যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থের কিছুটা অসুবিধা দূর হয়।

(১০) **ঋণদান কোম্পানী** (Loan Companies) :—

ক্ষুদ্রায়তণ শিল্পে ইহারা ঋণদান করে। পূর্ব্বে বিভিন্ন চা বাগানের উন্নতিতে ইহাদের অবদান যথেষ্ট থাকিলেও বর্তমানে ইহাদের গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ফলে, অনেক ঋণদান কোম্পানী বর্তমানে বন্ধ হইয়াও গিয়াছে।

(১১) **দেশীয় ব্যাঙ্কার** (Indigenous Bankers) :—

সালুকার মহাজন প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। গ্রামাঞ্চলে এখনও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। করিলেও ঋণ পাইতে হইলে বিভিন্ন প্রকার নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে হয়। সেজন্য দরিদ্র কৃষকেরা ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর না করিয়া এই মহাজন শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অর্থ ঋণ লয়। বর্তমানে ভারতীয় টাকার বাজারের প্রায় অর্দ্ধাংশ ইহাদের নিয়ন্ত্রনাধীন। ইহারা ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পে স্বল্প-মেয়াদী ঋণপ্রদান করিয়া থাকে।

ভারতীয় টাকার বাজারের প্রধান প্রধান সদস্যবৃন্দ বলিতে উপরোক্ত সদস্যগণকেই বুঝাইয়া থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ জাতীয়করণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

(Arguments for and against Nationalisation of Commercial Banks) :—

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আমাদের দেশে নতুন নহে। ১৯৪৮ সালে আমাদের দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ কবা হইয়াছিল। ইহাব পরে ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ কবা হয়। এবং ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ১৪টি বড় বড বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হয়। এই ১৪টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণেব স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখান যাইতে পাবে :

স্বপক্ষে যুক্তি :

(১) এইরূপ জাতীয়কবণ পদ্ধতি দেশের অর্থনীতিকে আরও দৃঢ় করিবে। ফলে ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া অনেকাংশে বন্ধ হইবে। জমানো টাকা নষ্ট হওয়াব কোন সম্ভাবনা থাকিবে না এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা আসিবে এবং কাজেবও অনেক উন্নতি হইবে।

(২) দেশের টাকাকড়ি ও অর্থ-ব্যবস্থাকে আবও সুদৃঢ় করিতে হইলে এইরূপ জাতীয়করণ অপরিহার্য্য।

(৩) অর্থ নৈতিক ধাঁচে সমাজ গঠন ও সামাজিক বৈষম্যদূর কবিতে এইরূপ ব্যাঙ্ক জাতীয়কবণ একান্ত দরকাব।

(৪) বিভিন্ন পরিকল্পনাব মাধ্যমে দেশের উন্নতিতে প্রচুব অর্থেব দরকাব। যদি ব্যাঙ্ক জাতীকরণ করা যায় তবে উহাব আমানত ও মুনাফা সরকাবের হাতে আসিবে এবং ঐ অর্থ প্রয়োজন হইলে সরকার বিভিন্ন পবিকল্পনার কাজে লাগাইতে পাবিবে।

(৫) ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সহিত ভারতীয় শিল্পপতিদের যোগাযোগ বন্ধ করিতে হইলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ একান্ত দরকাব। ইহা না হইলে অর্থ নৈতিক উন্নতি কঠিন হইয়া পড়ে।

(৬) ব্যাঙ্ক হইতে অনেকে ঋণ গ্রহণ করিয়া ফাটকা কারবাব করে। এই প্রকার কারবারের ফলে মুদ্রাস্তর প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। ইহা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেজন্য ফাটকা কারবার বন্ধ করিতে হইলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ একান্ত প্রয়োজন।

(৭) ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দ্বারা প্রয়োজনীয় শিল্পে উপযুক্ত ঋণপ্রদান করা যায়। ইহাতে দেশের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ আরও দৃঢ় হয়।

বিপক্ষে যুক্তি :

(১) প্রতিটি সরকারী অফিস যেমন লালফিতার দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত নহে ; তেমনি এই জাতীয়করণও সরকারী লালফিতার দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না। ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রতিহত হইবে।

(২) জাতীয়করণ দ্বারা আমাণতকারীর বিশ্বাস কমিয়া যাইবে কারণ তাহাদের জমা টাকার পরিমাণ সরকার বুঝিতে পাইবে এবং আযকরের ব্যাপারে আমানতকারীরা অসন্তুষ্ট হইবে।

(৩) ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করিতে হইলে প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এমনিতেই সরকারের অবস্থা খারাপ। ইহার উপর যদি প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাহা হইলে দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি ব্যাহত হইবে। সুতরাং ক্ষতিপূরণ দেওয়া সত্যই কষ্টকর ব্যাপার।

(৪) জাতীয়করণের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, এমনিতেই সকল ব্যাঙ্কের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যথেষ্ট কর্তৃত্ব আছে। সুতরাং জাতীয়করণ না করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কতৃত্বকে আরও একটু দৃঢভাবে পরিচালনা করিতে পারিলে তাহাই যথেষ্ট হইত।

(৫) ভারতবর্ষে মিশ্রঅর্থনীতি ব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত যদি সকল প্রতিষ্ঠানই জাতীয়করণ করিয়া লওয়া হয় তবে তাহাতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ নিকৎসাহ হইয়া পড়িবে। সুতরাং জাতীয়করণ আদৌ উচিৎ হয় নাই।

(৬) সরকার ইচ্ছা করিলে জাতীয়করণ ছাড়াও সকল ব্যাঙ্কের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিতে পারে। এই জাতীয়করণ সে স্থানে কোন দরকারই হয় না। সুতরাং জাতীয়করণ অর্থহীন। এবং

(৭) আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের উপ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কিছুদিন পূর্বে কার্যকরী করা হইয়াছে। ইহার ফলাফল না দেখিয়াই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা আদৌ উচিৎ হয় নাই।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল (Negotiable Instruments) :—

ভারতীয় হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনে বলা হইয়াছে যে, "নির্দেশমত ব্যক্তি অথবা বাহককে প্রদেয় হ্যাণ্ড নোট, প্রমিসারি নোট, চেক এবং বাণিজ্যিক হুণ্ডিই হস্তান্তরযোগ্য দলিল।" এই সকল দলিল টাকায় পরিবর্তন করা যায়। ঋণের স্বীকৃতি হিসাবে টাকা পয়সার পরিবর্তে এই সকল দলিল ব্যবহার করা হয়।

এই প্রকার দলিলের তিনটি বৈশিষ্ট দেখা যায় যেমন :—

(ক) ধারক এই দলিলের অর্থ আদায় করিবার জন্য আদালতের সাহায্য লইতে পারে।

(খ) ইহা হস্তান্তর করিয়া ঋণ পরিশোধ করা যায়, এবং

(গ) কোন কিছুর বিনিময়ে ধারক বা মালিক ইহা অর্জন করে।

চেকের অর্থ ও শ্রেণীবিভাগ (Meaning and Classification of Cheques) :—

ব্যাঙ্ক উপরে নির্দিষ্ট অর্থ-প্রদানের আদেশকেই চেক বলিতে পারি। কোন আমানতকারী যখন অন্য কাহাকেও অর্থ প্রদানের জন্য ব্যাঙ্কের উপর টাকা প্রদানের জন্য লিখিত কোন আদেশ প্রদান করে তখন তাহাকে চেক বলে। যে সকল বিভিন্ন-প্রকার চেক আমরা দেখিতে পাই তাহা নিম্নরূপে আলোচনা করা যায় :—

(ক) **বাহক চেক** (Bearer cheque) :—

বাহককে কোন অর্থ-প্রদানের আদেশ দিয়া ব্যাঙ্কের উপর যে চেক কাটিয়া দেওয়া হয় তাহাকে বাহক-প্রদেয় চেক বলে।

(খ) **আদেশবহ চেক** (Order cheque) :—

চেকের উপর লিখিত ব্যক্তি বা তাহার আদেশমত কাহাকেও অর্থ-প্রদানের জন্য চেক কাটিয়া দিলে তাহাকে আদেশবহ চেক বলে।

(গ) **আড়ি চেক** (Crossed cheque) :—

যখন কোন চেকের উপর দুইটি সমান্তরাল দাগ বা আড়ি টানিয়া দেওয়া হয় তখন তাহাকে আড়ি চেক বলে। ইহাতে কেউ ঐ চেকের টাকা কাউণ্টার হইতে ভাঙ্গাইতে পারে না।

(ঘ) **বাসি চেক** (Stab cheque) :—

নির্দিষ্ট একটি সময় পরে চেকের আর মূল্য থাকে না। যেমন, চেক লিখিবার তারিখ হইতে ৬ মাস পর্যন্ত সেভিংস ব্যাঙ্কের চেকের মূল্য থাকে কিন্তু উহার পরে তাহার আর কোন দাম থাকে না। সেজন্য ঐ সময় পরে ঐ চেককে বাসি চেক বলে।

(ঙ) **ফেরতা চেক** (Dishonoured cheque) :—

কোন কারণে চেকে লিখিত অর্থ-প্রদান করা না হইলে তাহাকে ফেরতা চেক বলে।

(চ) **ভবিষ্যৎ দেয় চেক** (Post-dated cheque) :—

যদি কোন চেক ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য আজ ইস্যু করিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাকে ভবিষ্যৎ দেয় চেক বলে। যেমন, মনে করা যাক, আজ আমরা একটা ৫০০ টাকার চেক ইস্যু করিলাম। কিন্তু ইস্যুর দিন আজকের তারিখ না দিয়া ৩ মাস পরের একটি তারিখ দিলাম। তাহা হইলে এই চেকটিকে ভবিষ্যৎ দেয় চেক বলে।

(ছ) **খোলা চেক** (Open cheque) :—

যে চেকের টাকা ব্যাঙ্ক হইতে সহজে তোলা যায় অথবা আড়ি থাকিলে তাহা তুলিয়া উহার টাকা পাওয়া যায় তাহাকে খোলা বা সাদা চেক বলে।

চেকের **বৈশিষ্ট্যসমূহ :—**

(১) ইহা দ্বারা সব সময় টাকা প্রদানের আদেশকে বোঝায়।

(২) প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ অংকে ও ভাষায় লেখা থাকে।

(৩) আমানতকারী নিজের নামেও এই চেক কাটিতে পারে।

(৪) আমানতকারী ভিন্ন কেহ চেক কাটিতে পারে না। এবং

(৫) প্রতিটি চেকের নীচে আমানতকারীকে সহি করিয়া দিতে হয়।

বাণিজ্যিক হুণ্ডির অর্থ, প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট, পক্ষ এবং সুবিধা (Meaning, Classification, Features, Parties and Merits of Bills of Exchange) :—

বাণিজ্যিক হুণ্ডির সংজ্ঞা ভারতীয় **হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ৫নং ধারায়** নিম্নরূপে দেওয়া হইয়াছে।

"লেখক প্রদত্ত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তাহার আদেশমত কিংবা উহার বাহককে, একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-প্রদানের জন্য একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রদত্ত, শর্তহীন লিখিত আদেশ পত্রকে **বাণিজ্যিক হুণ্ডি বলে।**

এই হুণ্ডি **দুই প্রকারের** দেখা যায় যেমন, (ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হুণ্ডি এবং (খ) বৈদেশিক বাণিজ্য হুণ্ডি।

যে সকল হুণ্ডির লিখন এবং উহার পরিশোধ একই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহাকে **আভ্যন্তরীণ হুণ্ডি বলে**। আর যে সকল হুণ্ডির লেখন ও পরিশোধ একই দেশের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে না তাহাকে **বৈদেশিক বাণিজ্য হুণ্ডি বলে**।

বাণিজ্যিক হুণ্ডির নিম্নলিখিত **বৈশিষ্টসমূহ** দেখা যায় :—

(১) ইহা সর্বদাই লিখিত দলিল।

(২) এই হুণ্ডিতে পরিষ্কারভাবে তারিখ লেখা থাকিবে। অন্যথায় ইহা মূল্যহীন।

(৩) এই হুণ্ডির মেয়াদকালও পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

(৪) ইহা কোন নির্দিষ্ট দিনে, স্থানে কিংবা চাওয়া মাত্র পরিশোধ্য হইবে।

(৫) ইহা শর্তহীন আদেশ হইতে হইবে।

(৬) প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ অংকে এবং কথায় লিখিতে হইবে।

(৭) প্রদত্ত অর্থ কোন ব্যক্তি বা বাহকের নিকট প্রদত্ত হইতে পারে।

(৮) অর্থ-প্রদানের আজ্ঞাকারীকে ইহাতে সহি করিতে হইবে।

(৯) ইহাতে একজন আজ্ঞা কারক থাকেন। তিনিই পাওনাদার।

(১০) ইহাতে একজন দায়ক থাকেন। তিনিই দেনাদার।

এই বাণিজ্যিক হুণ্ডির বিভিন্ন **পক্ষগুলি** নিম্নরূপ হয়।

এই হুণ্ডিতে **তিনটি** পক্ষ থাকিতে পারে যেমন :—

(ক) **হুণ্ডিকার**—ইনি এই হুণ্ডি প্রস্তুত করেন।

(খ) **হুণ্ডিগ্রাহক**—ইনি এই হুণ্ডিতে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং

(গ) **প্রাপক**—হুণ্ডিতে লিখিত অর্থ যাহাকে প্রদানের আদেশ দেওয়া হয় তাহাকে প্রাপক বলে।

বাণিজ্যিক হুণ্ডির **সুবিধাগুলি** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(১) ব্যবসাদারের মধ্যে ইহা ঋণ সম্প্রসারণে সাহায্য করে।

(২) হস্তান্তর যোগ্য দলিল বলিয়া ইহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়।

(৩) ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণপত্র। কারণ, হুণ্ডিগ্রাহক দ্বারা ইহা স্বীকৃত।

(৪) আন্তর্জাতিক বাজারেও ইহার গুরুত্ব অশেষ। কারণ, ইহা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং ঋণ পরিশোধ করা যায়।

(৫) প্রয়োজনে মেয়াদ পূর্ত্তির আগেই ইহা ব্যাঙ্কের নিকট ভাঙ্গাইয়া অর্থ-সংগ্রহ করা যায়। ইহাতে বাণিজ্যের স্থিরতা আসে। এবং

(৬) কারবারীরা অনেক সময় উপযোজক হুণ্ডির সাহায্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণও সংগ্রহ করিতে পারে।

চেক ও বাণিজ্যিক হুণ্ডির মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a cheque and a Bill of Exchange) :—

চেক	বাণিজ্য হুণ্ডি
(১) চেক সব সময় ব্যাঙ্কের উপর কাটিতে হয়।	(১) ইহা সাধরণত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর কাটিতে হয়।
(২) আমানতকারীকে ছাপানো ফর্মে লেখা চেক ব্যাঙ্ক সরবরাহ করে।	(২) ইহা যে কোন কাগজে লিখিত হয়। ছাপানোর দরকার হয় না।
(৩) ইহাতে স্বীকৃতির দরকার হয় না।	(৩) ইহাতে স্বীকৃতি একান্ত দরকার। স্বীকৃতি না থাকিলে ইহার কোন মূল্য নাই।
(৪) রেয়াতি দিন বলিয়া কোন কিছু ইহাতে থাকে না।	(৪) রেয়াতি দিনের জন্য ইহাতে ততদিন সময় থাকে।
(৫) চাহিবা মাত্র ব্যাঙ্ক ইহা পরিশোধ করিয়া দেয়।	(৫) ইহার অর্থ চাহিবামাত্র প্রদত্ত অথবা নির্দিষ্ট সময় অন্তে প্রদত্ত হইতে পারে।
(৬) আমানতকারীই ইহা ব্যাঙ্কের উপর লিখিয়া থাকে।	(৬) আমানতকারী ইহা লেখে না। পাওনাদারই ইহা লিখিয়া থাকে।
(৭) ইহাতে কোন স্ট্যাম্প দরকার হয় না।	(৭) ইহাতে স্ট্যাম্প দরকার। অন্যথায় ইহার কোন মূল্য থাকে না।
(৮) দেশী অথবা বিদেশী ক্ষেত্রে ইহা একখানাই কাটা যায়।	(৮) বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইহা তিনখানা কাটিতে হয়।
(৯) ইহা দেনাদার দ্বারা পাওনাদারকে অর্থ-প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রমান পত্র।	(৯) ইহা উত্তমর্ণ লিখিয়া থাকে এবং অধমর্ণ উহাতে স্বীকৃতি প্রদান করে।
(১০) ইহা ইস্যু করিতে হইলে ব্যাঙ্কে টাকা থাকা একান্ত দরকার অন্যথায় ইহা মূল্যহীন।	(১০) ইহা ইস্যু করিতে ব্যাঙ্কে কোন টাকা থাকার দরকার হয় না।

প্রত্যর্থ পত্র (Promissory Note) :—

নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অথবা তাহার আদেশমত অন্য কোন ব্যক্তিকে অথবা বাহককে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে চাহিবামাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদানের লিখিত অঙ্গীকারপত্রকে **প্রত্যর্থ পত্র** বলে। যেমন,

> স্ট্যাম্প
>
> কলিকাতা।
>
> ৫০০০ টাকা।
>
> ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৫
>
> মূল্য প্রাপ্তির বিনিময়ে চাহিবামাত্র আমি শ্রীগদাধর বসুকে অথবা তাঁহার আদিষ্ট ব্যক্তিকে পাঁচহাজার টাকা কলিকাতায় পরিশোধ করিবার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হইলাম।
>
> শ্রীগোপাল রায়

বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও অঙ্গীকার পত্রের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Bill of Exchange and a Promissory Note) :—

বাণিজ্যিক হুণ্ডি	অঙ্গীকার পত্র
(১) ইহা হইতে টাকা প্রদানের আদেশ বোঝায়।	(১) ইহা টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার পত্র।
(২) যিনি এটা লেখেন তিনি পাওনাদার।	(২) ইহার লেখক দেনাদার।
(৩) স্বীকৃতি হইতে একান্ত দরকার। ইহাতে স্বীকৃতি না থাকিলে ইহার কোন মূল্য নাই।	(৩) ইহার কোন স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। টাকা পরিশোধের অঙ্গীকারই ইহার স্বীকৃতি।
(৪) আজ্ঞাকারক, স্বীকারক এবং প্রাপক এই তিনটি পক্ষ ইহাতে থাকে।	(৪) অঙ্গীকারী ও প্রাপক এই দুইটি পক্ষ ইহাতে থাকে।
(৫) বৈদেশিক হুণ্ডির ক্ষেত্রে ইহা একাধিক প্রস্থে প্রস্তুত করিতে হয়।	(৫) ইহা একপ্রস্থই প্রস্তুত করিতে হয়।
(৬) ইহাতে স্ট্যাম্প লইতে হয় কিন্তু ইহার হার অঙ্গীকার পত্র হইতে পৃথক।	(৬) ইহাতে যে স্ট্যাম্প লাগাইতে হয় তাহার হার বাণিজ্যিক হুণ্ডির স্ট্যাম্পের হার হইতে পৃথক।
(৭) কোন কারণে ইহা ফেরৎ হইলে আপত্তি জানাইতে হয়।	(৭) কোন কারণে ইহা ফেরত হইলে কোন আপত্তি জানানোর দরকার হয় না।

চেক ও অঙ্গীকার পত্রের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Cheque and a promissory Note :

চেক	অঙ্গীকার পত্র
(১) ইহা সর্বদা ব্যাঙ্কের উপর লিখিত হয়।	(১) ইহা যে কোন ব্যক্তির উপর লিখিত হইতে পারে।
(২) আজ্ঞাকারক, দায়ক এবং প্রাপক এই তিনটি পক্ষ চেকে থাকে।	(২) পাওনাদার এবং দেনাদার এই দুইটি পক্ষ অঙ্গীকার পত্রে থাকে।
(৩) ইহাতে টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধ করা হয়।	(৩) ইহাতে চাহিবামাত্র অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে টাকা পরিশোধ করা হয়।
(৪) ইহাতে কোন ষ্ট্যাম্পের দরকার হয় না।	(৪) ইহাতে ষ্ট্যাম্পের দরকার হয়।
(৫) ব্যাঙ্কে আমানত না থাকিলে কেহ চেক কাটিতে পারে না।	(৫) এই প্রশ্ন ইহাতে দেয়া যায় না।
(৬) ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রদত্ত ছাপানো ফর্মে এই চেক কাটিতে হয়।	(৬) ইহাতে কোন ছাপানো ফর্মের দরকার হয় না। যে কোন কাগজে ইহা লেখা চলে।
(৭) ইহাকে একটি আদেশপত্র বলা যায়। কারণ, ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটার অর্থ হইল ঐ টাকা প্রদানের আদেশ।	(৭) ইহাকে আদেশপত্র বলা যায় না। ইহা দেনা পরিশোধের অঙ্গীকার পত্র।

অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় অর্থ প্রেরণের বিভিন্ন পদ্ধতি (Various Methods of Inland and Foreign Remittances) :—

দেশের ভিতরে যখন কোন পণ্য বিক্রয় হয় তখন ক্রেতা উহার মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করিয়া দেয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই পরিশোধে অসুবিধা দেখা দেয়। সেজন্য নগদ ছাড়াও অন্য পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করিয়া দেওয়া যায়। আর বিদেশী ব্যবসায়ের কথা তো সম্পূর্ণ পৃথক। সেখানে আরও অসুবিধা দেখা যায়। সেজন্য নগদ অর্থ ছাড়াও অন্য প্রকারে ঐ পণ্যমূল্য পরিশোধ করা যায়। যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে এইরূপ পরিশোধ কার্য সম্পন্ন করা যায় তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(ক) **নগদ টাকা** (Cash) :

নগদ অর্থের দ্বারা ক্রীত পণ্যের মূল্য সহজেই পরিশোধ করা যায়। ইহা কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়েই সুবিধাজনক। কারণ, দূরদেশে অর্থ প্রেরণ অথবা পরিশোধ করিতে লইয়া যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল। কারণ, উহা পথিমধ্যে চুরি হইতে পারে।

(খ) **ডাক মারফত অর্থ প্রেরণ** (Postal remittances) :—

পাওনাদার যদি দেনাদারের নিকট হইতে অনেক দূরে থাকে তখন পণ্যের মূল্য পরিশোধ করিতে ক্রেতা বা দেনাদার এই ব্যবস্থার সাহায্য লইতে পারে। অর্থাৎ, এই পদ্ধতির দ্বারা ক্রেতা বিক্রেতাকে তাহার প্রাপ্ত অর্থ পরিশোধ করিতে পারে। এইরূপ অর্থ-প্রেরণ দুই প্রকারে হইতে পারে, যেমন—(ক) সাধারণ এবং (খ) তড়িৎ বার্তাযুক্ত। দ্রুত অর্থ-প্রেরণ করিবার সময় এই তড়িৎবার্তাযুক্ত পদ্ধতি গৃহীত হয়। অধিক পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করিবার সময় নিরাপত্তার জন্য উহা বীমাকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে টাকা নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

(গ) **চেক** (Cheque) :—

ইহার মাধ্যমেও পাওনাদারের অর্থ পরিশোধ করা যায়। এই চেক পাওয়ার পরে পাওনাদার উহা ভাঙ্গাইয়া ঐ টাকা তুলিয়া লইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার চেক বাজারে দেখা যায়।

(ঘ) **ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট** (Bank Draft) :—

ইহা এক ব্যাঙ্ক কর্তৃক অপর ব্যাঙ্কের উপরে বা ব্যাঙ্কের একটি শাখা কর্তৃক অপর শাখার উপরে টাকা প্রদানের আদেশপত্র।

দূরদেশে অবস্থিত কোন পাওনাদারকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে দেনা পরিশোধ করা যায়। দেনাদার স্থানীয় কোন ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিয়া উহার সমপরিমাণের একটি ড্রাফ্‌ট করাইয়া লয়। উহাতে ঐ পাওনাদারের নাম, ঠিকানা লেখা থাকে। পরে উহা পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করা হয়। পাওনাদার উহা পাওয়ার পরে ভাঙ্গাইয়া ঐ টাকা তুলিয়া লইতে পারে।

(ঙ) **বাণিজ্যিক হুণ্ডি** (Bill of Exchange) :—

দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ক্রেতা ধারে পণ্য ক্রয় করিয়া এই প্রকার দলিলে স্বীকৃতি দিতে পারে। পরে ঐ সময় অতিবাহিত হইলে ঐ দলিলের অর্থ পরিশোধ করিয়া দেয়। ইহাতে দেনা পরিশোধ হইয়া যায়

ঐ নির্দিষ্ট দিনের আগে পাওনাদারের প্রয়োজন হইলে ঐ হুণ্ডি কোন ব্যাঙ্কের সহিত বাট্টা করিয়া লইতে পাবে।

(চ) **ট্রেজারি চালান** (Treasury Chalans) :—

ইহা সরকারের ধনাগার। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিয়া এই পদ্ধতিতে তাহার জন্য রসিদ লইতে হয়। ঐ রসিদ পাওনাদারের নিকট পাঠাইয়া দিলে পাওনাদার ঐ রসিদ দেখাইয়া স্থানীয় ধনাগার হইতে ঐ রসিদের সমপরিমাণ অর্থ তুলিয়া লইতে পারে।

(ছ) **অঙ্গীকার পত্র** (Promissory Notes) :—

এই পত্রের দ্বারাও দেনা পরিশোধ করা যাইতে পাবে। কিন্তু ইহা অধমর্ণ তৈয়ার করিয়া উত্তমর্ণকে প্রদান করে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করা যাইতে পাবে। তবে কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করে।

আমানত বীমা, করপোরেশান, ইহার উদ্দেশ্য বৈশিষ্ট এবং পরিকল্পনা (Meaning, Objects, Features and the Scheme of Deposit Insurance Corporation) :—

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে ভারতবর্ষে এই আমানত বীমা করপোরেশান ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয়। দেশের ব্যবস্থা ফেল হইলে লোকের দুঃখের আর শেষ থাকে না। বিশেষ করিয়া দরিদ্র লোক আরও দরিদ্র হইয়া পড়ে। অন্যদিকে ধনীলোক দরিদ্র হইয়া পড়ে। কারণ, তাহাদের জমা টাকা আর তাহারা ফেরত পায় না। ইহাতে তাহাদের জীবনযাত্রার মান নীচু হইয়া পড়ে এবং তাহাদের ক্রয় ক্ষমতাও কমিয়া যায়। ইহার ফলে বাজারের পণ্যমূল্যের উপরও প্রভাব সৃষ্টি হয়। সেই সব কথা চিন্তা করিয়া আমাদের দেশে এই করপোরেশান স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

ব্যাঙ্ক ব্যবসা ফেল হইলে তাহার প্রভাব হইতে আমানতকারীকে রক্ষা করাই ইহার মূল **উদ্দেশ্য**। এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা আমানতকারীদের স্বার্থ বহুলাংশে রক্ষিত হইবে। ইহাতে আমানতকারীরা আর হতাশ হইয়া পড়িবে না এবং ইহা দ্বারা পণ্যমূল্যও প্রভাবিত হইবে না। পণ্যের বাজারে কোনপ্রকার প্রভাব না পড়িলে উৎপাদনও অতি সূক্ষ্মভাবে চলিবে এবং ইহাতে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। সেজন্য বলা যায় আমানত-

কারী, বিশেষ করিয়া ছোট আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষা করাই এই আমানত বীমা করপোরেশানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই করপোরেশানের সমস্ত মূলধনই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদান করিয়াছে এবং ইহার পরিমাণ ১ কোটি টাকা। প্রয়োজন হইলে ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আরও ঋণ লইতে পারে। ৫ জন সদস্য লইয়া ইহার পরিচালন সভা গঠিত। ইহারা পরিচালনা কার্য তদারকী করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ইহার চেয়ারম্যান।

এই প্রতিষ্ঠানের **কর্ম্মসূচী বা পরিকল্পনা** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ করিয়া নীতি নির্ধারণ করে। ইহা প্রতি আমানতকারীর জন্য ১৫০০ টাকা পর্যন্ত আমানতের বীমা ব্যবস্থা করিবে। সকল ভারতীয় ব্যাঙ্কই ইহাতে নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কোন নূতন ব্যাঙ্ক গঠিত হইলে তাহা ইহার আওতায় আসিবে। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের, বীমা কোম্পানীর, বিদেশী সরকারের আমানতের বীমা, প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারিবে। এই করপোরেশানের দুইটি তহবিল আছে, যেমন, আমানত তহবিল এবং সাধারণ তহবিল। এই তহবিলের এক অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা থাকে এবং অন্য অংশ শেয়ার, স্টক, প্রভৃতিতে লগ্নী করিতে হয়। ইহাকে প্রিমিয়াম হিসাবে শতকরা ১৫ পয়সা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় প্রতি ৫ জন আমানতকারীর মধ্যে ৪ জনের আমানত নিরাপদ হইল।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. বাজার কাহাকে বলে? ইহাকে কিভাবে বিভক্ত করা যায়?

(What is market? How is it classified?)

2. পণ্যের বাজার, মূলধনের বাজার ও টাকার বাজারের কার্যাবলী আলোচনা কর।

(Discuss the functions of Commodity Markets, Capital Markets and Money Markets)

3. ফাট্‌কা কারবার কাহাকে বলে? বৈধ ও অবৈধ ফাট্‌কা কারবার কাহাকে বলে? কত প্রকার ফাট্‌কা কারবার দেখিতে পাওয়া যায়? ইহার গুরুত্ব ও দোষ-ত্রুটি আলোচনা কর।

(What do you mean by Speculative business? What is meant by legal and illegal Speculation? Classify Speculative business and discuss its importance and defects.)

4. পণ্যবাজারের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

(Discuss the features and importances of Commodity Exchange)

5. শেয়ার বাজার কাহাকে বলে ? ইহার বৈশিষ্ট ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

(Define Stock Exchang. Discuss its features and importance.)

6. শেয়ার বাজারের লেনদেন পদ্ধতি ও শেয়ারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা কর।

(Discuss the procedure of dealing in the Stock Exchange and also discuss the causes of fluctuation in the prices of shares in the market)

7. কলিকাতার শেয়ার বাজারের সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা কর।

(Discuss the Organisational set up of the Calcutta Stock Exchange)

8. কলিকাতা, বোম্বাই, লণ্ডন, ও নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

(Discuss the function of Calcutta, Bombay, London and New York Stock-Exchanges)

9. ভারতীয় শেয়ার বাজারের ত্রুটি দূর করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

(Discuss the various steps that have been taken to remove the defects of the Indian Stock-Exchanges.)

10. বিনিয়োগ ট্রাষ্ট কাহাকে বলে ? ইহার কার্যাবলী ও ত্রুটিসমূহ বর্ণনা কর।

(What in meant by Investment Trust ? Discuss its functions and demerits.)

11. ইউনিট ট্রাস্ট কাহাকে বলে ? ইহার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What is Unit Trust ? Discuss its features, merits and demerits)

12. নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, (খ) বাস্তুনির্মাণ সমিতি, (গ) ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশান, (ঘ) রাজ্য শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশান, (ঙ) জাতীয় শিল্পোন্নয়ন

প্রতিষ্ঠান, (চ) জাতীয় ক্ষুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠান, (ছ) শিল্পঋণ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ও (জ) পুনঃঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান।

(Write short notes on —

(a) Investment Banks, (b) Building Society, (c) Industrial Finance Corporation, (d) State Finance Corporation, (e) National Industrial Development Corporation, (f) National Small Industries Corporation, (g) Industrial Credit and Investment Corporation and (h) Re-Finance Corporation)

13. ভারতীয় টাকার বাজারের অর্থ ও উহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

(Define Indian Money Market and discuss its features)

14. ভারতীয় টাকার বাজারের প্রধান প্রধান সদস্যবৃন্দ সম্পর্কে আলোচনা কর।

(Discuss the chief Constitutions of the Indian Money Market.)

15. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি জাতীয়করণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ আলোচনা কর।

(Discuss the arguments for and against Nationalisation of Commercial Banks.)

16. চেক বলিতে কি বুঝ ? উহার শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট আলোচনা কর।

(Define Cheque Discuss its classification and features.)

17. বাণিজ্যিক হুণ্ডি কাহাকে বলে ? উহার শ্রেণীবিভাগ, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা আলোচনা কর।

(Define Bill of Exchange. Discuss its classification, feature and advantages.)

18. পার্থক্য নির্ণয় কর :—

(ক) চেক ও বাণিজ্যিক হুণ্ডি

(খ) বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও অঙ্গীকার পত্র, এবং

(গ) চেক ও অঙ্গীকার পত্র।

(Distinguish between :—

(a) Cheque and Bill of Exchange,

(b) Bill of Exchange and Promissory note, and

(c) Cheque and Promissory Note)

19. অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় অর্থ-প্রেরণের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

(Discuss the various methods of Inland and Foreign remittances.)

20. ভারতের আমানত বীমা করপোরেশনের উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য এবং পরিকল্পনা আলোচনা কর।

(Discuss the objects. features and scheme of Deposit Insurance Corporation of India.)

21. ফাট্‌কা বাজার ও অগ্রিম বাজারের কার্যাবলী আলোচনা কর। উহারা কি ফাট্‌কাবাজী বন্ধ করে ?

(Discuss the functions of the Future and Forward Markets. Do they prevent Speculation ?)

22. শেয়ার বাজার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে যে ভূমিকা গ্রহণ করে তাহা আলোচনা কর।

(Discuss the role played by Stock Exchange towords the economic development of the country.)

বীমা

(Insurance)

বীমার অর্থ এবং উহার গুরুত্ব (Meaning and Importance of Insurance) :—

"যে চুক্তির সাহায্যে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন ঘটনা সঞ্জাত ক্ষতির জন্য বা ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তাহাকে বীমা বলা হয়।"

এই প্রকার চুক্তিতে দুইটি পক্ষ থাকে। যিনি তাহার পণ্যের বা দ্রব্যের জন্য এই চুক্তি করিয়া থাকেন তাহাকে **বীমাকৃত ব্যক্তি** (Insured) বলে। আর যিনি ঐ অর্থ-প্রদানের ঝুঁকি গ্রহণ করেন তাহাকে **বীমাকারী** (Insurer) বলে। ঐ রূপ ঝুঁকি বহনের পরিবর্তে বীমাকারী বীমাকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে যে সামান্য পরিমাণ অর্থ পাইয়া থাকে তাহাকে **বীমা মাশুল** (Premium) বলে।

বর্তমানে এই বীমার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের প্রতি পদক্ষেপে বিপদ। ধন-সম্পত্তি যে কোন কারণে এবং যে কোন সময় নষ্ট হইতে পারে। এই সকল বিপদ কখন আসিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই ক্ষতি ব্যক্তিগত জীবন হইতে শুরু করিয়া মানুষের ব্যবসা ক্ষেত্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। জীবনের উপর কোন বিপদ আসিলে মৃত্যু অনিবার্য। ইহাতে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী, পুত্র এক অসহায় অবস্থায় পড়িবে। অন্যদিকে মৃত্যু না হইয়া এই ক্ষতি যদি ব্যবসা ক্ষেত্রে হয় তবে তাহাকে আর ভাল করিয়া ব্যবসা করিতে হইবে না। এমন কি ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহাতেও তাহার সংসার নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই বীমার আশ্রয় লইতে হইবে। অন্য কোন উপায় নাই। এই বীমার সাহায্য লইলে ব্যবসায়ী তাহার সম্পত্তির জন্য ক্ষতি পূরণ পাইবে। ফলে ঐ ব্যবসায়ী আবার ব্যবসা করিতে পারিবে। এবং পিতৃহীন নাবালক পুত্র বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে তাহার বাবার জীবনের বীমার টাকা পাইবে। ইহাতে নাবালক পুত্র ক্রমে ক্রমে সাবালক হইয়া উঠিতে পারিবে এবং এই প্রকারে একটা সংসার টিকিয়া থাকিতে পারিবে।

শুধুমাত্র এই ব্যক্তিগত জীবনে ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে বীমার গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয় না। সাধরণ ব্যবসা ক্ষেত্রেও ইহার অবদান অনেক বেশী। যদি এই বীমা না থাকিত

তবে ব্যবসা-বাণিজ্য এত উন্নত হইতে পারিত না। এমনকি হয়তো বন্ধ হইয়া যাইত। কারণ নৌ-বীমার জন্য আজ বড় বড় ব্যবসায়ী তাহাদের পণ্য নদী পথে প্রেরণ করিতে চিন্তা করে না। কারণ, তাহারা জানে যে, পণ্য নষ্ট হইলে তাহারা ক্ষতি পূরণ পাইবে। এরূপ নিশ্চয়তা থাকার জন্য ছোট, বড় সকল প্রকার ব্যবসায়ী তাহাদের পণ্য কম খরচে নদীপথে পাঠাইয়া থাকে, এবং ইহার ফলেই আজ ব্যবসা এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই বীমা কোম্পানী মানুষের বিপদকে বন্ধ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু প্রয়োজনে ঐ বিপদের ক্ষতি পূরণ দিয়া ব্যবসায়ীকে প্রভূত সহায়তা করিতে পারে। অন্যভাবে আমরা বলিতে পারি যে, বীমা কোম্পানী অর্থ প্রদান করিয়া বিপদের সময় ব্যবসায়ীকে অথবা তাহার পরিবারকে নূতন জীবন প্রদান করিয়া থাকে।

সুতরাং সমাজ জীবনে এই বীমা যে কতটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তাহা উপরের আলোচনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বীমার অবদান যথেষ্ট আছে। যেমন, ব্যবসায়ীর কোন কারণে এবং কোন সময় অর্থের দরকার হইলে ঐ বীমাপত্র কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখিয়া টাকা ধার করিতে পারে। পরে আবার ঐ অর্থ পরিশোধ করিয়া দিয়া বীমাপত্র ছাড়াইয়া লইতে পারে। সুতরাং অর্থের প্রয়োজনের সময়ও এই বীমাপত্র ঐ প্রকারের ব্যবসায়ীকে সাহায্য করে।

বীমা কোম্পানী যে মাশুল পাইয়া থাকে অনেক সময় তাহাও আবার দেশের শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করিয়া থাকে। ইহাতে দেশের শিল্পের মূলধনের অভাব থাকে না। এই প্রকার অর্থ সাহায্যে দ্বারা দেশীয় শিল্পগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে পারে। এই বীমা কোম্পানীতে আবার যৌথ পরিকল্পনার প্রচলন আছে। এই প্রকার পরিকল্পনা বিশেষ করিয়া অংশীদারী কারবারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে আরও রূপ দেওয়ার জন্য এবং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এই বীমা কোম্পানীকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে উপসংহারে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, বর্তমান যুগে বীমা কোম্পানী এক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার গুরুত্ব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

বীমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য (Features of Insurance Contract) :—

বীমা চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(১) **ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের চুক্তি** (Indemnity Contract) :—

বীমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়। কারণ, কোন অঘটন ঘটিলে অর্থাৎ

ক্ষতি হইলে বীমা কোম্পানী বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিয়া থাকে। বীমার মাশুলের পবিবর্তে বীমা কোম্পানী এই ক্ষতিপূবণ দিতে রাজী হয় অথবা চুক্তিবদ্ধ হয়। যদি কোন বিপদ না দেখা দেয় তবে আর এই ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। বীমা কোম্পানী যে মাশুল পায় তাহা ইহার লাভে পরিণত হয়। এই প্রকাব নিয়ম অগ্নি ও নৌ-বীমাব ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়। অর্থাৎ একমাত্র ক্ষতি হইলেই তবে তাহা পূরণেব প্রশ্ন উঠে। কিন্তু এই প্রকার পদ্ধতি জীবন বীমার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই জীবন বীমাব ক্ষেত্রে বিপদ দেখা দিলে অর্থাৎ, মৃত্যু হইলে ক্ষতিপূবণ দিতে হয়। এবং এমন কি এই বিপদ না ঘটিলেও নির্দিষ্ট সময় পরে এই ক্ষতিপূবণ দিতে হয়। বিপদ হোক আর না হোক জীবন বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতেই হইবে। এইজন্য ইহাকে অর্থপ্রদানেব নিশ্চিত চুক্তি (Contract of guarantee) বলে। এই প্রকার চুক্তি নৌ অথবা অগ্নি বীমাব ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এবং নৌ ও অগ্নি বীমার ন্যায় জীবন বীমার ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতির মূল্য নির্ণয় কবাব কোন প্রশ্নই উঠে না। যে পরিমাণ অর্থ বীমাপত্রে উল্লেখ থাকে তাহা জীবন বীমাব ক্ষেত্রে প্রদান কবিতে হয়।

(খ) **বীমা যোগ্য স্বার্থ** (Insurable Interest) :—

যে কোন বীমা চুক্তিতে বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই স্বার্থ না থাকিলে কেহ বীমা গ্রহণ করিতে পাবে না। যেমন, আমি রাস্তার লোকের জীবনের উপব কোন বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পাবি না। কাবণ, তাহাদের জীবনের প্রতি আমাব কোন বীমা যোগ্য স্বার্থ নেই। তাহাদেব মৃত্যুতে আমার কিছু যায় আসে না। তাহাদের মৃত্যুতে আমি ধনী অথবা দরিদ্র হইব না। এই বীমা যোগ্য স্বার্থ বলিতে সেই স্বার্থকে বোঝায় যাহার দ্বারা আমি ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারি। যেমন, যদি কোন কাবণে কোন সম্পত্তির কোন ক্ষতি হয় এবং সেই ক্ষতি দ্বারা আমি কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হই তবে ঐ সম্পত্তিতে আমার স্বার্থ আছে অর্থাৎ বীমা যোগ্য স্বার্থ আছে। আগুনে কোন সম্পত্তি বিনিষ্ট হইলে উহার মালিকের ক্ষতি হয়। সুতরাং ঐ সম্পত্তিতে মালিকের বীমা যোগ্য স্বার্থ আছে। এই বীমা যোগ্য স্বার্থ না থাকিলে বীমা চুক্তি সম্পন্ন হয় না। বীমা যোগ্য স্বার্থ সাধরণত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দেখা যায় :—

স্বামীর জীবনের উপর স্ত্রীর, পিতার জীবনেব উপর পুত্রের অথবা পুত্রের জীবনের উপর পিতার, অধমর্ণের জীবনের উপর উত্তমবর্ণের, প্রভৃতি।

(গ) **চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস** (Utmost good Faith or 'Uberrima Fedei) :

চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস বীমা চুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সদ্বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া এই বীমা চুক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবন, নৌ ও অগ্নি সকল প্রকার বীমাই এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি অনুযায়ী বীমা গ্রহণের সময় বীমা কোম্পানীর নিকট বীমা গ্রহীতা অকপটে বীমা সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ করিবে। ইহা বাধ্যতামূলকও। কারণ, ইহা না থাকিলে কত টাকার ঝুঁকি বীমা কোম্পানী গ্রহণ করিবে, কত টাকা প্রিমিয়াম হইবে তাহা নির্ধারণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। চুক্তির পরে কোন সময় যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, বীমা গ্রহীতা ঐ বীমা সম্পর্কে কোন তথ্য গোপন করিয়াছিল তবে বীমা কোম্পানী যে কোন সময় ঐ বীমা চুক্তি বাতিল করিয়া দিতে পারে।

সকল প্রকার বীমাতেই এই বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(ঘ) **বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি** (Actuary) :—

উন্নত পদ্ধতিতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, প্রিমিয়ামের অর্থ নিরূপণ, প্রভৃতির জন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগও বীমা চুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে জন্য উপযুক্ত লোক নিয়োগের মাধ্যমে মাশুল, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতিও বীমা কোম্পানীকে করিতে হইবে।

বিভিন্ন প্রকার বীমা (Different types of Insurance) :—

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার বীমা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল বীমা বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) **জীবন বীমা** (Life Insurance) :—

কোন ব্যক্তির জীবনের উপর যে বীমাপত্র গৃহীত হয় তাহাকে জীবন বীমা বলে। নির্দিষ্ট সময় পরে অথবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে বীমা কোম্পানী ঐ ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে এইরূপ ক্ষতিপূরণ করার পরিবর্তে বীমা কোম্পানী বীমা গ্রহীতার নিকট হইতে মাশুল পাইয়া থাকে।

(খ) **অগ্নি বীমা** (Fire-Insurance) :—

যে কোন সম্পত্তি যে কোন সময়ে আগুনে পুড়িয়া নষ্ট হইতে পারে। ইহাতে মালিকের ক্ষতি হয়। সে জন্য মালিক তাহার সম্পত্তি আগুন হইতে রক্ষা করিবার জন্য বীমা কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় অথবা বীমাপত্র গ্রহণ করে তখন তাহাকে অগ্নিবীমা বলে। অগ্নি হইতে সম্পত্তিকে রক্ষা করাই এই বীমার উদ্দেশ্য। সম্পত্তি অগ্নিদগ্ধ হইলে মালিক ক্ষতিপূরণ পায়।

(গ) **নৌ-বীমা** (Marine Insurance) :—

বীমা শুধুমাত্র স্থলেই সীমাবদ্ধ নহে। জলপথেও দেখা দিতে পারে। যে জন্য জলযান যে কোন সময় বিপন্ন হইতে পারে। ইহাতে মালিকের ক্ষতি হয়। সেজন্য মালিক উহা রক্ষা করিবার জন্য বীমা কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পারে। এই প্রকার বীমাপত্রকে নৌ-বীমা পত্র বলে। এই প্রকার বীমার জন্য আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। কারণ, জলপথে পণ্য প্রেরণ অত্যন্ত সুলভ। কিন্তু ইহাতে বিপদও যথেষ্ট আছে। এই বিপদকে নৌ-বীমা অনেকটা হ্রাস করিয়া দিয়াছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে সহায়তা করিয়াছে।

(ঘ) **দুর্ঘটনা বীমা** (Accident Insurance) :—

হঠাৎ কোন বিপদ হইতে অথবা দৈব-দুর্বিপাকে কোন সম্পত্তি নষ্ট হইতে পারে। এই বিপদ হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য যে বীমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাহাকে দুর্ঘটনা বীমা বলে।

(ঙ) **অপহরণ বীমা** (Burglary Insurance) :—

চুরি ডাকাতি দ্বারা সম্পত্তি বিনিষ্ট হইতে পারে। এই প্রকার বিপদ হইতে সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য যে বীমাপত্র বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে গৃহীত হয় তাহাকে অপহরণ বীমা বলে। যাহারা অধিক পরিমাণে টাকা-পয়সা দেওয়া-নেওয়া করেন, যেমন, ব্যাঙ্ক, মহাজন, প্রভৃতি) তাহারাই এই প্রকার বীমা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(চ) **প্রেরিত অর্থ-বীমা** (Cash in Transit Insurance) :—

এক স্থান হইতে অন্যস্থানে অর্থ পাঠাইলে অনেক সময় পথিমধ্যে উহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে অর্থাৎ চুরি-ডাকাতির ফলে উহা বিনিষ্ট হইতে পারে। এই রূপ ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বীমা কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়া যায়। এইপ্রকার চুক্তিকে প্রেরিত অর্থ-বীমা বলে।

(ছ) **মোটর বীমা** (Motor Insurance) :—

কোন দুর্ঘটনার হাত হইতে মোটরকে রক্ষা করিবার জন্য যে বীমা গ্রহণ করা হয় তাহাকে মোটর বীমা বলে। এই মোটর বীমা দুই প্রকারের হইতে পারে, যেমন, (১) এই প্রকার দুর্ঘটনা হইতে মালিকের ক্ষতি হইতে পারে অথবা (২) এই দুর্ঘটনা তৃতীয় কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইতে পারে। প্রথম প্রকারে মোটরের মালিক তাহার

মোটরের জন্য বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকারে তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষতি হইলে মোটরের মালিক উহা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পারে। প্রকৃত ক্ষতি দেখা দিলে বীমা-কোম্পানীর নিকট হইতে ঐ অর্থ আদায় করিয়া মোটরের মালিক ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে পারে।

এই প্রকার বীমাকে তৃতীয় পক্ষের ঝুঁকি বহন বীমা বলা হয়।

(জ) **কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা** (Employees' State Insurance) : —

যে সকল কর্মচারীর বেতন মাসিক পাঁচশত টাকার অধিক নহে তাহারাই এই বীমার আওতায় আসিবেন। ১৯৪৮ সালে এই বীমা প্রচলিত হয়। এই প্রকার বীমার ফলে শ্রমিকগণ তাহাদের কর্মক্ষেত্রে একটু সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। পীড়িত, অকর্মণ্য, পোষ্যপালন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই প্রকার বীমা দেওয়া হয়।

নৌ-বীমা গ্রহণের পদ্ধতি ও উহার ক্ষতি-পূরণ দাবীর পদ্ধতি (Procedure for taking a Marine Insurance Policy and making a claim on it) :—

দুইপ্রকারে এই নৌ-বীমা গ্রহণ করা যায়, যথা : **(ক)** নৌ বীমা কোম্পানীর নিকট বা অফিস হইতে এবং **(খ)** লয়েডস্ ঝুঁকিবাহকদের নিকট হইতে। প্রথম পদ্ধতিটিকে **কোম্পানী বীমাপত্র** এবং দ্বিতীয়টিকে **লয়েডস্ বীমাপত্র** বলে।

কোম্পানী বীমাপত্র (Company Policy) :—

আমাদের ভারতবর্ষে এই কোম্পানী বীমাপত্রই প্রচলিত। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহাদের জাহাজের, পণ্যের বা মাশুলের জন্য বীমাপত্র গ্রহণ করিতে রাজী হইলে অথবা প্রয়োজন বোধ করিলে তাহারা সরাসরি নৌ-বীমা কোম্পানীতে উপস্থিত হইতে পারেন। এবং নির্দিষ্ট ফর্মে সব কিছু লিখিতভাবে জানাইয়া বীমা চুক্তি সম্পন্ন করিতে পারেন।

লয়েডস্ বীমাপত্র (Loyd's Policy) :—

ইহা দালালদের প্রতিষ্ঠান। এই পদ্ধতিতে সরাসরি বীমাপত্র গ্রহণ করা যায় না। দালালের মাধ্যমে সাধরণত ইহা গৃহীত হয়। বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকিবাহক প্রতিষ্ঠানকে একত্রে লয়েডস্ বলে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে দালালেরা কাজ করে। যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঐ প্রকার বীমাপত্র লইতে ইচ্ছুক হয় তখন তাহারা ঐ

দালালের সহিত যোগাযোগ করে। দালালেরাই সমস্ত শর্ত বিস্তারিতভাবে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়া দেয়। ইহাতে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাজী হইলে তখন তাহাদিগকে লইয়া বিভিন্ন ঝুঁকিবাহকদের নিকট উপস্থিত হয় এবং পরিচয় করাইয়া দেয়। যদি একজন ঝুঁকিবাহক সমস্ত ঝুঁকি লইতে রাজী না হয় তাহা হইলে অন্য ঝুঁকিবাহকের নিকট বাকী অংশের জন্য চুক্তি সম্পন্ন করিতে হয়। এইভাবে সম্পূর্ণ ঝুঁকি গৃহীত হইলে ঐ দালালের বীমাপত্র প্রস্তুত করে এবং ঝুঁকিবাহকদের দ্বারা ঐ পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লয়। দালালেরা তাহাদের এই কাজের জন্য মাশুলের শতকরা ৫ ভাগ অর্থ পাইয়া থাকে। পণ্যের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ বেশী মূল্যে সাধরণত বীমাপত্রের চুক্তি সম্পাদিত হয়। কারণ, ইহাতে আনুসঙ্গিক খরচ প্রভৃতি উঠিয়া আসে। এই প্রকারে নৌ-বীমা গ্রহণ সমাপ্ত হয়।

যদি কোন কারণে বীমাকৃত পণ্যের ক্ষতি হয় তাহা হইলে বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। পণ্য বিনিষ্ট হওয়ার সাথে উহা বীমা কোম্পানীকে জানাইতে হয়। এবং কত টাকা ক্ষতি হইয়াছে তাহার একটি হিসাব বা বিবরণী প্রস্তুত করিয়া বীমা কোম্পানীর নিকট জমা দিতে হয়।

এইরূপ বিবরণী পাওয়ার পরে বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আগে বীমা কোম্পানী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করিয়া দেখে।

(১) ঐ বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাকারীর অর্থগত স্বার্থ আছে কিনা ?

(২) যে বিপদের আশায় ঐ বীমা করা হইয়াছিল তাহারই কারণবশত এই বিপদ হইয়াছে কিনা ?

(৩) সমুদ্রে জাহাজ রওনার পূর্বে উহা যাত্রার উপযোগী ছিল কিনা ?

(৪) যাত্রার প্রাক্কালে সমুদ্র যাত্রার উপযোগী ছিল কিনা ?

(৫) এই যাত্রা আইন সম্মত ছিল কিনা ?

(৬) বীমা গ্রহীতার ইচ্ছাকৃত কারণে এই বিপদ ঘটিয়াছে কিনা ?

(৭) ঐ জাহাজ নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে কিনা ?

উপরের সমস্ত বিষয় ভালভাবে বিচার করিয়া সন্তুষ্ট হইবার পরে বীমা কোম্পানী বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

নৌ-বীমার বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন প্রকারের বীমা পত্র (Subject matter of Marine Insurance and different types of Insurance Policy) :—

নৌ-বীমার বিষয়বস্তু **তিন প্রকার** হইতে পারে যথা :—

(ক) **জাহাজ** (Hull) :—

জাহাজ সমুদ্রপথে যাতায়াত করিবার সময় ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে। এইরূপ ক্ষতি হইলে জাহাজের মালিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ, জাহাজ নষ্ট হওয়ার অর্থ হইল মালিকের আর্থিক ক্ষতি। এই জাহাজ সামুদ্রিক বিপদ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। সেজন্য ঐ বিপদ হইতে জাহাজকে রক্ষা করিবার জন্য যখন বীমা কোম্পানীর সহিত চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন তাহাকে জাহাজের নৌ-বীমা বলে।

(খ) **পণ্য** (Cargo) :—

জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সাথে সাথে উহাতে যে পণ্য থাকে তাহা নষ্ট হইতে পারে। ইহাও একপ্রকার ক্ষতি। এই ক্ষতি পণ্য মালিককেই বহন করিতে হয়। সেজন্য এই প্রকার লোকসান বা ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যখন বীমা কোম্পানীর সহিত ঐ পণ্যের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন তাহাকে পণ্যের নৌ-বীমা বলে।

(গ) **মাশুল** (Freight) :—

জাহাজের ক্ষতি হইলে যেমন পণ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি উহার মাশুলও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ, পণ্য এই সময় আর উহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। ফলে পণ্যের মালিক আর মাশুল দিতে রাজী হয় না। কারণ, তাহার পণ্য নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায় নাই। এই মাশুলের ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে নৌ-বীমা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাকে মাশুলের নৌ-বীমা বলে।

নৌ-বীমার ক্ষেত্রে যে সকল **বীমাপত্র** সাধারণত দেখা যায় তাহা সংক্ষেপে **নিম্নরূপে** বর্ণনা করা যায়।

(১) **সময় বীমা** (Time Policy) :—

এই বীমায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমা করা হয়। যখন ঐ সময় শেষ হইয়া যায়, সেই সময়ই এই প্রকার বীমার মেয়াদ পূর্ণ হইয়া যায়।

(২) **সমুদ্রযাত্রা বীমা** (Voyage Policy) :—

এই পদ্ধতিতে কোন একটা নির্দিষ্ট পথে জাহাজ যাওয়ার জন্য বীমা গৃহীত হয়। যখন ঐ পথে যাওয়া শেষ হয় অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে জাহাজ পৌঁছাইয়া যায় তখনই এই প্রকার বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়।

(৩) **মিশ্র বীমা** (Mixed Policy):—

এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রা শেষ করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট সমুদ্র যাত্রার জন্য বীমা করা হয়।

(৪) **মূল্য অলিখিত বীমা** (Open or Unvalued Policy):—

এই পদ্ধতিতে বীমাকৃত পণ্যের মূল্য লেখা থাকে না। বিপদ দেখা দিলে অথবা বীমার বিষয়বস্তু ক্ষতি হইলে, তখন তাহার মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং ঐ পরিমাণ অর্থ বীমা কোম্পানী বীমা গ্রহীতাকে প্রদান করে। এই প্রকার বীমাকে মূল্য অলিখিত বীমা বলে।

(৫) **মূল্য লিখিত বীমা** (Valued Policy):—

এই বীমাপত্রে পণ্যের মূল্য উল্লেখ থাকে। কোন কারণে পণ্য বা সম্পত্তির ক্ষতি হইলে বীমা কোম্পানী ঐ লিখিত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

(৬) **নৌ-বহর বীমা** (Fleet Policy):—

যখন কোন মালিকের নৌ-বহর থাকে এবং তখন যদি তিনি ঐ সব জাহাজের জন্য একটা বীমা করেন তবে তাহাকে নৌ-বহর বীমা বলে।

(৭) **বন্দর ঝুঁকি বীমা** (Port Risk Policy):—

জাহাজ বন্দরে থাকাকালীনও বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। এই প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যখন কোন বীমাপত্র গ্রহণ করা হয় তখন তাহাকে বন্দর ঝুঁকি বীমা বলে।

(৮) **যৌগিক বীমা** (Composite Policy):

এই পদ্ধতিতে অনেকগুলি বীমা কোম্পানী ঝুঁকি বহণ করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক ঝুঁকি বাহকের দায়িত্ব পৃথক পৃথক থাকে।

(৯) **নির্মাতা ঝুঁকি বীমা** (Builder's Risk Policy):—

জাহাজের নির্মাতাগণই এই প্রকার বীমা গ্রহণ করিয়া থাকেন। নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে কোন জাহাজ প্রস্তুত করিবার জন্যই এই প্রকার ঝুঁকি বীমা লওয়া হয়। এবং উক্ত সময়ের মধ্যে জাহাজ তৈয়ার করিতে যাইয়া জাহাজের যদি কোন ক্ষতি হয় তবে তাহাও এই পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ করা হইয়া থাকে।

নৌ-বীমার বিভিন্ন প্রকার অপরিহার্য শর্ত (Worranty in Marine Insurance) :—

ভারতীয় চুক্তি আইনে বলা হইয়াছে যে, প্রতিটি চুক্তিতেই কতকগুলি শর্ত থাকিবে। এই শর্তের সমস্তই সমান গুরুত্বপূর্ণ নহে। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া এই শর্তগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন—(১) **মুখ্য শর্ত** এবং (২) **গৌণ শর্ত**। এই মুখ্য শর্ত পালন না করিলে চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু গৌণ শর্ত পালন না করিলে চুক্তি বাতিল হয় না কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তপক্ষ ইচ্ছা করিলে অপরপক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে।

এই নৌ-বীমাপত্রে সাধারণত **তিনটি গৌণ** শর্ত থাকে যেমন—(১) জাহাজের সমুদ্রে চলাচলের যোগ্যতা, (২) জাহাজের নির্দিষ্ট গতিপথে চলা এবং (৩) যাত্রার বৈধতা।

(১) জাহাজ সমুদ্র চলাচলের যোগ্যতা :—

এই অংশের অর্থ হইল এই যে, জাহাজটি সমুদ্র যাত্রার সময় সাধারণ বিপদ-আপদগুলি সহ্য করিতে পারিবে কিনা তাহা নির্ণয় করা। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী পণ্য বোঝাই হইয়াছে কিনা এবং উপযুক্ত লোকজন জাহাজে আছে কিনা তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। উপরোক্ত অবস্থা বর্তমান থাকিলে তবেই জাহাজ সমুদ্র যাত্রায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে, অন্যথায় নহে।

(২) নির্দিষ্ট গতিপথ :—

জাহাজ সমুদ্রে চলাকালে ইহার নির্দিষ্ট গতিপথ পরিবর্তন করিতে পারিবে না। করিলে বিপদ হইলেও কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না। এবং

(৩) যাত্রার বৈধতা :—

জাহাজ সমুদ্র যাত্রায় আইনত অংশ গ্রহণ করিতে পারে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। এই জাহাজে কোন প্রকার বে-আইনী পণ্য থাকিলে উহা আইনত সমুদ্র যাত্রায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

নৌ-বীমার বিভিন্ন ধারা (Different clauses in a Marine Policy) :—

নৌ-বীমা পত্রে বিভিন্ন প্রকার ধারা দেখা যায়। কিন্তু উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(১) বীমাকৃত ব্যক্তির এবং বীমাকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়।

(২) জাহাজের নাম, অর্থাৎ, যে জাহাজে পণ্য প্রেরিত হইবে তাহার নাম।

(৩) পণ্যের বর্ণনা ও মূল্য।

(৪) এই চুক্তির সময় অর্থাৎ জাহাজ বন্দরে থাকার সময় হইতে না জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া যাওয়ার সময় হইতে।

(৫) জাহাজ পথিমধ্যে ইহার গতিপথ পরিবর্তন করিতে পারিবে কিনা।

(৬) যে যে সমুদ্রের বিপদের জন্য বীমাপত্র গৃহীত হইয়াছে তাহার নাম ও বর্ণনা।

(৭) ঝড়, বৃষ্টি, সংঘর্ষ, প্রভৃতি হইতে ক্ষতি।

(৮) অগ্নি, ডাকাতি, চুরি, প্রভৃতি হইতে ক্ষতি।

(৯) জাহাজকে রক্ষা করিবার জন্য সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপের পদ্ধতি।

(১০) বীমা কোম্পানী দ্বারা বীমা মাশুল পাওয়ার ব্যবস্থা।

(১১) প্রতিটী নৌ-বীমার নীচে একটা স্মারকলিপি জুড়িয়া দেওয়া হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে বীমা কোম্পানী দায়ী থাকিবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে দায়ী থাকিবে না তাহা ইহাতে বর্ণিত থাকে। ইহাদের কিছু কিছু নিম্নরূপে বর্ণনা করা হইল।

(ক) কোথাও "বিশেষ আংশিক ক্ষতিসহ" কথা থাকিলে ঐ বীমা কোম্পানী আংশিক ক্ষতির জন্য দায়ী থাকে।

(খ) কোথাও "সমস্ত ঝুঁকি" বলিয়া কিছু থাকিলে বীমা কোম্পানী সমস্ত প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে।

(গ) কোথাও "বিশেষ আংশিক ক্ষতিমুক্ত" কথা থাকিলে বীমা কোম্পানীর উপর দায়িত্ব অনেক কম আসে।

(ঘ) "আংশিক ক্ষতিমুক্ত" কথাটী থাকিলে সামগ্রিক ক্ষতি ভিন্ন কোন আংশিক ক্ষতির জন্য বীমা কোম্পানী দায়ী হইবে না

(ঙ) "ভিড়ান ও অবস্থান" কথাটি থাকিলে কোন্ বন্দরে জাহাজটি দাঁড়াইবে এবং অবস্থান করিবে তাহা বোঝায়।

(চ) "ধৃত ও অবরোধ মুক্ত" কথা থাকিলে যুদ্ধকালে বেশী বীমা মাশুল না দিলে শত্রুদ্বারা ধৃত হইলে যে ক্ষতি হয় তাহার জন্য বীমা কোম্পানী দায়ী হয় না। প্রভৃতি।

নৌ-বীমা ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি (Different Types of loss in Marine Insurance Business) **:**

নৌ-বীমার বিষয়বস্তুর ক্ষতি **দুই প্রকারের** হইতে পারে যেমন ; (ক) **সামগ্রিক ক্ষতি** এবং (খ) **আংশিক ক্ষতি**। বীমার বিষয়বস্তু যখন সম্পূর্ণভাবে বিনিষ্ট হয়

তখন তাহাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলে। এই সামগ্রিক ক্ষতিকে আবার **দুই ভাগে** ভাগ করা যায় যেমন—(১) **প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি** এবং (২) **উদ্ধার যোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি**। বিপদ ঘটার পর অথবা বিপদ ঘটিলে যখন বীমার বিষয়বস্তু এরূপে নষ্ট হইয়া যায় যে উহা আর উদ্ধার যোগ্য নয় তখন তাহাকে প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলে।

অন্যদিকে যখন ঐ বিষয়বস্তু উদ্ধার করা সম্ভব কিন্তু উহার পুনরুদ্ধারের ব্যয় বিষয়-বস্তুর দাম অপেক্ষা অধিক হয় তখন তাহাকে উদ্ধার যোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলে।

আংশিক ক্ষতি:—বিপদের সময় জাহাজ অথবা উহার বিষয়বস্তুর সমস্তটাই ক্ষতি হইতে পারে অথবা আংশিক ক্ষতি হইতে পারে। যখন ঐ ক্ষতিটা আংশিকভাবে হয় তখন তাহাকে আংশিক ক্ষতি বলে।

এই আংশিক ক্ষতি আবার **দুই প্রকারের** হইতে পারে। যেমন, (ক) **সাধরণ আংশিক ক্ষতি** (General Average Loss) এবং (খ) **বিশেষ আংশিক ক্ষতি** (Particular Average Loss) বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য অথবা নিরাপত্তার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে যে ক্ষতি সাধন করা হয় তাহাকে **সাধরণ আংশিক ক্ষতি** বলে। যেমন, সমুদ্রে জাহাজ চলাকালীন ঝড় উঠিলে ঐ জাহাজকে রক্ষা করার জন্য কিছু পণ্য ঐ জাহাজ হইতে জলে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে জাহাজটি রক্ষা পাইতে পারে। এই সকল অবস্থায় সকল পক্ষই ঐ নিক্ষিপ্ত পণ্যের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইহার ফলে বীমাকারীর নিকট হইতে ঐ সকল পক্ষ আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ লাভ করে।

অপরদিকে ঐ জাহাজ অথবা উহার বিষয়বস্তু যদি কোন কারণে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে উহাকে **বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলে**। **আগুন** কারণে কোন ক্ষতি হইলে তাহার জন্য বীমাকারী ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে।

বিশেষ আংশিক ক্ষতি নির্দ্ধারণের পদ্ধতি (Method of determination of particular average loss):—

বিশেষ আংশিক ক্ষতি কি প্রকারে নির্দ্ধারণ করিতে হয় তাহা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; যেমন ;

মনে করা যাক, আমরা কলিকাতা বন্দর হইতে বোম্বাই বন্দরে ২০,০০০ গাঁইট কাঁচা পাট রপ্তানী করিব। ঐ পণ্য রওনা হইয়া গেল। পথিমধ্যে জল লাগিয়া ভিজিয়া গিয়া ১০০০ গাঁইট পাট আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইল। আমাদের ঐ পণ্যের ক্রয়মূল্য ছিল ৩০০ টাকা প্রতি গাঁইট। ক্ষতিগ্রস্থ গাঁইটগুলি ২০০ টাকা দরে এবং অবশিষ্ট

গাইটগুলি ৪০০ টাকা দরে বোম্বাইয়ে বিক্রয় করা হইল। এক্ষেত্রে পণ্য মালিক বীমাকারীর নিকট হইতে নিম্ন পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করিবে।

বীমাকৃত পণ্য মূল্য :—

৩০০ টাকা দরে ২০,০০০ গাঁইটের দাম = ৬০,০০,০০০ টাকা।

ক্ষতিগ্রস্থ ১০০০ গাঁইটের

বীমাকৃত মূল্য = ১০০০ × ৩০০ = ৩,০০,০০০ টাকা।

ঐ ১০০০ গাইট ক্ষতিগ্রস্থ না হইলে ৪০০ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া (৪০০ × ১০০০) টাকা পাওয়া যাইত } ৪,০০,০০০ টাকা।

কিন্তু প্রকৃত বিক্রয় মূল্য (১০০০ গাইটের) (১০০০ × ২০০) } ২,০০,০০০ টাকা।

সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ = ২,০০,০০০ টাকা।

কিন্তু উহার বীমাকৃত মূল্যের ক্ষতির পরিমাণ = $\frac{২,০০,০০০ \times ৩,০০,০০০}{৪,০০০০০}$

= ১,৫০,০০০ টাকা।

অতিরিক্ত অন্যান্য খরচ (ধরিলাম) = ৫০,০০০ „

বীমা গ্রহীতার দাবির পরিমাণ হইবে = ২,০০,০০০ টাকা।

নৌ-বীমার গুরুত্ব (Importance of Marine Insurance) :—

সামুদ্রিক বিপদ হইতে জাহাজকে রক্ষা করার জন্য বীমা কোম্পানীর সহিত যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাকে নৌ-বীমা বলে।

এই বীমার গুরুত্ব সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(১) জলপথে জাহাজ যাওয়ার সময় বিভিন্ন কারণে উহা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে। ইহাতে শুধুমাত্র জাহাজটি নষ্ট হয় না, উহাতে যে পণ্য থাকে তাহা এবং জাহাজের মাশুল উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। ফলে জাহাজের মালিক, পণ্যের মালিক, এবং মাশুলের মালিক সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জাহাজ, পণ্য এবং মাশুলের মালিক এই বিপদ হইতে নিজেকে আর ঠিক ভাবে রক্ষা করিতে পারে না। ফলে অনেকসময় উহারা আর ব্যবসাও করিতে পারে না। কারণ, ঐ প্রকার ক্ষতিতে সর্বস্বান্ত হইয়া যাইতে পারে। সেজন্য যদি এমন কোন প্রতিষ্ঠান থাকে যাহারা এইরূপ

ক্ষতিপূবণ দিতে রাজী থাকিবে তবে ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ হয়ত আবার ব্যবসা পবিচালনা করিতে পারিবে। কাবণ, তাহাবা ক্ষতিপূবণ পাইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের আব সর্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ ক্ষতিপূরণ বীমাকোম্পানীই কবিয়া থাকে। সুতরাং, ঐ প্রকাব ক্ষতিপূরণ প্রদান কবিয়া বীমা কোম্পানী ব্যবসা জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়াছে।

(২) বৈদেশিক-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই বীমা কোম্পানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। কারণ, বিদেশে পণ্য পাঠাইলে উহা পথিমধ্যে চুবি-ডাকাতি হইতে পাবে। ইহাতেও মালিকেব লোকসান হয়। সেজন্য বীমা কোম্পানী এই সকল স্থানে ক্ষতিপূবণ কবিয়া মালিকেব লোকসান পোষাইয়া দেয়। ইহাতে মালিক পুনরায় পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিতে উৎসাহ বোধ করে। এবং ইহার ফলেই বৈদেশিক অর্থ আয় সম্ভব হয়। সুতবাং, আমবা বলিতে পারি যে বীমা কোম্পানী আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যেও যথেষ্ট সহয়তা কবে। আমাদেব ব্যবসাবাণিজ্য যে এই বীমা কোম্পানীর জন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাতে আর কারও দ্বিমত নাই।

অগ্নিবীমার অর্থ, এবং উহা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ দাবীর পদ্ধতি

(Meaning of Fire Insurance Policy, the method of taking out a Fire Policy and making a claim on it) :—

অগ্নি হইতে কোন সম্পত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ ক্ষতিপূবণ পাইবার জন্য বীমা কোম্পনীব সহিত যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাকে **অগ্নিবীমা বলে।**

এইরূপ একটি অগ্নিবীমা **গ্রহণ করিতে** হইলে **নিম্নলিখিত পদ্ধতি** অনুসবণ করিতে হয়।

(ক) যিনি এইরূপ বীমা গ্রহণ করিতে আগ্রহী তাহাকে বীমা কোম্পানীর নিকট একখানা আবেদনপত্র পেশ করিতে হয়।

(খ) বীমা কোম্পানী ঐ আবেদন পত্র পাইয়া বিচাব করিয়া ঐ বীমা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে একখানা ফর্ম পাঠাইয়া দেয়। এবার ঐ ব্যক্তি উহা পূরণ করিয়া, বীমার বিষয়বস্তুর সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিয়া বীমা কোম্পানীর নিকট উহা জমা দেয়।

(গ) ঐ লিখিত ফর্ম পাওয়ার পরে বীমা কোম্পানী ঐ সম্পত্তির অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিচার করিয়া দেখে এবং তাহার পরে উহার মাশুল নিরূপণ করিবার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির (Appraiser) নিকট অর্পণ করে। এবার ঐ ব্যক্তি মাশুল নির্ধারণ

করিয়া দেয়। প্রয়োজন বোধ করিলে ঐ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বীমার বিষয় বস্তু সরেজমিনে তদন্ত করিয়াও দেখিতে পারে। এই মাশুল স্থির হওয়ার পরে বীমা কোম্পানী ঐ বীমাগ্রহীতাকে মাশুল প্রদান করিতে বলে।

(ঘ) এবার মাশুল প্রদান করিলেই ঐ বীমাচুক্তি কার্যকর হয় এবং ইহার পরে বীমা কোম্পানী বীমাগ্রহীতাকে বীমাপত্র প্রদান করে।

(ঙ) ঐ মাশুলের জন্য বীমা কোম্পানী রসিদ প্রদান করে। এইরূপ প্রথম মাশুলের জন্য যে রসিদ প্রদান করা হয় তাহাকে **"কভার নোট"** (Cover note) বলে। এবং

(চ) বীমাপত্রে উহার মেয়াদ লেখা থাকে। ঐ মেয়াদ পূর্তির দিবসে অথবা আরও তিনদিনের মধ্যে ঐ বীমা নবীকরণ (Renewal) না করিলে ঐ তিনদিন পর হইতে বীমার মেয়াদ শেষ হয়।

অগ্নিবীমার দাবী জ্ঞাপনের পদ্ধতি :—

(১) অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ঐ খবর বীমা কোম্পানীকে জানাইতে হয়। ঐ খবর জানানোর পদ্ধতি এবং দাবী জানানোর পদ্ধতি সাধারণত বীমাপত্রেই লিখিত থাকে। তবে প্রায়শ ১৫ দিনের মধ্যে ঐ দাবী পেশ করিতে হয়।

(২) পণ্য আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তার পরিমাণ উহা হইতে কোন পণ্য উদ্ধার করা হইলে তাহার পরিমাণ এবং উহা উদ্ধার করিতে যে খরচ হইয়াছে তাহা বীমা কোম্পানীকে জানাইতে হয়।

(৩) গুদাম ঘর দগ্ধ হইলে উহা সারাই করিতে কি প্রকার খরচ হইতে পারে তাহা বীমা কোম্পানীকে জানাইতে হয়।

(৪) বীমাপত্রে পুনস্থাপনের (Re-Instatement) কথা বলা থাকিলে বীমা কোম্পানী উহা পুনস্থাপনে দায়ী থাকিবে।

(৫) অনেক ক্ষেত্রে দাবী আদায়ের জন্য আদালতের শপথ (Affidavit) লইতে হয়।

(৬) বীমা কোম্পানী ক্ষতি নিরূপণের জন্য নির্ণায়ক নিযুক্ত করে, এবং

(৭) ক্ষতিপূরণে মতবিরোধ দেখা দিলে সালিশী নিয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু প্রয়োজনে বিচারক নিযুক্ত হইতে পারেনা। ঐ প্রকারে দাবীর অর্থ আদায় করা হইয়া থাকে।

বিভিন্ন ধরণের অগ্নিবীমা (Various types of Fire Insurance Policies) :—

বিভিন্ন প্রকার অগ্নিবীমা দেখা গেলেও উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বীমাগুলিই অধিক পরিমাণে প্রচলিত।

(১) **মূল্যলিখিত বীমা** (Valued Policy) :—

এইরূপ বীমাপত্রে বীমার বিষয় বস্তুর মূল্য নির্ধারিত থাকে। এবং ঐ মূল্য যদি বীমা কোম্পানী স্বীকার করিয়া লয় তবে উহা এই প্রকার বীমাপত্রে উল্লেখ থাকে। ঐ রূপ পণ্যের ক্ষতি হইলে বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে উহার মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাওয়া যায়।

(২) **নির্দ্দিষ্ট মূল্য-বিমাপত্র** (Specific Value Policy) :—

এই বীমাতে সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী ক্ষতি পূরণ পাওয়া যায় না। এইরূপ বীমাতে একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য উল্লেখ থাকে এবং সম্পত্তির ক্ষতি হইলে ঐ পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। এইপ্রকার বীমাকে নির্দিষ্ট মূল্য-বীমাপত্র বলে।

(৩) **মুনাফা ক্ষতির বীমা** (Loss of Profit Policy) :—

অগ্নিতে শুধুমাত্র ব্যবসার ক্ষতি হয় না। অগ্নিদগ্ধ ব্যবসাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে কিছু সময় লাগে। যদি ব্যবসা ঐ সময় চলিত তাহা হইলে কিছু মুনাফা অর্জন করা যাইত, কিন্তু অগ্নিদগ্ধ হওয়ার জন্য ঐ সময় কোন মুনাফা হয় না। সেজন্য ঐ প্রকার মুনাফার জন্য ব্যবসায়ী একটা বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পারে। এই প্রকার বীমাকে মুনাফা ক্ষতির বীমা বলে।

(৪) **চলমান বীমা** (Floating Policy) :—

যে সকল দ্রব্যের পরিমাণ পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন স্থানে মজুত থাকে তাহাদের সম্পর্কে কোন বীমাপত্র গ্রহণ করিলে তাহাকে চলমানবীমা বলে। এই প্রকার বীমাতে নির্দিষ্ট পণ্য বা স্থানের উল্লেখ করা হয় না।

(৫) **পুনঃসংস্থাপন শর্ত বীমাপত্র** (Re-Instatement Clause Policy) :—

যে বীমাপত্রে ক্ষতিপূরণ না দিয়া ঐ পণ্য বা বস্তু পুনঃসংস্থাপন করিয়া দেওয়া হয় তাহাকে পুনঃসংস্থাপন শর্ত বীমাপত্র বলে। এবং

(৬) **মীমাংসাযোগ্য বীমাপত্র** (Adjustable Policy) :—

যে বীমাতে পণ্যের মূল্য স্থির না করিয়া প্রথমত বীমার মাশুল দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে ঐ পণ্যমূল্য স্থির করা হয় তাহাকে মীমাংসাযোগ্য বীমাপত্র বলে। বীমার পরিমাণ কম বেশী হইলে ভবিষ্যতে উহা মীমাংসা করিয়া লওয়া হয়।

সাধরণবীমা জাতীয়করণের সুবিধা ও অসুবিধা (Nationalisation General Insurance—Its Merits and Demerits) :—

১৯৫৬ সালে আমাদের দেশে জীবনবীমা জাতীয়করণ করা হয়। এই জীবনবীমার ন্যায় সাধরণ বীমাকেও জাতীয় করণে অনেকেই উৎসাহী। সাধরণ বীমাকে জাতীয়করণ করা হইলে উহা হইতে নিম্ন লিখিত **সুবিধা সকল** পাওয়া যাইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

(১) জাতীয়করণ করা হইলে আর প্রতিযোগিতা থাকিবে না ফলে বিভিন্ন প্রকার অপচয় ও অসাধু ব্যবহার দূর হইবে।

(২) জাতীয় করণ করা হইলে উহা হইতে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা বিভিন্ন প্রকার শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করা যাইবে।

(৩) জাতীয়করণ করা হইলে ইহার উপর জনগণের আস্থা অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

(৪) জাতীযকরণ করা হইলে মাশুলের পরিমাণ অনেক কম হইবে; কারণ, মুনাফা অর্জনই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে না।

(৫) জাতীয়করণ করা হইলে কর্মীদের কাজের স্থায়িত্ব দেখা দিবে এবং বেতনে সমতা আসিবে। ইহাতে কর্মীরা কাজে উৎসাহ প্রকাশ করিবে।

কিন্তু জাতীয়করণ করা হইলে ইহা হইতে শুধুমাত্র সুবিধা পাওয়া যাইবে এ কথা চিন্তা করা উচিত নহে। জাতীয়করণের ফলে বিভিন্ন প্রকার সমস্যাও দেখা দিবে। এই সকল সমস্যা বা **অসুবিধা** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় :—

(১) জাতীয়করণের ফলে বে-সরকারী উদ্যম সমূহ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

(২) জাতীয়করণ করা হইলে উহা হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা দিয়া বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যকে সাহায্য করা যাইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্ভব হইবে না। কারণ, জীবনবীমা হইতে যত অর্থ পাওয়া গিয়াছিল সে পরিমাণ অর্থ সাধরণ বীমা জাতীয়করণ দ্বারা পাওয়া যাইবে না। কারণ, ইহাতে মাশুল হইতে আয় জীবনবীমা অপেক্ষা অনেক কম।

(৩) জাতীয়করণের দ্বারা উচ্চস্তরের বেতন বৃদ্ধি পাইবে। ফলে ইহা একটি ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। এবং সে জন্য বীমার মাশুল জাতীয়করণ দ্বারা হ্রাস পাইবে না।

(৪) জাতীয়করণ করা হইলে আমলাতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা এখানেও চালু হইবে। স্বজন পোষন, দীর্ঘসূত্রিতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রভৃতি দেখা দিবে।

কিন্তু উপরোক্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনেকে সাধরণ বীমার জাতীয়করণ সমর্থন করেন। কারণ, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠন করিতে হইলে এই প্রকার জাতীয়করণ একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু আমাদের ভারত সরকার সাধরণ বীমার জাতীয়করণে পক্ষপাতী নহে। কারণ, সেটা তাহার বীমা ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নীতি হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বীমা ক্ষেত্র হইতে দুর্নীতি দূর হইবে এবং বীমাকারীদের স্বার্থও অনেকাংশে রক্ষিত হইবে।

বিভিন্ন প্রকার জীবনবীমা (Different kinds of Life Policies) :—

জীবনবীমা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। উহাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিতগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) **মেয়াদী বীমাপত্র** (Endowment Assurance Policy) :—

এই পদ্ধতিতে বীমাকারী ৫, ১০, ১৫ ইত্যাদি বৎসর পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে মাশুল দিয়া যায়। ঐ সময়ের মধ্যে বীমাগ্রহণকারীর মৃত্যু ঘটিলে তাহার উত্তরাধীকারী ঐ অর্থ পাইবে। আর তাহার মৃত্যু না হইলে ঐ সময় পরে তিনি নিজেই ঐ বীমার অর্থ পাইবেন। এই মেয়াদী বীমাপত্র **দুই প্রকারের** হইতে পারে। যেমন (ক) **মুনাফা সমেত** (Writh Profit) এবং (খ) **মুনাফা ছাড়া** (Without Profit)। মুনাফা সমেত বীমায় কোম্পানীর যে লাভ হয় তাহার কিছু অংশ বীমা গ্রহীতাও পাইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার বীমায় মাশুলের পরিমাণ একটু বেশী হয়।

মুনাফা ছাড়া বীমাতে কোম্পানীর যে লাভ হয় তাহার অংশ বীমা গ্রহীতা পায় না। ইহাতে বীমা-মাশুলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। এবং যত টাকার পলিসি লওয়া হয় সেই টাকাই বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে পাওয়া যায়।

(২) **সারাজীবন বীমাপত্র** (Wholelife Policy) :—

ইহাকে **আজীবন** বীমাও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে বীমা গ্রহীতা তাহার জীবিত-কালে ৮০ বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত মাশুল দিয়া যায়। যদি কোন কারণে তাহার মৃত্যু

ঘটে তবে তাহার উত্তরাধিকারী ঐ টাকা বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে পাইয়া যায়। অথবা বীমাগ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তি ঐ টাকা পাইয়া থাকে। এই বীমাও **দুই প্রকার** হইতে পারে, যথা—(ক) **মুনাফা সমেত** এবং (খ) **মুনাফা ছাড়া**। এই সারাজীবন বা আজীবন বীমাপত্রের কতকগুলি **সুবিধা** আছে। এই সুবিধাগুলি নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

(ক) বীমাকারীর মৃত্যুতে ঐ পরিবারের ক্ষতি হয়। ঐ সময় ঐ বীমার টাকা পাইলে ঐ পরিবার কিছুটা আর্থিক দুর্গতি মুক্ত হইতে পারে।

(খ) অন্যান্য বীমাপেক্ষা এই বীমার মাশুলের হার অনেক কম। সুতরাং, বীমাকারী ঐ সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

(গ) বীমাকোম্পানীর নিকট হইতে $\frac{1}{2}$ অর্থ পাইয়া উত্তরাধিকারীরা সহজেই সম্পত্তিকর (Estate duty) দিতে পারেন। এবং

(ঘ) মুনাফা সমেত বীমা হইলে সে ক্ষেত্রে পলিসিতে বর্ণিত অর্থ অপেক্ষা বেশী অর্থ বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে পাওয়া যায়। এই প্রকার বীমার **অসুবিধা** :—

(ক) জীবিতকালের ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বীমার মাশুল ইহাকে দিতে হয়। ইহা একটা কষ্টকর ব্যাপার। এবং

(খ) বীমাকারী যখন বৃদ্ধ হয়, তাহার চাকুরী থাকে না, তখন তাহার পক্ষে মাশুল পরিশোধ দুর্বিসহ হইয়া উঠে।

মেয়াদী বীমাপত্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Endowment Assurance Policy) :—

সুবিধা	অসুবিধা
(১) এই পদ্ধতিতে সারাজীবন মাশুল দিতে হয় না। সেজন্য বৃদ্ধ বয়সে চিন্তার কিছুই নাই।	(১) আজীবন বীমা অপেক্ষা এই বীমাতে বীমা-মাশুলের পরিমাণ অনেক বেশী।
(২) বীমাকারীর হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারকে আর্থিক অসুবিধায় পড়িতে হয় না।	(২) জীবিতকালে বীমাকারী যদি ঐ অর্থ পাইয়া যান তবে তিনি তাহা খরচ করিয়া ফেলিবেন।
(৩) বৃদ্ধ বয়সে এরূপ বীমার অর্থ পাইলে যে-কোন বৃদ্ধই খুশী হইবেন এবং শান্তিতে জীবনযাপন করিতে পারিবেন।	(৩) এরূপ ক্ষেত্রে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পরিবার আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়িবে।

(৩) **নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমা-মাশুল প্রদেয় সারাজীবন বীমাপত্র** (Whole Life Policy with Limited Payments) :—

এই বীমাতে বীমাকারী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শুধু মাশুল প্রদান করেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে যদি তাহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তিনি ঐ বীমার টাকা পাইবেন না। এই প্রকার বীমাও মুনাফা সমেত এবং মুনাফা ছাড়া এই দুই প্রকারের হইতে পারে।

(৪) **একক জীবনবীমা** (Single Life Policy) :—

একজন ব্যক্তির জীবনের উপর এই প্রকার বীমা গৃহীত হয়। তিনি জীবিতকালে মাশুল প্রদান করেন। তাহার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীরা এই বীমার টাকা পাইয়া থাকে।

(৫) **যৌথ জীবনবীমা** (Joint Life Policy) :—

একই বীমাপত্রে যখন একাধিক ব্যক্তির জীবনের উপর বীমা গৃহীত হয় তখন তাহাকে যৌথ জীবনবীমা বলে। চুক্তি অনুযায়ী বীমাগ্রহীতারা মাশুল প্রদান করেন। কোন কারণে যে কোন একজন মারা গেলে অবশিষ্ট বীমাগ্রহীতারা অর্থের দাবী করিতে পারেন। এই প্রকার বীমা সাধারণত অংশীদারী কারবারে দেখা যায়।

(৬) **সন্তানের জীবনের উপর বীমা** (Policy upon the lives of the children) :—

এই প্রকার বীমাতে মাতাপিতা তাহাদের সন্তানের শিক্ষা, বিবাহ, প্রভৃতির জন্য বীমা গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতেও চুক্তিমত মাশুল দিতে হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে এই প্রকার বীমার টাকা পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলেও বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে অর্থ পাওয়া যায়।

জীবনবীমার উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ (Principal Clauses in the Life Insurance Policy) :—

(১) **বয়সের প্রমাণ** (Proof of Age) :—

জীবন-বীমা গ্রহণের সময় বয়সের প্রমাণ দেখাইতে হয়। এই বয়সের প্রমাণ দেখাইতে জন্ম-নিবন্ধনের প্রত্যয় পত্র, **ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট** বা ঠিকুজি প্রভৃতি দেখাইতে হয়।

(২) **বাজেয়াপ্তকরণ** (Forfeiture Clause) :—

বীমা গ্রহণের সময়ে কোন তথ্য গোপন করিলে, বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকিলে ঐ বীমা চুক্তি যে কোন সময়ে বাতিল হইয়া যাইতে পারে।

(৩) **বাজেয়াপ্ত রদকরণ** (Non-Forfeiture Clause) :—

বীমা-পত্র গ্রহণের পর যদি বীমাকারী উহার মাশুল ঠিকমত দিতে না পারেন তবে বীমা চুক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বীমাকারী যদি দুই বৎসর ঠিকমত দিয়া তাহার পরে আর দিতে না পারেন তবে উহা আর নষ্ট হয় না। বীমা চুক্তির সময় অন্তে ঐ প্রদত্ত মাশুলের কিছু অর্থ বীমাকারীর উত্তরাধিকারী পাইয়া থাকেন। আর বীমাকারী নিজে বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিজেই পাইতেন।

(৪) **প্রত্যর্পণ মূল্য** (Surrender Value) :—

কমপক্ষে দুই বৎসর অথবা সমস্ত বীমা সময়ের এক-দশমাংশ কাল পর্যন্ত মাশুল প্রদান করিলে বীমাপত্রের প্রত্যর্পণ মূল্য পাওয়া যায়।

(৫) **হস্তান্তরকরণ ও মনোনয়ন** (Assignment and Nomination) :—

বিশেষ প্রয়োজনে বীমাপত্র হস্তান্তর করা যায়। এই প্রকার হস্তান্তর অধমর্ণ উত্তমর্ণকে করিতে পারে, এবং স্নেহের দরুন আত্মীয়স্বজনকেও করা যায়। পৃষ্ঠাঙ্কন দ্বারা অথবা উপযুক্ত দলিলের সাহায্যে এই হস্তান্তরকরণ সম্পাদন করা যায়। বীমা কোম্পানীকে এই প্রকার হস্তান্তরকরণের কথা আগে জানাইতে হয় অন্যথায় আইনত উহা সম্পাদন করা যায় না। এই প্রকার হস্তান্তরকরণে যিনি হস্তান্তর করেন তিনি কোন প্রকার মূল্য গ্রহণ করেন না, কারণ, স্নেহ ও প্রীতির আকর্ষণেই উহা করা হয়।

পক্ষান্তরে বীমাকারীর মৃত্যুর পরে বীমার অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদানের নির্দেশ থাকিতে পারে। এই প্রকার নির্দেশকে মনোনয়ন (Nomination) বলে। এই মনোনয়ন বীমাকৃত ব্যক্তি বাতিল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু হস্তান্তর বাতিল করা যায় না। এই মনোনয়ন নির্দিষ্ট প্রপত্র (form) পূরণ করিয়া অথবা বীমাপত্রের পৃষ্ঠ-সহি করিয়াও করা যায়।

(৬) **ঋণ** (Loan) :—

প্রয়োজনে বীমাগ্রহীতা বীমাপত্র কোম্পানীর নিকট জমা রাখিয়া উহার প্রত্যর্পণ-মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগ অর্থ ঋণ লইতে পারে। এই প্রকার ঋণের জন্য বীমা কোম্পানী উচ্চ হারে সুদ আদায় করিয়া লয়।

জীবনবীমার মাশুল (Premium of Life Insurance Policy) :—

জীবন-বীমা গ্রহণ করিলেই তাহার জন্য মাশুল দিতে হয়। এই প্রকার মাশুল সাধারণত নিম্নরূপে নির্দ্ধারিত হয়।

(ক) বীমা-গ্রহীতার জীবিত থাকার সময় বা সম্ভাবনা।

(খ) দেশের মৃত্যুহার এবং উহার তালিকা।

(গ) ব্যয়ের হার এবং

(ঘ) চক্রবৃদ্ধি সুদের হার।

বিভিন্ন বীমাকারীর নিকট হইতে যে মাশুল আদায় হয় তাহাই বীমা-কোম্পানী প্রয়োজনে বীমা-গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিয়া থাকে। সুতরাং, আমরা বলিতে পারি যে, এই পদ্ধতিতে বীমা কোম্পানী বীমাকৃত ব্যক্তির মধ্যে ঝুঁকির পরিমাণ বিস্তার করিয়া দেয়। এজন্য বীমার মাশুল অতি সূক্ষ্মভাবে হওয়া দরকার। অন্যথায় বীমা-কোম্পানীর লোকসান হইয়া যাইবে। এই বীমা মাশুল বিভিন্ন বয়সের লোকের জন্য বিভিন্ন প্রকার হয়। একজন বালক ও একজন বৃদ্ধের বীমার মাশুল এক হইতে পারে না। তাহা হইলে বালকের লোকসান হইবে এবং অপরদিকে বৃদ্ধ লাভবান হইবে। সেজন্য বীমাগ্রহীতার বাঁচিয়া থাকার সম্ভাবনা ও মৃত্যুর আশঙ্কা এই দুইটি বিষয়ের উপর মাশুল নির্ণয়ের সময় যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করিতে হয়।

ইহার পরে দেখিতে হইবে যে ঐ বীমাকারীর নিকট হইতে যে মাশুল আদায় করা হইবে তাহা চক্রবৃদ্ধি হার সুদে ঐ বীমা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কত হইবে। যদি ইহা অপেক্ষা বীমাগ্রহীতার প্রদত্ত অর্থ বেশী হয় তবে লোকসান হইয়া যাইবে। সেজন্য মাশুল নির্ণয় অতি যত্নের সহিত করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের যে অংশ বীমার মাশুলের সহিত যুক্ত করা হয় তাহাকে Loading বা Margin বলে।

জীবন বীমাপত্র গ্রহণ ও উহার দাবী পেশের পদ্ধতি (Method of taking out a Life Insurance Policy and making a Claim on it) :—

জীবনবীমা গ্রহণের জন্য সাধারণত **নিম্নলিখিত পদ্ধতি** গৃহীত হয়।

(ক) বীমার কোনও প্রতিনিধির সহিত যোগাযোগ করিতে হয়। এবং নির্দিষ্ট ফর্মে বীমা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিতে হয়। উহাতে সাধারণত নাম, পিতার নাম, জাতি, ধর্ম, পেশা, বয়স, ঠিকানা, প্রভৃতি থাকে। এবং মাশুল প্রদানের পদ্ধতিও এই ফর্মে লিখিতভাবে জানাইতে হয়।

(খ) এবার ডাক্তারী পরীক্ষা। অর্থাৎ, ডাক্তার ঐ বীমাকরীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া রিপোর্ট ভাল দিলে তবেই বীমা করিতে পারিবে।

(গ) ইহার পর প্রতিনিধিও তাহার মতামত প্রকাশ করেন। যেমন, তাহার আয় অনুযায়ী বীমা গৃহীত হইয়াছে কিনা, নিয়মিত মাশুল দিতে পারিবে কিনা; ইত্যাদি।

(ঘ) উপরোক্ত রিপোর্ট ও লিখিত ফর্মটি পাওয়ার পরে উহা ভালভাবে দেখিয়া বীমা কোম্পানী বীমা গ্রহীতাকে মাশুল প্রদানের আদেশ দেন। এবার ঐ বীমাকারী মাশুল প্রদান করেন। এবং

(ঙ) মাশুল প্রদত্ত হইলে বীমা কোম্পানী প্রথম মাশুলের প্রাপ্তির রসিদ প্রদান করে। ইহার পরে বীমা কোম্পানী বীমাগ্রহীতাকে তাহার বীমাপত্র পাঠাইয়া দেয়। ইহার পর হইতে বীমাকারীকে নিয়মিত মাশুল দিতে হয়।

বীমাগ্রহীতা তাহার **দাবী নিম্নরূপে জানাইতে** পারেন :—

(১) জীবিত থাকাকালীন বীমার মেয়াদ পূর্তি হইলে বীমাকারী ইহার প্রায় একমাস পূর্বে লিখিতভাবে তাহার দাবির কথা বীমা কোম্পানীকে জানাইবে।

(ক) বয়সের গণ্ডগোল থাকিলে বীমাকারী তাহা প্রমাণ করিবে।

(খ) প্রয়োজনে বীমাপত্র এবং বোনাস সার্টিফিকেটও দেখাইতে হইবে।

(গ) দাবী পরিশোধের রসিদ দেখাইতে হইবে।

(ঘ) ইহার পরে বীমাকারী টাকা পাইবে।

(২) বীমাকারীর যদি মৃত্যু হয় তবে মৃত্যুর পর দাবী পেশ করিতে হয়। এই মৃত্যু সংবাদ বীমা কোম্পানীকে জানাইতে হয়। ইহার পরে ঐ কোম্পানীর নিদেশমত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পেশ করিতে হয়। যেমন,

(ক) বয়সের প্রমাণ দলিলপত্র।

(খ) চিকিৎসকের-মৃত্যুর প্রত্যয় পত্র।

(গ) কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন মৃত্যু হইলে মালিকের নিকট হইতে প্রত্যয় পত্র।

(ঘ) এই মৃত্যু সম্পর্কে কোন সম্মানীত ব্যক্তির চিঠি।

(ঙ) মনোনীত বা স্বত্বনিয়োগী প্রাপক।

(চ) ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়েত, প্রভৃতি হইতে মৃত্যু সংক্রান্ত বিবরণ ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া তবেই বীমা কোম্পানী বীমার অর্থ-প্রদান করিবে। এবং দাবীদারের নিকট হইতে দাবী পরিশোধের রসিদ করাইয়া লইবে।

জীবনবীমা জাতীয়করণের কারণ, উহার সুবিধা ও অসুবিধা, জীবনবীমা কর্পোরেশন সংগঠন এবং উহার প্রশাসন ব্যবস্থা (Why was the Life Insurance business Nationalised ? Its Merits and Demerits, Organisation and Managment of Life Insurance Corporation) :—

১৯৫৬ সালে ভারতীয় জীবনবীমাকে জাতীয়করণ করা হয়। যে সকল **কারণে** এই জাতীয়করণ করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :—

(১) বীমাকোম্পানীর কাগজপত্র, হিসাবরহি পরীক্ষা করিয়া দেখার মত কোন লোক ছিল না, এমনকি কাহারও উহা পরীক্ষা করার ক্ষমতাও ছিল না। ফলে বীমা কোম্পানীর তহবিল তছরূপ হইত। বাজে লগ্নীতে অর্থবিনিয়োগ হইত, অসত্য তথ্য প্রকাশ করিত, প্রভৃতি। সেজন্য ইহাকে জাতীয়করণ করা হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রচুর অর্থের দরকার ছিল। সেজন্য ইহা জাতীয়করণ করা হইলে উহা হইতেও অনেক অর্থ পাওয়া যাইবে এবং সেই অর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করা যাইবে। সেজন্য বীমা কোম্পানীকে জাতীয়করণ করা হয়।

(৩) দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি, বীমাকারীর স্বার্থ রক্ষা, পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করা, প্রভৃতির জন্যই জীবনবীমা-ব্যবসাকে জাতীয়করণ করা হয়। ইহাতে মাশুলের পরিমাণ কম হইবে এবং অপচয় দূর হইবে।

(৪) জাতীয়করণ করা হইলে জীবন-বীমা আরও দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া যাইতে পারিবে এবং দক্ষ পরিচালনার সুযোগ লাভ করিবে। এই সকল কারণে ১৯৫৬ সালে আমাদের দেশে জীবনবীমাকে জাতীয়করণ করা হয়।

জাতীয়করণের সুবিধা :—

(১) জাতীয়করণের দ্বারা প্রতিযোগিতা দূর হইবে এবং অপচয় বন্ধ হইবে।

(২) ইহার অর্থ দেশের শিল্পের উন্নতিতে বিনিয়োগ করা যাইবে এবং তাহা হইতে জনস্বার্থ রক্ষিত হইবে।

(৩) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থের কিছু অংশ ইহা হইতে পাওয়া যাইবে।

(৪) জাতীয়করণের ফলে ইহার উপর জনগণের আস্থা অধিক হইবে।

(৫) মুনাফা অপেক্ষা জাতীয়করণে সেবাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিবে।

(৬) কর্মীদের বেতনে সমতা আসিবে এবং কাজে তাহারা উৎসাহ পাইবে। কারণ, চাকুরী যাইবার ভয় আর থাকিবে না।

জাতীয়করণের অসুবিধা ঃ—

(১) ব্যক্তিগত উদ্যমের অভাবে ইহাতে দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালিত হইবে না। কারণ, কর্মচারীরা নিয়মমাফিক কাজ করিয়া যাইবে।

(২) ইহাতে প্রতিযোগিতা থাকিবেনা। ফলে বীমার মাশুল বেশী হইতে পারে।

(৩) ইহা একটি ব্যয় বহুল প্রতিষ্ঠান। কারণ, উর্দ্ধতন কর্মীর বেতন ইহাতে অনেক বেশী দিতে হয়।

(৪) ইহাতে প্রতিটি স্তরে আমলাতন্ত্রের দাবী দেখা দিবে। ফলে কর্মীদের স্বার্থ উপেক্ষিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া স্বজন পোষণ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, তৎপরতার অভাব, প্রভৃতি দেখা দিবে। এবং

(৫) গ্রামাঞ্চলে ইহার উন্নতি হয় নাই।

জীবনবীমা কর্পোরেশনের সংগঠন ও পরিচালনা ঃ—

জীবনবীমা কর্পোরেশন আইনঅনুযায়ী ভারতীয় সমস্ত জীবনবীমা ১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর একটি স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সংস্থার মোট পুঁজির পরিমাণ ৫ কোটি টাকা, এবং সমস্তটাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত।

একটি পর্ষদের উপর এই সংস্থার পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে। এই পর্ষদের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। উহাদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান। আবার ৫ জন সদস্য লইয়া একটি কার্যকরী সমিতিও গঠিত হইয়াছে। এই কর্পোরেশনের নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুসারে স্থির করা যায়। ব্যবসায়িক নীতির ভিত্তিতে ইহা পরিচালিত।

এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় অফিস বোম্বাইয়ে অবস্থিত। পরিচালনার সুবিধার জন্য এই কর্পোরেশানকে ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং উহাদের একটি করিয়া আঞ্চলিক অফিস রহিয়াছে। এবং এই আঞ্চলিক অফিস পরিচালনার জন্য একজন করিয়া আঞ্চলিক কর্মকর্তা রহিয়াছেন। প্রত্যেকটি অঞ্চলকে আবার সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করিবার জন্য কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং প্রতিটি বিভাগে আবার একজন করিয়া বিভাগীয় কর্মকর্ত্তা আছেন। ঐ বিভাগকে আবার কাজের সুবিধার জন্য কয়েকটি শাখাতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সকল শাখা পরিচালনা করেন শাখা কর্মকর্ত্তা।

ইহার আবার একটি বিনিয়োগ কমিটি আছে। ইহার সভ্য সংখ্যা ৭ জন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই কমিটি পরামর্শ প্রদান করেন।

এই সংস্থার বিনিয়োগ যোগ্য অর্থ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুমোদিত সিকিউটিরিতে, যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে, ঋণপত্রে, প্রভৃতিতে বিনিয়োগ করা হয়।

বীমায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার শব্দ (Various terms used in Insurance) :—

(১) **পুনর্বীমা** (Re-Insurance) :—

অনেক সময় রেল, নৌ, প্রভৃতির ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য অন্যান্য বীমাকারীগণের সহিত পৃথক পৃথক চুক্তি করিতে পারে। এই প্রকার বীমাকে পুনর্বীমা বলে। এই প্রকার বীমার মাশুলের পরিমাণ মূলবীমার মাশুল অপেক্ষা কম থাকে।

(২) **যুগ্মবীমা** (Double-Insurance) :—

একই বীমার বিষয়বস্তুর সহিত যখন বীমা গ্রহীতা বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তাহাকে যুগ্মবীমা বলে। এক্ষেত্রে বীমার বিষয়বস্তুর ক্ষতি হইলে ঐ বীমাগ্রহীতা ঐ বিষয়বস্তুর মূল্য অপেক্ষা বেশী টাকা আদায় করিতে পারে না। ঐ বিষয়বস্তুর ক্ষতি পূরণের সময় বিভিন্ন বীমা কোম্পানী (যাহাদের সহিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে) আনুপাতিক হারে ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকে। যদি কোন কারণবশত কোন বীমা কোম্পানী তাহার প্রকৃত আনুপাতিক অর্থ অপেক্ষা বেশী প্রদান করে তবে ঐ বেশী অর্থ অন্যান্য বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে।

(৩) **সামুদ্রিক বিপদ** (Perils of the Sea) :—

জাহাজ সমুদ্রে চলাকালীন বা থাকাকালীন যে বিপদ হইতে পারে তাহাকে সামুদ্রিক বিপদ বলে। ঝড়, তুফান, অগ্নি, প্রভৃতি কারণে এই বিপদ হইতে পারে। এই সামুদ্রিক বিপদ **দুই প্রকারের** হইতে পারে, যথা :—(ক) প্রাকৃতিক এবং (খ) অপ্রাকৃতিক।

ঝড়-তুফান, জাহাজে সংঘর্ষ, জল মগ্নতা, প্রভৃতিকে প্রাকৃতিক সামুদ্রিক বিপদ বলে। আর শত্রুপক্ষ কর্তৃক জাহাজ আক্রমণ, জাহাজের লোকদের দ্বারা কোন কারণে জাহাজের ক্ষতি, বন্দরের পণ্যদ্রব্য চুরি, প্রভৃতিকে অপ্রাকৃতিক সামুদ্রিক বিপদ বলে।

(৪) **জাহাজস্থিত পণ্য বন্ধক রাখিয়া ঋণ** (Bottomry) :—

অনেক সময় জাহাজ চলাকালীন কোন এক বন্দরে টাকার দরকার হইতে পারে। কারণ, জাহাজ সারাই করিতে হইবে। এক্ষেত্রে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজের পণ্য বন্ধক রাখিয়া ঐ প্রকার ঋণ সংগ্রহ করিতে পারেন। ঐ প্রকার ঋণ পরবর্তী বন্দরে শোধ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে জাহাজ বা উহার পণ্যের উপর অধ্যক্ষের কোন দাবী থাকে না। ঐ প্রকার ঋণপত্রকে জাহাজস্থিত পণ্য বন্ধক রাখিয়া ঋণ বলা হয়।

(৫) **পণ্য বন্ধক** (Respondention) :—

শুধুমাত্র জাহাজের পণ্য বন্ধক রাখিয়া যখন ঋণ গ্রহণ করা হয় তখন তাহাকে পণ্যবন্ধক পত্র বলা হয়।

(৬) **সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপণ** (Jettrsion) :—

সমুদ্রে বিপদ দেখা দিলে জাহাজকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে উহার পণ্য কিছু কিছু জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার নিক্ষেপকে সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপ বলে।

(৭) **নাবিক ও অধ্যক্ষ দ্বারা জাহাজের মালিককে প্রতারণা** (Barratry) :—

জাহাজের মালিককে ক্ষতিগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে যখন ঐ জাহাজের নাবিক ও অধ্যক্ষ জাহাজে পণ্য চুরি অথবা নষ্ট করে তখন তাহাকে Barratry বলে।

(৮) **আশু কারণ** (Causa Proxima Proximate Cause) :—

কোন নৌ-বীমার বিষয়বস্তু ক্ষতি বা নষ্ট হইলে যে আশু কারণের জন্য উহা সম্ভব হইয়াছে এবং উহার জন্য যদি বীমা করা থাকে তবে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাইতে পারে। প্রতি নৌ-বীমায় এই আশু কারণের নীতিই গৃহীত হইয়া থাকে।

(৯) **প্রতিকল্প উত্তমর্ণ** (Subrogation) : –

বীমাগ্রহীতা যখন বীমাকারীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পায় তখন বীমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে কোন অধিকার থাকিলে সে অধিকার বীমাকারীও পাইয়া থাকে। এ ব্যাপারে পূর্বেই চুক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। যে চুক্তির দ্বারা বীমাকারী ঐ সুবিধা বা অধিকার পায় তাহাকে প্রতিকল্প উত্তমর্ণ চুক্তি বলে। এবং ঐ নীতিকে প্রতিকল্প উত্তমর্ণ নীতি বলে।

(১০) **কভার নোট** (Cover Note) :—

বীমা চুক্তি সম্পাদিত হওযার পরে প্রথমে মাশুল দিলে উহার জন্য যে রসিদ পাওয়া যায় তাহাকে কভার নোট বলে। বীমাপত্র প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(১১) **নিস্তারণ** (Salvage) :—

জাহাজে বিপদ দেখা দিলে উহার পণ্য বা জাহাজকে রক্ষা করিবার জন্য তৃতীয় পক্ষের সাহায্য দরকার হইতে পারে। এই প্রকার সাহায্যের বিনিময়ে তৃতীয় পক্ষকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহাকে নিস্তারণ বলা হয়।

(১২) **নৌ-বীমার স্বত্বনিয়োগ** (Assignment of Marine Insurance Policy) :—

বীমা পত্রের অপর পৃষ্ঠে স্বাক্ষর দান করিয়া উহার স্বত্বনিয়োগ করা যায়। এরূপ স্বত্বনিয়োগ করিতে হইলে বীমার বিষয়বস্তুতে বীমা গ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকিতে হইবে।

(১৩) **অপহরণ বীমা** (Burglary Insurance) :—

ব্যবসা অথবা গৃহস্থ বাড়ীর সম্পত্তি চুরি অথবা অপহরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে বীমা গৃহীত হয় তাহাকে অপহরণ বীমা বলে।

(১৪) **সততা বীমা** (Fidelity Insurance) :—

অনেক সময় ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র বা সম্পত্তি কর্মচারীর নিকট থাকিতে পারে। উহা অসাধু কর্মীর হাতে পড়িলে নষ্ট হইতে পারে। ইহা হইতে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি দূর করিতে যে বীমা গৃহীত হয় তাহাকে সততা বীমা চুক্তি বলে।

(১৫) **দুর্ঘটনা বীমা** (Accident Insurance) :—

কোন বস্তু বা ব্যক্তি দুর্ঘটনা জনিত বিপদ হইতে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে। উহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বীমা কোম্পানীর সহিত যে চুক্তি সম্পাদিত করে তাহাকে দুর্ঘটনা বীমা বলে।

চার্টার পার্টির অর্থ এবং ইহার ধারাসমূহ (Meaning and Clauses of Charter Party) :

কোণ পণ্য পরিবহনের জন্য সমগ্র জাহাজ বা উহার অংশ বিশেষ ব্যবহার করিবার শর্তে পণ্যমালিক ও জাহাজের মালিকের ভিতরে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাকে চার্টার পার্টি বলা হয়।

এই প্রকার চুক্তিতে সাধরণত **নিম্নলিখিত ধারাসমূহ** থাকে।

(ক) চুক্তি যাহারা সম্পন্ন করিবেন তাহাদের নাম, ঠিকানা অর্থাৎ বর্ণনা।

(খ) চার্টারের শ্রেণী, অর্থাৎ সময় ভিত্তিক না সমুদ্রযাত্রা ভিত্তিক।

(গ) জাহাজ সমুদ্রে চলিতে পারিবে কিনা অর্থাৎ উপযুক্ত কিনা।

(ঘ) যে স্থানে জাহাজ থামিবে তাহার নাম।

(ঙ) পণ্য ও উহার মাশুলের বিস্তারিত বিবরণ।

(চ) যে সকল সামুদ্রিক বিপদের কথা চুক্তিতে নাই তাহার বর্ণনা।

(ছ) পণ্য বোঝাই ও খালাস করিবার পদ্ধতি ও সময়।

(জ) কোন্ জাহাজ কোন্ বন্দরে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী থাকিলে তাহার জন্য ক্ষতি পূরণের পরিমাণ।

(ঝ) জাহাজের অধ্যক্ষের ক্ষমতা ও কর্তব্য, এবং

(ঞ) চার্টারের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

চালানী রসিদ এবং চার্টার পার্টির সহিত উহার পার্থক্য (Meaning of Bill of Lading and the difference between Bill of Lading and Charter Party) :—

যখন পণ্য জাহাজের মাধ্যমে প্রেরণ করিতে হয় তখন জাহাজে পণ্য বোঝাই হইলেই জাহাজের অধ্যক্ষ উহার প্রাপ্তি স্বীকারের একটি রসিদ প্রদান করে। এবং ঐ পণ্য নির্দিষ্ট বন্দরে পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই প্রকার রসিদ আইনত হস্তান্তর যোগ্য দলিল নহে, কিন্তু পৃষ্ঠাঙ্কন দ্বারা অপর ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যায়। ইহাই চালানী রসিদ।

এই চালানী রসিদ এবং চার্টার পার্টির মধ্যে **পার্থক্য** নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

চালানী রসিদ	চার্টার পার্টি
(১) বহনপত্র হইল জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ের প্রমানপত্র।	(১) চার্টার পার্টি হইল পণ্য বহনের চুক্তি। ইহাতে জাহাজে সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে ভাড়া করিয়া লওয়া হয়।
(২) বহণ পত্রে জাহাজমালিক ও পণ্য প্রেরকের মধ্য যে চুক্তি হয় তাহার উল্লেখ থাকে না।	(২) পণ্যমালিক এবং জাহাজের মালিকের মধ্য যে চুক্তি হয় তাহা সমস্তই এই চার্টার পার্টিতে উল্লেখ থাকে।
(৩) ইহা পণ্যের মালিকানার একপ্রকার রসিদ। কারণ ইহা যাহার হাতে থাকিবে তিনি ঐ পণ্যের মালিক বলিয়া গণ্য হইবেন।	(৩) চার্টার পার্টি ঐ প্রকার পণ্যের মালিকানার কোন রসিদ নহে।
(৪) চালানী রসিদে হস্তান্তর যোগ্য দলিলের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কারণ, ইহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে।	(৪) চার্টার পার্টিতে হস্তান্তর যোগ্য দলিলের কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

ভারতের রপ্তানী ঝুঁকি-বীমা (Export Credit Guarantee Insurance of India)

বীমার গুরুত্ব বর্তমানে আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে অপরিসীম। জাহাজে পণ্য পাঠাইলে এবং বীমা করা না থাকিলে পণ্য বিনষ্ট হইলে মালিকের প্রচণ্ড ক্ষতি হইতে পারে। এমনকি তাহার পক্ষে হয়তো আর ব্যবসা করা সম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু ঐ পণ্যের জন্য বীমা করা থাকিলে পণ্যের মালিক বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে ঐ পণ্যর জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। ইহাতে তাহার লোকসানের বা ক্ষতির সম্ভাবনা আর থাকে না। পণ্য নষ্ট হইলেও ঐ প্রাপ্ত টাকা দিয়া পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারে।

কিন্তু এই প্রকার ক্ষতি ছাড়াও ব্যবসায়ীর অন্য একপ্রকার ক্ষতি হইতে পারে। ইহা টাকার বিনিময় হারের পার্থক্যের জন্য সম্ভব হয়। যেমন, পণ্য প্রেরণের সময় যে বিনিময় হার ছিল তাহা অপেক্ষা পণ্য পৌছনোর পর ঐ হার কমিতে পারে। এইরূপ বিনিময় হার কমিলে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয়। এবং এই প্রকার ক্ষতি উপরোক্ত বীমা দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয় না। এজন্য, এই ক্ষতি পূরণ কল্পে এবং রপ্তানী বাণিজ্যকে

আরও উন্নত করিবার জন্য ১৯৫৫ সালে ভারত-সরকার একটা রপ্তানী ঝুঁকি কমিশন গঠন করেন। এবং রপ্তানী ঝুঁকি কর্পোরেশন ইহার ফলেই স্থাপিত হয়।

সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে যে সকল ঝুঁকি গৃহীত হয় না সেই সকল ঝুঁকি বহনই এই রপ্তানী ঝুঁকি বীমার অন্যতম কাজ। রপ্তানী ক্ষেত্রে ঐ প্রকার ঝুঁকি বহনের ফলে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। এবং দেশের মঙ্গল হইবে। এই প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উভয় প্রকার ঝুঁকিই বহন করিয়া থাকে।

১৯৫৭ সালে অক্টোবর মাসে অনুমোদিত ৫ কোটী টাকা মূলধন লইয়া এই প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে। ইহার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা আদায়ী ২৫০,০০,০০০ টাকা প্রতিশ্রুত মূলধন ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে গড়িয়া উঠে। সরকার কর্তৃক মনোনীত সাতজন সদস্য লইয়া ইহার পরিচালক মণ্ডলী গঠিত। এবং ইহাকে বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটা উপদেষ্টা পরিষদও আছে। এই পরিষদের সভ্যসংখ্যা ২১ জন। ইহার কেন্দ্রীয় কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার ফলে রপ্তানী বাণিজ্যে ঝুঁকি অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান যে সকল ঝুঁকি বহন করে সাধরণভাবে তাহাকে দুই শ্রেণীতে ভাগকরা যায় যেমন, (১) জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ের পূর্ব্বের ঝুঁকি এবং (২) জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ের পরের ঝুঁকি। এই ঝুঁকি রপ্তানীকারী এবং করপোরেশন উভয়েই ভাগ করিয়া লয়। কোন কারণে:আমদানীকারী দেউলিয়া হইলে এই কর্পোরেশন মোট ঝুঁকির শতকরা ৮০ ভাগ এবং রাষ্ট্রনৈতিক কারণে ক্ষতি হইলে তাহার শতকরা ৮৫ ভাগ বহন করে। কিন্তু এই প্রকার বীমার প্রধান অসুবিধা হইল মাশুলের হার অত্যন্ত বেশী। তবে আশা করা যায় ইহার কার্যকলাপ আরও বৃদ্ধির সাথে সাথে মাশুলের হারও হ্রাস পাইবে। এই প্রতিষ্ঠান কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট তালিকাভুক্ত পণ্যের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানের মূলধনও প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। কিন্তু ইহার মধ্য হইতেই এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬২-৬৩. সাল পর্যন্ত ৪৬ কোটী টাকার দায়সম্পন্ন ১২৪৮টী বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. বীমা কাহাকে বলে ? উহার গুরুত্ব আলোচনা কর।
   (What is Insurance ? Discuss its importance).
2. বীমাচুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
   (Discuss the Features of Insurance Contract).

3 বিভিন্ন প্রকার বীমা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(Briefly discuss the various types of Insurance).

4. নৌ-বীমা গ্রহণ পদ্ধতি ও উহার ক্ষতিপূরণ দাবী পদ্ধতির বর্ণনা কর।

(Discuss the procedure for taking a Marine Insurance Policy and Making a claim on it).

5. নৌ-বীমার বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন প্রকারের নৌ-বীমা আলোচনা কর।

(Discuss the Subject matter of Marine Insurance and discuss the different types of Insurance Policy).

৬. নৌ-বীমার বিভিন্ন ধারা ও উহার অপরিহার্য শর্তগুলি বর্ণনা কর।

(Discuss the different clauses and warranty of Marine Insurance Policy).

7 নৌ-বীমার গুরুত্ব এবং উহার বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির উপর টীকা লিখ।

(Write notes on Importance and different types, of loss in Marine Insurance Business).

8. অগ্নিবীমা কাহাকে বলে ? উহা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণদাবীর পদ্ধতি আলোচনা কর।

(What is meant by Fire Insurance ? Discuss the method of taking out a fire Policy and making a claim on it).

9. অগ্নিবীমার বিভিন্ন ধারাগুলি বর্ণনা কর এবং বিভিন্ন প্রকার অগ্নিবীমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(Discuss the various clauses of Fire Insurance and discuss the various types of Fire Insurance Policies).

10. সাধারণ বীমা-ব্যবস্থা কি জাতীয় করণ করা উচিত ? তোমার উত্তরের যুক্তি দেখাও।

(Should General Insurance of the Country be Nationalised ? Give reasons for your answer).

11 বিভিন্ন প্রকার জীবন বীমার উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

(Write short notes on various types of Life Insurance).

12. জীবন বীমার ধারাগুলি, উহা গ্রহণের পদ্ধতি এবং দাবীপেশের পদ্ধতি আলোচনা কর।

(Discuss the various clauses of Life Insurance, and discuss the method of taking out a Life Insurance Policy and making a claim on it).

13. জীবন বীমা ব্যবসা কি কারণে জাতীয়করণ করা হইল ? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর। জীবন বীমা কর্পোরেশনের সংগঠন এবং প্রশাসন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

(Why was the Life Insurance Business Nationalised ? What are its Merits and De-Merits ? Discuss the Organisation and Administration of Life Insurance Corporation).

14. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) পুনর্বীমা, (খ) যুগ্মবীমা, (গ) সামুদ্রিক বিপদ, (ঘ) জাহাজস্থিত পণ্য বন্ধক রাখিয়া ঋণ, (ঙ) পণ্য বন্ধক, (চ) সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপণ, (ছ) আশুকারণ, (জ) প্রতিকল্প উত্তমর্ণ, (ঝ) নিস্তারণ এবং (ঞ) সততা বীমা।

(Write notes on :—
(a) Re-insurance, (b) Double Insurance, (c) Perils of the Sea, (d) Bottomry, (e) Respondentia, (f) Jettision, (g) Causa Proxima, (h) Subrogation, (i) Salvage, (j) Fidelity Insurance.)

15. চার্টার পার্টি কি ? ইহার ধারাগুলি কি কি ? চার্টার পার্টি এবং চালানী রসিদের মধ্য পার্থক্য নির্ণয় কর।

(What is Charter Party ? What are its clauses ? Distinguish Charter Party from Bill of Lading.)

16. ভারতের রপ্তানী ঝুঁকি বীমা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(What do you know about Export Credit Guarantee Insurance of India ?)

বাণিজ্যজগৎ ও সরকার

(Business World and Government)

ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে উহাদের ভূমিকা এবং বণিক সভা (Various Institutions for the Furtherance of Trade in India and their importance in the development of trade, Commerce and industry and the chamber of Commerce) :—

দেশের শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতির উন্নতিতে সরকারী ও বে-সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) **বণিক সভা** (Chamber of Commerce) :—

ইহা একটি স্বেচ্ছামূলক অ-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার অডিটর, প্রভৃতি লইয়া এই প্রকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সকল বণিক সভাই যৌথ কারবারী হিসাবে নথিভুক্ত এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত এবং সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতেও গঠিত। সর্ব্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে গঠিত বণিক সভার সংখ্যা দুইটি যথা (ক) The Associated Chamber and Industris এবং (খ) The Federation of Indian Chamber of Commerce.

এই বণিক সভার **কার্যাবলী** সংক্ষেপে নিম্নরূপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

(ক) ইহা কারবারের স্বার্থ উন্নয়ন এবং রক্ষা করিয়া কারবারকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(খ) বিভিন্ন প্রকার কারবারীকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক তথ্য পরিবেশন করিয়া থাকে। ইহাতে ব্যবসায়ী উপকৃত হয়। কারণ, বিভিন্ন প্রকার কারবারের তুলনামূলক অবস্থা ঐ সকল তথ্য হইতে সহজেই পাওয়া যায়।

(গ) বিভিন্ন কারবারের মধ্যে কোন প্রকারে বিবাদ বা মতবিরোধ দেখা দিলে এই বণিক সভাই তাহা মীমাংসা করিয়া দেয়।

(ঘ) সরকার যদি এমন কোন আইন-প্রণয়ন করে যাহা ব্যবসায়ীর প্রতিকূল তবে বণিকসভা সরকারকে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ বা আলোচনার মাধ্যমে ঐ আইন-প্রণয়নে নিবৃত্ত করে।

(ঙ) বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগী ব্যবসায়ীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক ও পণ্যব মান নির্ধারণে ইহা বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(চ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ট্রেডমার্ক ও পেটেন্ট সম্পর্কে ইহা ব্যবসায়ীর অধিকাব রক্ষা করে।

(ছ) বৈদেশিক বাজার সম্পর্কে ইহা ব্যবসায়ীকে জ্ঞাত করে এবং প্রয়োজনে রপ্তানীকারীকে প্রভবলেখ দেয়।

(জ) শিল্প, বাণিজ্যের কারিগরী ব্যাপারে গবেষণায় ইহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ করে।

(ঝ) বিভিন্ন প্রকাব ব্যক্তিকে কারবার সম্পর্কে ইহা শিক্ষাদান করে এবং তাহাদের কর্মসংস্থানেব ব্যবস্থাও করিয়া দেয়।

(ঞ) ইহা দেশেব শিল্প, বাণিজ্যেব বিশেষজ্ঞ হিসাবে সরকারকে সাহায্য করে।

সুতবাং শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে ভারতবর্ষে এই বণিকসভা এক বিশেষ স্থান দখল কবিয়া আছে। ইহা সভ্যদের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

(২) **ব্যবসায় সমিতি** (Trade Association) :—

নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য যখন একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব বসায়ীরা কোন সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তখন তাহাকে ব্যবসায় সমিতি বলে।

ঐ ব্যবসার সকল ব্যাপারেই এই সমিতি প্রতিনিধিত্ব করে। সভ্যগণেব সততা রক্ষা, পণ্যের মান ঠিক রাখা, বিজ্ঞাপন প্রদান, পণ্যব বাজার অধিক পরিমাণ সম্প্রসারণ, বৈদেশিক বাজার নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি এই সমিতির অন্যতম কার্য্য।

উৎপাদকগণও এই প্রকার সমিতি নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য গড়িয়া তুলিতে পারেন। যেমন, ভারতেব তৈলকল সমিতি, সাবান উৎপাদক সমিতি, কটি উৎপাদক সমিতি, প্রভৃতি ইহাদের অন্যতম।

(৩) **মেলা ও প্রদর্শনী** (Fairs and Exhibitions) :—

প্রাচীনকালে ধর্ম বা ঐতিহাসিক কারণেই মেলা হইত। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন বিভিন্ন কারণে এই মেলা হয়। এই মেলার মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের দ্বারা পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। এই মেলা বর্তমানে সরকারী ও বে-সরকারী পরিচালনায় হইয়া থাকে। যেমন, কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, প্রভৃতি শহরে বড় বড় কৃষি মেলা হইয়া থাকে। পণ্যের বহুল প্রচার ও বাজার সৃষ্টিই এই প্রকার মেলার উদ্দেশ্য। জার্মানের 'লিপজিগ' মেলা, ইংলণ্ডের 'এডিনবরা' মেলা, প্রভৃতি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক মেলার উদাহরণ।

(৪) **ব্যবসায় প্রতিনিধি** (Trade Delegations) :—

নূতন বাজার সৃষ্টি অথবা পুরানো বাজারকে সম্প্রসারণই এই প্রকার প্রতিনিধির মূল উদ্দেশ্য। এইরূপ প্রতিনিধি একদেশ হইতে অন্যদেশে প্রেরিত হয়। কারবার বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মী, প্রভৃতি লইয়া এই প্রকার প্রতিনিধিদল তৈয়ার হয়। ইহা সরকারী অথবা বে-সরকারী উদ্যোগে প্রেরিত হইতে পারে। বিদেশে গিয়া এই প্রকার প্রতিনিধি সম্ভাব্য ভোক্তার সহিত আলোচনার মাধ্যমে পণ্য বিক্রেয়র পথ সুগম করে। অনেকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মেলায়ও এই প্রকার প্রতিনিধি প্রেরিত হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক স্থলে ইহাদের উদ্দেশ্য হইবে পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা।

(৫) **মন্ত্রীদপ্তর এবং অধিকারসমূহ** (Ministries and Directorates) :—

বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যদপ্তর শিল্পের উন্নতিতে বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। প্রয়োজনে বিদেশী বাজার সম্পর্কে ধারণা লইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিনিধি দলকেও বিদেশে প্রেরণ করিতেছে। ভারতীয় এই সকল দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইতেছে মিশ্র অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে যাবতীয় বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

(৬) **জাতীয় গবেষণাগার** (National Laboratories) :—

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, প্রভৃতির উন্নতির জন্য কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল গবেষণাগারকে জাতীয় গবেষণাগার বলে। ইহাদের মোট সংখ্যা পচিশ। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম নিম্নরূপ।

জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার, কেন্দ্রীয় জ্বালানী গবেষণাগার, কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগঠন, কেন্দ্রীয় খনি গবেষণা কেন্দ্র, প্রভৃতি। এই সকল গবেষণাগার সৃষ্টি ও পরিচালনায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেইজন্য ইহা সরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নূতন কাঁচামাল ও পণ্য উদ্ভাবন, পুরাতন পণ্য নূতন ব্যবহার, নূতন নূতন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন প্রভৃতি এই সকল গবেষণাগারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৭) **ভারতের মান-সংস্থা** (Indian Standards Institutions) :—

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই সংস্থা ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রকার পণ্য ও কৃষিজাত, শিল্পজাত প্রভৃতির উৎপাদনের নির্ধারিত মান ও উৎকর্ষ সাধনই এই প্রকার

প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কার্য। নির্ধারিত মানের পণ্যর জন্য ইহা প্রত্যয়ন পত্র প্রদানকরে এবং প্রয়োজনে উৎপাদিত পণ্যে উহার নামাঙ্কিত ছাপ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে।

(৮) **কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক সংবাদ সংগ্রহ ও পরিসংখ্যান বিভাগ** (Department of Commercial Intelligence and Statistics) :—

এই বিভাগ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরকে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্ন কাঁচামাল উৎপাদন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহার কার্য্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত।

(৯) **বিপনন পর্ষৎসমূহ** (Marketing Boards) :—

ভারতীয় কৃষিজ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বাজার সৃষ্টি বিক্রয়, উৎপাদনবৃদ্ধি, পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য এই পর্ষৎ স্থাপিত হইয়াছে। সরকার মনোনীত, সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তি লইয়া ইহা গঠিত। এই পর্ষৎসমূহের মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় চা পর্ষৎ, কেন্দ্রীয় কফি পর্ষৎ, কেন্দ্রীয় রবার পর্ষৎ, প্রভৃতি।

(১০) **রপ্তানী-উন্নয়ন পর্ষৎসমূহ** (Export Promotion Councils) :—

বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুকূল উদ্বৃত্ত আনার জন্য এই পর্ষৎ স্থাপিত হইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনই এই প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র। রপ্তানী বাণিজ্যে যে সকল অসুবিধা আছে তাহাও এই পর্ষৎ দূর করিয়া থাকে। বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা এগার। ইহাদের মধ্যে Mica Export Promotion Council, Rayon and Silk Textile Export Promotion Council প্রভৃতি অন্যতম।

(১১) **বাণিজ্যিক দূতালয়** (Consulates) :—

দেশের কৃষিজাত শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী ও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য এবং বিভিন্ন দেশের সহিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নতির জন্য বাণিজ্যিক দূতালয় স্থাপিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের বিভিন্ন তথ্য সরকার এই দূতাবাসের মাধ্যমে পাইয়া থাকে। এবং সেই ভিত্তিতে বৈদেশিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। ইহারা কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রদূতের কাজও সম্পাদন করিয়া থাকে।

(১২) **প্রদর্শনশালা** (Museum) :—

ইহা সরকারী ও বে-সরকারী যে কোন উদ্যোগে হইতে পারে। শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় জনগণকে আরও জ্ঞাত করিবার জন্য এই প্রদর্শনশালা স্থাপিত হয়।

প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ইহাতে জনগণের নিকট তুলিয়া ধরা হয়। ইহাতে ঐ পণ্য চাহিদা বা বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। কলিকাতায় অবস্থিত মাদ্রাজ হাণ্ডলুম এম্পোরিয়াম, রাজ্যসরকারের সেলস্ এম্পোরিয়াম, প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

(১৩) **রপ্তানী তদারকি পরামর্শদাতা পরিষদ** (Export Inspection Advisory Council) :—

রপ্তানী বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য একটি কার্য্যক্রম প্রনয়ণ করিবার জন্য এই পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শিল্পে আর্থিক সাহায্যদানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের ভূমিকা (Role of the Central and State Government in India for extending financial assistance to Industries) :—

শিল্পক্ষেত্রে ভারত এখনও উন্নতি করিতে পারে নাই। প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই শিল্পোন্নয়ন এখনও হয় নাই। সেই জন্য এই শিল্পের উন্নতিতে সরকারকেও হাত দিতে হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়া আসিতেছেন। সরকার বিভিন্ন বে-সরকারী কারবারের শেয়ার ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য করেন। আর বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে ঐ প্রকার অর্থ ঋণ দিয়া পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আমাদের দেশে শিল্পগুলি বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, মহাজন, সমবায় ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক ব্যাঙ্ক, ম্যানেজিং এজেন্ট, প্রভৃতির নিকট হইতেও আর্থিক সাহায্য পাইয়া থাকে।

কিন্তু ঐ সকল প্রতিষ্ঠান হইতে যে অর্থ-সাহায্য পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ যথেষ্ট নহে; এবং এমনকি এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে সময়মতও অর্থ পাওয়া যায় না। সেজন্য ঐ সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য সরকার কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। সরকারের প্রচেষ্টায় এই ঋণপ্রদানের জন্য বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সংস্থা সমূহের নাম করা যাইতে পারে যেমন, I. F. C., S. F. C., I. C. I. C., N. I. D. C., N. S. I. C., I. D. B. প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও State Aid to Industry Act-এর মাধ্যমেও সরকার প্রত্যক্ষভাবে শিল্পে সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া জাহাজ কোম্পানী, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, প্রভৃতি বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও সরকার প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য অর্থাৎ ঋণপ্রদান করিয়াছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সবকার জাহাজ কোম্পানীকে ২৪ কোটি টাকা ঋণ ববাদ্দ করেন। দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে উহাব পবিমাণ ছিল ১৭ কোটি টাকা। এবং ঐ ঋণের উপব সুদেব হাব ছিল বার্ষিক শতকবা ৩ টাকা মাত্র। Iron & Steel তহবিল হইতেও টাটা ও ভাবতীয় আইরণকে ১০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। কিন্তু উহাব উপব ১৯৫৮ সালেব জুন পর্যন্ত কোন সুদ লওয়া হয় নাই। ইহাব পরে ঐ টাকার উপব অর্থাৎ ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা সুদ ধার্য কবা হয়। ইহা ছাড়া ইণ্ডিয়ান আইরণ এণ্ড কোম্পানীব সহিত বেঙ্গল ষ্টীলের সংযুক্তির জন্য ৭.৯০ কোটী টাকা বিশেষ ধরনেব ঋণ প্রদান করা হয়।

ইহা ছাড়া ক্ষুদ্রশিল্পেব ঋণের ক্ষেত্রে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়াছে। বিভিন্নভাবে এই ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্রশিল্পেব উন্নতিব জন্য সাহায্য করিতেছে। এ ব্যাপারে এই ব্যাঙ্কেব সুবিধাজনক সর্তে অর্থ-সাহায্য পবিকল্পনা এবং পথনির্দেশক পবিকল্পনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকার এই ব্যাঙ্ক ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পে প্রায় ৫৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদান কবে। ইহা ছাড়াও বিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই শিল্প ঋণের ব্যাপারে শিল্প ঋণ বিভাগ, খুলিয়াছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিল্পেব উন্নতিতে ঋণপ্রদানে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন।

কারবারের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ (Government Interference Over Business) :—

কাববারের উপব সরকারী হস্তক্ষেপ বলিতে রাষ্ট্রেব হস্তক্ষেপকেই বোঝায়। সবকার রাষ্ট্রেব একটি অংশমাত্র। সেজন্য সরকারের হস্তক্ষেপ বলিতে আমরা রাষ্ট্রেব হস্তক্ষেপই বুঝিব।

বর্তমানে সরকার বা রাষ্ট্র কাববারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রাচীনকালে এ সকল ব্যাপারে সরকার কোন হস্তক্ষেপই করিত না। সমস্ত ব্যবসা তাহাব আপন মালিকের উপর নির্ভর করিয়া নিজের গতিপথেই চলিত। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপে বা জটিলতাব দরুণ আগের দিন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। এবং সরকার ইহা চুপচাপ বসিয়া দেখিতে পারে না। সে জন্য কারবারেও সরকার প্রবেশ করিয়াছে।

প্রাচীনকালে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, আইন-প্রণয়ন, মিত্র ভাবাপন্ন দেশের সহিত আরও উন্নত সম্পর্ক স্থাপনই ছিল তৎকালীন সরকারের অন্যতম কাজ। তখন ব্যবসায় ক্ষেত্রে সরকারী হাত কল্পনাও করা যায় নাই। এমনকি ব্যবসাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপকে অনেকে অর্থের অপব্যয় মনে করিত। সরকারের তৎকালীন নীতিকে নির্বিরোধ নীতি (Laissez faire policy) বলা হইত।

কিন্তু শিল্পোন্নতির পর হইতে ব্যবসার পরিধিও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ব্যবসায়ী তাহাদের নিজেদের সুবিধার জন্য ক্রমাগত নিষ্পাপ ক্রেতাগণকে ঠকাইতে থাকে। ইহাতে ক্রেতা তথা জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে আর মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দিনের পর দিন লাভবান হইতে থাকে। এ অবস্থা সরকার চুপ করিয়া দেখিতে পারে না। সেজন্য জনকল্যাণের জন্য ব্যবসাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রই জনকল্যাণমূলক। আর এই রাষ্ট্রকে জনকল্যাণমূলক করিয়া গড়িয়া তুলিতে সরকারকে বহন করিতে হয় এক বিরাট দায়িত্ব। শুধুমাত্র ব্যবসাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ নয়। জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা, ধনবৈষম্যদূর প্রভৃতিও সরকারের অন্যতম কার্য। ইহা ছাড়া রহিয়াছে দেশকে বিদেশী-শক্তির হাত হইতে রক্ষা। ইহাও সরকারকে করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্প বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সবাই ব্যস্ত। সুতরাং সরকারের ভূমিকা শিল্পক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিতে বাধ্য।

বিভিন্ন দেশেও এই সরকারী হস্তক্ষেপ অতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য আমাদের দেশেও ইহা গ্রহণ করা একান্ত দরকার। অন্যথায় বৈদেশিক বাজারে আমাদের পণ্য বিশেষ সুবিধা করিতে পারিত না। দেশে বিভিন্ন কারবারে সরকারী হস্তক্ষেপ নিম্নরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

(ক) শিল্প ও বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী অংশগ্রহণ নীতি :—

আমাদের দেশে সোভিয়েট দেশের ন্যায় সরকার বিভিন্ন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য দেশের স্বার্থরক্ষা ও জনগণের আরও সুবিধা প্রদান করা।

(খ) মিশ্রঅর্থ নীতি পদ্ধতি :—

এই নীতি অনুযায়ী আমাদের দেশে কিছু কিছু শিল্প সরকারী আর কিছু কিছু শিল্প বে-সরকারী মালিকানায় গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার সরকার ও শিল্পে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এই নীতিকে মিশ্র অর্থ নীতি ব্যবস্থা বলে।

(গ) **বিভিন্ন আইন করিয়া বে-সরকারীক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ :—**

আমাদের দেশে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নপ্রকার আইনপাশ করিয়া দেশের বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা দুর্নীতি দমন হয়, শ্রমিক শোষণ বন্ধ হয়, জনকল্যাণবিরোধী কাজ-কর্মও বন্ধ হইয়া যায়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে কারবারে সরকারী হস্তক্ষেপ অতি স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়। এবং এমন একটি হস্তক্ষেপ আমাদের একান্ত দরকার ছিল। কারণ এই হস্তক্ষেপ ছাড়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠন একটা কঠিন কাজ হইত।

জাতীয়করণের অর্থ, সুবিধা ও অসুবিধা (Meaning, Merits, and De-merits of Nationalisation) :—

কোন প্রতিষ্ঠান সরকারী বা বে-সরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যে সকল কারবার বে-সরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাদিগকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বলে। কিন্তু কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান যদি সরকার গ্রহণ করে অর্থাৎ উহার মালিকানা সরকার নিয়ে নেয়, এবং ঐ কারবার পরিচালনার, উৎপাদনের, বণ্টনের প্রভৃতির কাজ যদি সরকার করিয়া থাকে তাহা হইলে উহাকে রাষ্ট্রীয়করণ বা জাতীয়করণ বলে।

সুতরাং যখন প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে সরকারের হাতে চলিয়া আসে তখন তাহাকে জাতীয়করণ বলে। এই সরকারী মালিকানা ও পরিচালনা ক্ষমতা দুই প্রকারের হইতে পারে যেমন, (ক) সরকারী বিভাগের অন্তর্গত রাখিয়া যথা তার-ডাক, রেল বিভাগ এবং (খ) পৃথক সংস্থা হিসাবে রাখিয়া যথা দুর্গাপুর ও ও রুরকেল্লার লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রভৃতি।

কোন প্রতিষ্ঠান সরকার গ্রহণ করিলে অর্থাৎ জাতীয়করণ করা হইলে তাহার কতকগুলো **সুবিধা** আছে যেমন,

(১) ইহাতে শিল্পবাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয়। কারণ, রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। উহা সকলের। সুতরাং সকলেই দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। ফলে শিল্পসম্প্রসারিত হয়।

(২) জাতীয়করণদ্বারা প্রতিযোগিতামূলক অপচয় কম হয়। কারণ, সমস্ত কারবার জাতীয়করণ করা হইলে আর একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতার প্রশ্নই উঠে না।

(৩) জাতীয়করণের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্ভব হয়। কারণ, ব্যক্তিগত কারবারে লাভবহুল সম্পদই ব্যবসায়ীরা বেশী ব্যবহার করে। সুতরাং, দ্রুত

উহা শেষ হইয়া যায়। ইহা জাতীয়জীবনে ক্ষতিকর। কিন্তু এরূপ ব্যবহার জাতীয়করণ দ্বারা হয় না। তখন দেশের কথা চিন্তা করিয়াই সমস্ত পণ্য উৎপাদনে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।

(৪) মুনাফাই রাষ্ট্রীয় কারবারের একমাত্র লক্ষ্য নহে। সেবা ইহার অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং মুনাফা ও সেবার সংমিশ্রণ অন্য কোথাও এমন সুন্দরভাবে দেখা যায় না। বে-সরকারীক্ষেত্রে সকলেই অধিক মুনাফা অর্জনে ব্যস্ত থাকে। সেবার কথা ভুলিয়া যায়। সেজন্য জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

(৫) জাতীয়করণ দ্বারা দেশের, বেকার সমস্যা অনেকাংশে দূর হয়। কারণ, শিক্ষার ভিত্তিতে অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতায় সকলেই সরকারী চাকুরী পাইতে পারে। কিন্তু ইহা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে সম্ভব নয়। কারণ, সেখানে শিক্ষা অপেক্ষা পরিচিতির দাবী অগ্রগণ্য।

(৬) জাতীয়করণ শিল্পের অর্জিত মুনাফা দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়িত হইতে পারে। ইহাতে জনকল্যাণ হয়।

(৭) উন্নয়নমূলক গবেষণার কাজ একমাত্র জাতীয়করণ প্রতিষ্ঠানেই সম্ভব। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে এই সকল কোন সুবিধাই নাই, এবং

(৮) এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা থাকে। কারণ, তাহারা মনে করে ইহা সরকারী প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ইহা জনগণেরই সেবা করিবেই।

কিন্তু উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই জাতীয়করণ একেবারে দোষমুক্ত নহে। ইহার সম্পর্কে যে যে বিশেষ **দোষ বা অসুবিধার** কথা বলা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপে আলোচনা করা যায়।

(১) জাতীয়করণ দ্বারা ব্যক্তিগত উদ্যম নষ্ট হয়। কারণ, প্রত্যেকেই জানে যে নিজে কারবার করিয়া কি হইবে। উহা আরম্ভ করিলেই সরকার গ্রহণ করিবে। সুতরাং নূতন ব্যবসা স্থাপনার দরকার নাই।

(২) আমলাতন্ত্র দ্বারা এরূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। বড় বড় আমলারা যাহা ঠিক করিবে তাহাই বাস্তবে রূপায়িত হইবে। এবং উপরের কর্মীরা নীচের কর্মীদের প্রতি লক্ষ্যই করে না।

(৩) এরূপ প্রতিষ্ঠান কাগজে কলমে আদর্শ বলিয়া স্বীকৃতিলাভ করিলেও বাস্তবে ইহা স্বজনপোষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধিই এই প্রকার প্রতিষ্ঠানে মূল মন্ত্র হইয়া উঠে।

(৪) ইহাতে কোন প্রতিযোগিতা থাকে না। সেজন্য সরকার পণ্যর যে মূল্য ধার্য করে তাহা দিয়াই পণ্য ক্রয় করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহা অনেক সময় প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী।

(৫) গবেষণার সম্ভাবনা থাকিলেও বাস্তবে তাহা হয় না। ইহার পরিবর্তে প্রচুর সরকারী অর্থের অপচয় ঘটে। ফলে পণ্য মূল্যও বৃদ্ধি পায়।

(৬) ইহা একটি ব্যয় বহুল প্রতিষ্ঠান। কারণ, বিভিন্ন প্রকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীর জন্য প্রচুর অর্থ ইহাতে ব্যয় হয়।

সুতরাং উপরের আলোচনা হইতে আমরা সহজেই জাতীয় করণে দোষ ও গুণ বুঝিতে পারিলাম। এমন অবস্থায় তাহা হইলে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত? জাতীয় করণ করা হইবে, না শিল্পকে ব্যক্তিগত মালিকানায় চলিতে দেওয়া হইবে। এর উত্তরে অনেকে মিশ্র অর্থনীতির কথা বলিয়াছেন। আর সেই জন্য আমাদের দেশেও মিশ্র অর্থ-নীতি ব্যবস্থা দেখা যায়।

ভারত-সরকারের শিল্পনীতি (Industrial Policy of the Grovenment of India):—বিদেশী শাসনের জন্য ভারতের শিল্প বাণিজ্য আজ অনেক পিছিয়ে আছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কোন শিল্পনীতি ছিল না, যাহা ছিল তাহাকে স্বাতন্ত্র্যবাদ (Laissez Faire) বলা হইত। ইহার পরে স্বাধীনতা আসে। প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সরকার। আর সাথে সাথে দেখা দেয় শিল্পক্ষেত্রে উন্নতির প্রচেষ্টা। প্রথম ভারতীয় শিল্পনীতি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। ইহার পরে বাস্তবের সহিত সমতা রাখিয়া ঐ-ঐ শিল্পনীতিকে ১৯৫১ সালে এবং ১৯৫৩ সালে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। এবং পরবর্তীকালে ঐ শিল্পনীতিকে আরও উন্নত ধাঁচে গড়িয়া তুলিয়া বাস্তবমুখী করিবার জন্য ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। ১৯৫৬ সালের ঘোষিত শিল্পনীতিই বর্তমানের শিল্পনীতি কারণ ইহার পরে আজ পর্যন্ত আর কোন শিল্পনীতি ঘোষিত হয় নাই। এই বর্তমানের শিল্পনীতিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শিল্পকে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের কথা বলা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় শিল্পের জাতীয়করণকে দ্রুততর করিয়া তুলিবার সুপারিশও করা হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পের গুরুত্ব অনুযায়ী সমস্ত শিল্পকে এই নীতিতে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এবং শিল্পনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে নিম্নরূপে আলোচনা করা যায়:—

(১) যে সকল শিল্পের গুরুত্ব জাতীয় জীবনে অপরিহার্য্য তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সকল শিল্পের মধ্যে সামরিক ও দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় শিল্প, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ শিল্প লোহা-ইস্পাত শিল্প, কয়লা, খনিজতৈল,

রেল-পরিবহণ, বিমান, টেলিগ্রাম, জাহাজ, আনবিক প্রভৃতি ১৭টি শিল্প ইহাদের অন্যতম। এই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি, পবিচালনা প্রভৃতি সবকাবের হাতে থাকিবে। যে সকল শিল্প এই পর্য্যায়ে এখনও বে-সবকারী আওতায় রহিয়াছে তাহাদের উন্নতিতে সরকাব ঋণ প্রদান কবিবে। কিন্তু এই প্রকার কোন শিল্প নূতন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহা একমাত্র সবকারী মালিকানাতেই হইবে। বে-সরকারী মালিকানায় ইহা আব প্রতিষ্ঠা লাভ কবিতে পাবিবে না।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২টী শিল্পেব কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল শিল্প শিল্প সরকারী ও বে-সবকাবী উভয় প্রকার মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, ও পবিচালিত হইতে পারিবে। এই সকল শিল্পের মধ্য যন্ত্রপাতি, হাতিয়াব, এলুমিনিয়াম, ঔষধ, বং, সড়ক-পবিবহণ প্রভৃতি রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারীও বে-সবকারী উদ্যোগ পাশাপাশি পরিচালিত হইবে।

(৩) অবশিষ্ঠ শিল্পকে তৃতীয় শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার সমস্তটাই প্রায় বে-সরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পবিচালিত হইবে। কিন্তু প্রয়োজনবোধে সরকার যে কোন শিল্পকে নিজেব আওতায় লইতে পাবিবে। এবং প্রয়োজন বোধে বে-সরকারী পবিচালনা সরকারী সাহায্যও পাইবে।

(৪) এই নতুন শিল্পনীতিতে কুটীরও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কাবণ ইহা হইতে দেশেব বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে।

(৫) বিভিন্ন শিল্পের বিকেন্দ্রীয়করণ নীতির উপরও যথেষ্ঠ গুরুত্ব এই নতুন শিল্প-নীতিতে দেওয়া হইয়াছে।

(৬) শিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকার শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার উপরও এই নীতিতে জোর দেওয়া হইয়াছে। এবং

(৭) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনও এই নতুন শিল্পনীতিব অন্যতম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। সেজন্য শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারী প্রচেষ্টার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং উহাই হইল ভারত সরকারের—বিভিন্ন শিল্পনীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা (Various steps taken by the state and Central Governments for the furtherance of Industry, trade and Commerce) :—অনুন্নত দেশ কৃষি ভিত্তিক হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে

সাথে জনগণ এই কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে শিল্পভিত্তিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। প্রতিটি অনুন্নত, দরিদ্র দেশের অর্থনীতির দিকে একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে ইহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যখনই দেশ কৃষি থেকে শিল্প ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে তখনই দেখা দেয় প্রতিযোগিতা। কারণ বিভিন্ন দেশ তাহার শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা করে। প্রথমে এই প্রতিযোগিতা দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরবর্তীকালে উহা বৈদেশিক বাজারেও দেখা দেয়।

বর্তমানে অনেক দেশ শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত হইয়াছে। এই উন্নত হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। যেমন পণ্য বিক্রয়ে প্রতিযোগিতা, পণ্য উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা প্রভৃতি। সুতরাং এই সকল স্থানে কোন স্বাধীন জনপ্রিয় সরকার আর চুপ করিয়া দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে সরকার তাহার পুরাতন নির্বিরোধ নীতিও (Laissez fair Policy) আব মানিয়া চলিতে পারে না। এমনকি মানিয়া চলাও উচিত নহে। সেজন্য শিল্পেব উন্নতিতে তথা দেশের স্বার্থে সরকারকে অনেক ক্ষেত্রে শিল্প বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিতে হইতেছে। এবং ইহার উন্নতির জন্য বিভিন্নপ্রকারে উৎসাহ প্রদান করিতে হইতেছে। যে সকল পদ্ধতিতে সবকার শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে এই উৎসাহ ও সহায়তা করিয়া থাকে তাহার মধ্য নিম্নক্তো পদ্ধতি গুলি অন্যতম।

(১) **সংরক্ষণ:**—অনেক সময় বিদেশী-পণ্যর বেশী আমদানীর জন্য অনেক দেশীয় শিল্প উন্নত হইতে পারে না। অর্থাৎ বিদেশী পণ্যর সহিত দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে দেশীয় পণ্যকে বা শিল্পকে বক্ষা করিবার জন্য সরকার ঐ বিদেশী পণ্যর উপব উচ্চহারে আমদানী কর বসাইতে পাবে। হইতে বিদেশী পণ্যের মুল্য বৃদ্ধি পায় এবং দেশীয় পণ্যের মুল্য কম হয়। ইহাতে দেশীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে। এই পদ্ধতিকে সংরক্ষণ বলে। অনেক সময় সরকার আবার দেশীয় শিল্পকে আর্থিক সাহার্য্যও দান করিতে পারে। ইহাতে দেশীয় শিল্পগুলি ভালভাবে চলিতে পারে।

(২) **মূলধনী সংস্থাসমূহ:**—শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় মূলধন অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা হইতে পাওয়া যায় না। কারণ শিল্পের উন্নতিতে প্রচুর মূলধন দরকার হয়। সেজন্য ইহাদের উন্নতিতে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। সরকারও এই শিল্পের উন্নতিতে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করিবার

জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। যেমন, বীমা, লগ্নি সংস্থা প্রভৃতি। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান হইতে শিল্পগুলি অতি সহজে ও সুলভে তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের উন্নতিতে কোন বাঁধা আসে না।

(৩) **সংগঠিত মুদ্রা বাজার ঃ—**

মুদ্রামূল্যর দ্রুত উঠানামা অনেক সময় শিল্পের উন্নতিতে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে। সে জন্য মুদ্রামূল্যর স্থীরতা রক্ষাও সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ জন্যে সরকার দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুদ্রামূল্যের দ্রুত উঠানামা অনেকাংশে হ্রাস পাইবে এবং শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিবে। এই মুদ্রা-মূল্যের দ্রুত উঠানামা বন্ধ করিতে না পারিলে দেশের শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে ব্যহত হয়।

(৪) **করব্যবস্থা ঃ—**

রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় অর্থের অধিকাংশই সরকার কর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, সরকার যত খুশী কর জনগণের উপর স্থাপন করিতে পারেন। করের চাপ খুব বেশী হইলে জনগণ বিক্ষোভ প্রকাশ করিবে। ইহাতে শিল্পের উন্নতি কখনও সম্ভব হইবে না। এই জন্য জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই কর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এবং এই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ যাহাতে শিল্পের উন্নতিতে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার প্রতিও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৫) **যানবাহনের উন্নতি ঃ—**

কোন দেশের শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে উহার যানবাহন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। এই যানবাহনের উন্নতি ভিন্ন শিল্পের উন্নতি চিন্তাই করা যায় না। কারণ উহারা পরস্পর জড়িত। এজন্য রেল, বাস, জাহাজ প্রভৃতি ব্যবস্থার উন্নতিতে সরকারকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়।

(৬) **সরকারী দপ্তর স্থাপন ঃ—**

শিল্পের উন্নতিতে শুধুমাত্র নীতি নির্ধারণই যথেষ্ট নহে। ইহাতে শিল্পের উন্নতি সম্ভব হইবে না। বিভিন্ন শিল্পের পরিচালনা ব্যবস্থাও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কোন শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে উহার পরিচালনার উপর নির্ভর করে।

সেজন্য উহাদের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য সরকারকে বিভিন্ন দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে এবং ঐ সকল দপ্তর মারফৎ শিল্পের পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

(৭) **আইন প্রণয়ন :—**

যেখানে ইচ্ছা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে প্রকৃত শিল্পের উন্নতি হয় না। কারণ এ সকল স্থানে দুর্ব্বল শিল্পগুলি সবল শিল্পের চাপে নষ্ট হইয়া যায়। এবং একচেটীয়া একশ্রেণীর লোকের হাতে শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। ইহাতে অনেক সময় শ্রমিক স্বার্থও নষ্ট হয়। সেজন্য প্রকৃত শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারকে সময় সময় আইন প্রণয়ন কবিতে হয়। ইহাতে যেখানে খুশী শিল্প গডিয়া উঠিতে পারে না। এবং প্রকৃত শিল্পেব উন্নতি সম্ভব হয়। এজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিল্প-আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

(৮) **ভোগ-নিয়ন্ত্রণ :—**

অনেক সময় পণ্য ভোগ দেশের মধ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রয়োজনেব তুলনায় খাদ্য বা পণ্য কম হইলে জনস্বার্থেই ইহা কবা হয়। এই ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে অদূব ভবিষ্যতে এক ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। সেজন্য সরকার জনস্বার্থে পণ্যর ভোগ নিয়ন্ত্রণ কবিয়াও শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা কয়িয়া থাকেন। এবং

(৯) **শিল্প-সংস্কার :—**

শিল্পের সংস্কাবের দ্বারাও সরকার শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। এই প্রকার সংস্কার দ্বারা শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শিব-সংস্কার একটি ব্যয় বহুল ব্যাপার। সেজন্য সরকারকেই ইহা করিতে হয়। অন্যথায় সম্ভব হয় না।

প্রশ্নাবলী (Questions)

1. ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি আলোচনা কর এবং ভারতীয় শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য উন্নয়নে উহাদের গুরুত্ব পরীক্ষা কর।
   (Discuss the various Institutions for the furtherance of Trade and examine their importance in the development of Indian Trade, Commerce and Industry).

2. বণিক সভা কাহাকে বলে ? উহার কার্যাবলী আলোচনা কর।
   (What is meant by a chamber of Commerce ? Discuss its Functions).

3. শিল্পের উন্নতিতে আর্থিক সাহায্যদানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা আলোচনা কর।

(Discuss the Role of the Contiol and State Government in India for expending financial assistance for the development of Industries).

4. কারবারের উপর সরকারী প্রভাব এবং হস্তক্ষেপের পদ্ধতি আলোচনা 'কর।

(Discuss the influence of Government over business and the methods of Government interference over it).

5. জাতীয়করণ কাহাকে বলে ? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

(What is Nationalisation ? Discuss its merits and De-merits).

6. ভারত সরকারের শিল্পনীতির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

(Write short notes on the Industrial Policy of the Government of India).

7. কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার শিল্পের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আলোচনা কর।

(Discuss the steps that have been taken by Central and State Govt. in India for extending financial assistance to Industries).